টাউন কলিকাতার কড়চা

বিনয় ঘোষ

বিহার সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড
৩৭এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৬৮
অক্টোবর ১৯৬১

প্রকাশক : শ্রীশক্তিকুমার ভাদুড়ী
বিহার সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ
৩৭এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার

মুদ্রাকর
শ্রীধনঞ্জয় সামন্ত, মহেন্দ্র প্রেস।
৫৮ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ছয় টাকা

প্রথম সংস্করণ

'টাউন কলিকাতার কড়চা' কলকাতা শহরের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকের চিত্র। প্রধানতঃ সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিলপত্র, তদানীন্তন পর্যটকদের স্মৃতিকথা, সাময়িকপত্র ইত্যাদি অবলম্বনে এ-বই রচনা করা হয়েছে। পূর্বের 'কলকাতা কালচার' গ্রন্থের পরিপূরক হিসেবে বইখানি কৌতূহলী পাঠকদের এ বিষয়ে উৎসাহ বর্ধন করবে আশা করা যায়।

১৫ আশ্বিন ১৩৬৮

সরসিজ
৪৭।৪ যাদবপুর সেণ্ট্রাল রোড,
কলিকাতা-৩২

বিনয় ঘোষ

অন্যান্য বই ঃ

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত)

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (তিন খণ্ড)

বিদ্রোহী ডিরোজিও

কালপেঁচার নকশা

কালপেঁচার দু'কলম

কালপেঁচার বৈঠকে

বাদশাহী আমল

জনসভার সাহিত্য

কলকাতা কালচার

পাঠ্যসূচী

ট্যাভার্ন ও কফিহাউস

জনসনের যুগে লণ্ডনের শহুরে জীবনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল কফিহাউস ও ট্যাভার্ন। অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতা শহরেও জনসনের যুগের লণ্ডনের বেশ একটু ছোঁয়া লেগেছিল বলে মনে হয়। ১৭৮০ সালে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলছেন: "আমাকে একদিন কলকাতার একটি ট্যাভার্নে নিয়ে যাওয়া হল, তার নাম 'লণ্ডন হোটেল'। একটি করে সোনার মোহর দিলে সেখানে প্রবেশাধিকার পাওয়া যেত এবং তার আমোদপ্রমোদও উপভোগ করার সুযোগ মিলত। সুরাপান ও ভোজনের দক্ষিণা ছিল আলাদা। কফিহাউসে দেখেছি, এককাপ কফি খেতে একটাকা দক্ষিণা দিতে হত। অবশ্য এই একটি টাকা দিলে এককাপ কফি ছাড়াও, ইংরেজী পত্রিকাগুলি বিনা পয়সায় পড়তে পাওয়া যেত। লণ্ডনের ট্যাভার্নের মতন কলকাতার ট্যাভার্নেও সংবাদপত্র সাজানো থাকত। ক্যালকাটা অ্যাডভার্টাইজর, ক্যালকাটা ক্রনিকেল প্রভৃতি পত্রিকা আমি ট্যাভার্নে নিয়মিত পাঠ করেছি।"

এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, জনসনের যুগের লণ্ডনের হাওয়া কলকাতা শহরেও মৃদুগতিতে বইতে আরম্ভ করেছিল। তবে লণ্ডনের ট্যাভার্ন জনসনের যুগে যেমন তখনকার ইংরেজ সমাজ-জীবনের একটা বড় কেন্দ্র ছিল, কলকাতার ট্যাভার্ন বা পাঞ্চহাউস বাঙালীর জীবনের

সে-রকম কেন্দ্র ছিল না। অন্তত আঠার শতকে বা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে একেবারেই ছিল না। বাংলার সমাজ-জীবন থেকে কলকাতার পাঞ্চহাউস ও ট্যাভার্নগুলি একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল বলা চলে। জনসনের যুগের ইংরেজ প্রতিনিধিরা নিজেদের দেশের মডেলে এইসব আড্ডাখানা কলকাতায় গড়ে তুলেছিলেন। বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে এদেশের অভিজাত ধনীদের যথেষ্ট হৃদ্যতা থাকলেও, তাঁরা নাবিক সৈনিক বা 'লোফার' সাহেবদের সঙ্গে সাধারণত মেলামেশা করতেন না। বাঙালী নব্য-অভিজাতদের বাড়ীতে সাহেবসুবোদের নিয়ে ভোজসভার ও নাচসভার আয়োজন হত যথেষ্ট, কিন্তু ট্যাভার্ন বা পাঞ্চহাউসে গিয়ে তাঁরা কখনও গোরাদের বারোয়ারী নাচ-গান-হল্লায় যোগদান করতেন না। তা না করলেও, ট্যাভার্ন ও পাঞ্চহাউস যে এদেশের নতুন শহুরে জীবনকে একেবারে প্রভাবিত করেনি তা নয়। পাশ্চাত্ত্য জীবনের অনেক পঙ্কিল আবর্জনার স্রোত কলকাতার এইসব পাঞ্চহাউসের ভিতর দিয়ে আমাদের নাগরিক সমাজের নানা স্তরে তখন বয়ে আসতে আরম্ভ করেছিল।

ট্যাঙ্কস্কয়ার (ডালহৌসি), লালবাজার, কসাইতলা (বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট) ও বৌবাজার অঞ্চল ছিল তখন কলকাতার প্রাণকেন্দ্র। এই অঞ্চলেই কলকাতার আদিযুগের ট্যাভার্ন ও পাঞ্চহাউসগুলি গজিয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই অঞ্চলে পাঞ্চহাউসের হৈ-হল্লা অপ্রতিহত গতিতে চলেছিল বোঝা যায়। ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৪২ *Bengal Hurkaru* পত্রিকা 'Lol Bazaar Revelries' নাম দিয়ে স্থানীয় নাগরিকদের একটি আবেদনপত্রের সংবাদ পরিবেশন করেছেন। এই সংবাদ প্রসঙ্গে তাঁরা লিখেছেন ঃ

> The application was for the interference of the Magistrates to check the constant din and uproar, at almost all hours of the night and day, in that vicinity, caused by sea-men and others, riotous characters, who frequent

> the numerous public houses with which Loll Bazaar and Bow Bazaar abound......the tranquility and repose of the inhabitants being disturbed, owing to the uproarious revelry and noisy fiddling and drumming kept up every night, to a very late hour, in the many surrounding Punch-Houses.

উনিশ শতকের মাঝামাঝির পর লালবাজার-বৌবাজার অঞ্চলে পাঞ্চ-হাউসের এই সুরামত্ততা ও হৈ-হল্লা যে কমে গিয়েছিল তা নয়। ক্রমে আরও বেড়েছিল, এমনও হতে পারে। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৭৮১ 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় একজন বৃদ্ধ ক্যাপটেন লেখেনঃ "১৭৩৬ সালে আমি কলকাতায় এসেছি। তখন দেখেছি, কৌন্সিলের অনরেবল মেম্বররা 'Banyan Shirt', 'Long Drawer', ও 'Conjee Cap' পরে বেড়াতেন। 'লঙ ড্রয়ার' তাঁদের পরতে হত মশার কামড় থেকে আত্মরক্ষার জন্য। তার সঙ্গে থাকত 'a case bottle of good old Arrack' এবং 'a Gouglet of Water', যা সেক্রেটারিরা ঘন ঘন মিশিয়ে 'পাঞ্চ' তৈরি করতেন। পাঞ্চহাউসেও এই শ্রেণীর নানা রকমের পাঞ্চ তৈরি হত। সব ট্যাভার্ন ও পাঞ্চহাউসই যে নাবিক, সৈনিক ও অজ্ঞাতকুলশীল হল্লাবাজদের জন্য গড়ে উঠেছিল তা নয়। রবার্ট উইলসন অ্যাপলো ট্যাভার্নের ঠিকানা দিয়ে, ১২ ডিসেম্বর, ১৭৪৮ ফোর্ট উইলিয়মের প্রেসিডেন্ট ও গবর্নর উইলিয়ম বারওয়েলকে একখানি পত্র লেখেন। পাদ্রি লঙ তাঁর অপ্রকাশিত দলিলপত্রের সংকলনে তা উল্লেখ করেছেন। ট্যাভার্ন যদি কেবল অমান্যদের মিলনকেন্দ্র হত, এবং তার সঙ্গে মানীদের একেবারেই কোন সম্পর্ক না থাকত, তা হলে নিশ্চয়ই উইলসন সাহেব 'dated Apollo at Calcutta' বলে গবর্নরকে চিঠি লিখতেন না। অ্যাপলো ট্যাভার্নের যে একটা সামাজিক মর্যাদা ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এ রকম আরও দু'চারটে ট্যাভার্ন যে ছিল না তা নয়। ১৭৫৮ সালে গ্রেশাম সাহেব

(J. Tresham) মেরিডিথ লেনে (বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট সংলগ্ন গলি) একটি ট্যাভার্ন প্রতিষ্ঠা করেন। এই ট্যাভার্নে তিনি 'Settlement'-এর (অর্থাৎ কলকাতা শহরের) 'Ladies and Gentlemen'-এর জন্য নানারকমের খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় ('cold collations') তৈরি করতেন। বিখ্যাত হারমনিক ট্যাভার্নের পাশে ফ্রাঁসিস গ্যালে (ফরাসী ?) একটি ট্যাভার্ন খুলেছিলেন। সেখানে রিচার্ড বারওয়েল ১৭৭৫ সালে 'every fortnight' তাঁর বন্ধুবান্ধবদের একত্রে মিলিত হবার জন্য অনুরোধ করতেন। মহারাজা নন্দকুমারের ঐতিহাসিক বিচারের সময় ফ্রাঁসিস তাঁর ট্যাভার্ন থেকে উকিল-অ্যাডভোকেটদের খাদ্য সরবরাহ করতেন এবং ১৬ জন লোকের ৮টি ডিনার ও ৯টি সাপারের জন্য তিনি ৬২৯৲ টাকা বিল করেছিলেন। ফ্রাঁসিস গ্যালে 'His Lordship-'এর বড় বড় ভোজসভাতেও খাদ্য যোগান দিতেন। অ্যাপলো বা গ্যালের ট্যাভার্ন অনেকটা একালের বড় হোটেলের মতন ছিল। ট্যাভার্ন ঠিক পাঞ্চহাউসের মতন ছিল না। পাঞ্চহাউসগুলি সাধারণ লোকের আড্ডার স্থান ছিল, ট্যাভার্ন ছিল সম্ভ্রান্তদের বিরাম-কেন্দ্র। খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়েরও তফাৎ ছিল দুই স্থানে। পাঞ্চে যে পাঁচজনের আড্ডা জমত, তাদের কোন সামাজিক পরিচয় বলে কিছু থাকত না। সেইজন্য সেখানকার উচ্ছৃঙ্খলতাও প্রায় সীমা ছাড়িয়ে যেত। ট্যাভার্নে তা হত না।

হারমনিক ট্যাভার্ন। ১৭৮০ সালে লালবাজারের হারমনিক ট্যাভার্ন কলকাতার উচ্চসমাজের সেরা মজলিসমহলে পরিণত হয়েছিল। আজকালকার বড় বড় হোটেলের চেয়েও হারমনিকের মর্যাদা তখনকার কলকাতায় অনেক বেশী ছিল। মিসেস ওয়ারেন হেস্টিংস হারমনিকের একজন পেট্রন ছিলেন। নিয়মিত সেখানে তাঁর চা-কফির মজলিস বসত। মিসেস ফে তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে (*Letters from India*, 1818)

লিখেছেন ঃ “কিছুদিন আগে হারমনিক ট্যাভার্নের একখানি টিকিট পেয়ে আমি সত্যিই খুব পুলকিত হয়েছিলাম। শহরের বাছা-বাছা বড়লোকরা হারমনিকের পৃষ্ঠপোষক। তাঁরা নামের বর্ণানুক্রমে প্রত্যেকে প্রায় একপক্ষকাল অন্তর বলনাচ ও সান্ধ্যভোজের ব্যবস্থা করে থাকেন। শীতকালেই সাধারণত এই সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমি যে সান্ধ্য অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, মিঃ টেইলর তার পেট্রন ছিলেন। চমৎকার নাচগান হল সেই রাতে, যা সহজে ভুলব না। মিসেস হেস্টিংসও সেই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন, এবং দেরীতে এসে দূরে বসেছিলেন। আমি তাঁকে দেখতেই পাইনি। কিছুক্ষণ পরে মিসেস ‘জে’ আমাকে বললেন, মিসেস হেস্টিংসকে আমি নমস্কার জানিয়েছি কিনা। আমি বললাম জানাইনি কারণ জানাবার সুযোগ পাইনি। ভদ্রমহিলা চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, ‘সে কি! আপনার সঙ্গে এখনও একবারও চোখাচোখি হয়নি? যদি না হয়ে থাকে তা হলে নিস্পলক দৃষ্টিতে আপনি সর্বক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থাকুন, যতক্ষণ না আপনার দিকে তিনি তাকিয়ে দেখেন। তাকালেই আপনার চোখের সঙ্গে যখন তাঁর চোখের মিলন হবে, তখনই আপনি তাঁকে অভিবাদন জানাবেন। এইভাবে আপনাকে ‘চান্স’ নিতে হবে। আমরা সকলেই তাই নিয়েছি এবং সেইভাবেই তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছি।’ অবশেষে আমিও তাই করলাম, অর্থাৎ চোখে চোখ পড়ার ‘চান্স’ নিলাম। ভদ্রমহিলার কথা ফলে গেল। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর তাঁর চোখ পড়ল আমার উপর, এবং আমি তাঁকে মাথা হেঁট করে অভিবাদন জানালাম। মিসেস হেস্টিংস সত্যিই খুব চমৎকার মহিলা। তিনি আমাদের কাছে উঠে এসে বসে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-পরিচয় করলেন।” (জানুয়ারি ১৭৮১)

হারমনিক ট্যাভার্নের খানাপিনা ও আমোদপ্রমোদের ব্যাপার নিয়ে হিকি সাহেব তাঁর ‘বেঙ্গল গেজেটে’ নির্মম ভাষায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেন। একবার হারমনিকের খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়েও গেজেটে তীব্র সমালোচনা

করা হয়, এবং ট্যাভার্নের পৃষ্ঠপোষকদের সভা ডেকে তার মীমাংসা করারও চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। ডিসেম্বর ১৭৮১, 'বেঙ্গল গেজেট' পত্রিকায় 'Sarcasm' নাম দিয়ে জনৈক রসিক ব্যক্তি এই বিষয়ে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি এই ঃ

At the Harmonic Tavern in Lall Bazar Street,
Where the hearty supporters of the STEWARDS meet ;
Where still to protect their bless'd *Constitution,*
They are come to the following wise resolution ;
RESOLV'D—That those Reptiles, who dar'd to express
In a libellous, vile and malicious *address*
An aversion to our belov'd SPOKESMAN (and thus
So apparent meant to reflect upon US)
Are too low for the notice of the SAWNEYS who meet,
At the Calcutta Tavern in Loll Bazar Street.
And after the most mature deliberation,
Much debate and much serious consideration ;
Since We cannot their insult severely resent,
We're determined to treat them with proper contempt ;
And, therefore, no means of revenge being known,
Be it farther RESOLV'D—that we let them alone.

হারমনিক ট্যাভার্ন তার পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে কলকাতার সমাজে দীর্ঘকাল জাঁকিয়ে বসেছিল। ১৭৮৫, জানুয়ারি মাসে হারমনিক ট্যাভার্নে ওয়ারেন হেস্টিংসকে তাঁর বিদায়কালীন 'address of thanks' দেবার জন্য মহানগরের মহামানীদের একটি সভা হয়। ১৭৯০-৯১ সালের দিকে হারমনিক ধীরে ধীরে একটি 'অ্যাকাডেমি'ও হয়ে উঠে। জনৈক M. Soubie বিজ্ঞাপন দিয়ে জানান যে, 'He keeps his school at the Harmonic where he attends Tuesdays, Thursdays, and Saturdays, from seven in the

morning till half past Ten o' Clock.' ট্যাভার্নে যখন স্থুরি সাহেব তাঁর স্কুলের ক্লাস নেবেন মনস্থ করেছিলেন, তখন তার পরিবেশ ঠিক যে ট্যাভার্নতুল্য ছিল তা বলা যায় না। অন্তত হারমনিকের মতন ট্যাভার্নের তা ছিল না।

ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ কফিহাউস। ১ জুলাই ১৭৯৮ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে এই কফিহাউসের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়। বিজ্ঞাপনে জানানো হয়ঃ "এক্সচেঞ্জ কফিহাউস ভদ্রলোক, বণিক ও ব্যবসায়ীদের জন্য ১লা জুলাই থেকে খোলা হবে। তিনটি বড় বড় ঘর থাকবে কফিহাউসে, এবং কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট ও ট্যাঙ্ক স্কয়ার দু'দিক থেকেই তাতে ঢোকার পথ থাকবে। কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে যত পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়, কফিহাউসের পরিচালকরা তার সবগুলিরই গ্রাহক হবেন, তাঁদের সহৃদয় পেট্রনদের সুবিধার জন্য। শুধু তাই নয়, 'two of the most approved London Papers'ও তাঁরা নিয়মিত কফিহাউসে রাখবার ব্যবস্থা করবেন, এবং তার সঙ্গে 'some of the most curious and interesting political pamphlets'ও তাঁরা বিদেশ থেকে আমদানি করবেন। উৎসাহী পেট্রনরা কফিপানের সঙ্গে তাঁদের নানারকমের কৌতূহলও (জ্ঞানের) যাতে চরিতার্থ করতে পারেন, সেদিকে পরিচালকরা বিশেষ নজর রাখবেন।"

১৭৯৯ সালেই এক্সচেঞ্জ কফিহাউস বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এ-হেন কফিহাউস কেন যে একবছরের মধ্যেই অচল হয়ে গিয়েছিল বলা যায় না। হয়ত মালিক যিনি তিনি ট্যাভার্ন বা কফিহাউসের ব্যবসায়ে বিশেষ এক্সপার্ট ছিলেন না, অথবা তাঁর পেট্রন-তোষণের ব্যবস্থা এত বেহিসেবী হয়ে গিয়েছিল, যে শেষ পর্যন্ত তিনি আর তাল সামলাতে পারেননি। ১০০৲ টাকা করে ১৬০০ টিকিট বিক্রির এক লটারির ব্যবস্থা করে তিনি কফিহাউসটি বেচে দিয়েছিলেন। মাত্র ১০০৲ টাকায়

এই ধরনের একটি কফিহাউসের মালিকানা পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়। সুতরাং টিকিট বিক্রি হয়েছিল, এবং কফিহাউসের মালিক ১০০৲ টাকা নয়, ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পেয়েছিলেন।

স্টার্নডেল সাহেব তাঁর কলকাতা কলেক্টরেটের ইতিহাসে বলেছেন যে ১৮০০ সালে কলকাতায় নানারকমের ৮টি হোটেল, ১১টি পাঞ্চ-হাউস এবং আরও কতকগুলি ইয়োরোপীয়ানদের বোর্ডিং-লজিং হাউস ছিল। অধিকাংশই তখন ট্যাভার্ন বা পাঞ্চহাউস নামে পরিচিত ছিল, 'হোটেল' নাম খুব বেশী ছিল না। অনেক ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী তখন 'কফিহাউস' নামটিও খুব পছন্দ করতেন। জনৈক William Doughty ১৮০৫ সাল থেকে কলকাতা শহরে হোটেলের ব্যবসা করতে আরম্ভ করেন। ১৮০৭ সালে তিনি 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপনে জানান যে, "he has taken that well situated and most extensive House, belonging to the Estate of General Martine, opposite to the college and the South-West corner of Tank Square, where he has spared no expence in fitting it up for the reception of Families and Gentlemen arriving from Europe…" এই বিজ্ঞপ্তির পর তিনি 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' (N.B) বলে উল্লেখ করেছেন "W. D. begs leave to observe that his house in future will be conducted under the title of the Crown and Anchor Hotel and British Coffee House". হোটেল নামের সার্থকতা বোঝা যায়, কিন্তু ডব্লু ডি-র 'ব্রিটিশ কফিহাউস' নামের প্রতি অনুরাগের কারণ কি, বিশেষ করে কলকাতা শহরে, তা বোঝা যায় না। শুধু এইটুকু বোঝা যায় যে জনসনযুগের লণ্ডনের অনেক সামাজিক বৈশিষ্ট্য ইংরেজরা তখন বেশ সচেতনভাবেই বাংলাদেশে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কলকাতার ট্যাভার্ন ও কফিহাউস অন্যতম।

কেবল কলকাতা শহরে নয়, কলকাতার বাইরে ইয়োরোপীয়দের অন্যান্য বাণিজ্য-বসতিকেন্দ্রে ও বন্দরে ট্যাভার্ন ও পাঞ্চহাউস আঠার শতক থেকেই গড়ে উঠেছিল। কলকাতার পঁচিশ মাইল দক্ষিণে ফলতা তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় ঘাঁটি ও বন্দর ছিল। নদীপথে কলকাতায় যাতায়াতের সময় সাহেবরা প্রায়ই ফলতাতে হল্ট করতেন। সেখানে তাঁদের আপ্যায়ন-অভ্যর্থনার জন্য বেশ ভাল দু'একটি ট্যাভার্ন গড়ে উঠেছিল। ১৮০২ সালে ফলতার একটি ট্যাভার্ন বিজ্ঞাপনে জানিয়েছিল যে তার অবস্থা, "by no means disgraceful to the most improved style of architecture. A number of captains, travellers of consequence land here, taking their departure to their various destinations in India." ১৮০৫ সালে এক ব্রিটিশ ভদ্রমহিলা ফলতার ট্যাভার্ন দেখে খুশি হয়ে লেখেন, "It was decent respectable place." ১৮১৩ সালে ফলতার ট্যাভার্ন সম্বন্ধে আর একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি লেখেন যে 'মেসার্স হিগিনসন অ্যাণ্ড বল্ডুইন' হলেন ট্যাভার্নের মালিক, এবং যাত্রীরা সেখানে স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করে যাতে ক্লান্তি দূর করতে পারেন, তার বেশ সুব্যবস্থাই মালিকরা করেছেন। ১৮১৭ সালে আর একজন পর্যটক লেখেন যে ফলতার ট্যাভার্নের মালিক হলেন একজন ডাচম্যান, "who consoled us by a most sumptuous breakfast, for which we paid two rupees each." ব্রেকফাস্টের দক্ষিণা আজকালকার অভিজাত হোটেলের তুলনায় নেহাৎ কম ছিল না।

ফলতার মতন শ্রীরামপুর, চানক (বারাকপুর) প্রভৃতি স্থানেও ভাল ভাল ট্যাভার্ন ছিল। শ্রীরামপুর ট্যাভার্নের একটি প্রাচীন বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, মালিক চার্লস মেটন তাঁর পেট্রনদের প্রলুব্ধ করার জন্য জানাচ্ছেন ঃ

"Sirampore Tavern"

"Charles Maton" having taken the house near the Water side, lately occupied by Major Briton, and fitted up the same as a Tavern and Hotel, Respectfully acquaints the Gentlemen of Calcutta, that they may depend on every possible accommodation, good provisions and the best of liquors. Beds also may be had and Boarding, on Reasonable Terms.

N.B.—A very good Billiard Table and Skittle Ground.

Mrs. Maton makes up all sorts of Millenary in the neatest manner. 9th December, 1780.

ট্যাভার্ন-পাঞ্চহাউসের ব্যবসা প্রধানত ইয়োরোপীয়দেরই একচেটিয়া ছিল। পরে লাভবান ব্যবসা বলে বাঙালী বণিকরা এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কলকাতার নানাস্থানে, বিশেষ করে 'নেটিব' ব্যবসাকেন্দ্র ধর্মতলা, চীনাবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে, এদেশী ব্যবসায়ীরা পাঞ্চহাউসের ও ট্যাভার্নের ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন। এরকম একজন চীনাবাজারের বাঙালী পাঞ্চহাউস-কিপারের কথা 'গ্রিফিন' তাঁর *Sketches of Calcutta* (Glasgow, 1843) পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বাঙালী ব্যবসায়ীর নাম শ্রীকৃষ্ণ দত্ত। শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চহাউসের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কাঠের আসবাবপত্তর বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না, এমন কি ভাঙ্গাচোরা টেবল-বেঞ্চও না। তার মধ্যে নানাদেশীয় লোকের সমাগম হত এদেশীয় পচাই-সুরার আকর্ষণে। ডাচ, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ, ট্যাঁস-ফিরিঙ্গি, বাঙালী, বিহারী, ওড়িয়া সকল জাতের লোকের পায়ের ধুলোয় শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চহাউস আন্তর্জাতিক তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ দত্ত মহাশয়ের পাঞ্চহাউসকে আন্তর্জাতিক পচাইখানা বলা যেত। মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী কাস্টমারদের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের সংকট দেখা দিত। সংকটের

সমাধান করা হত আদিম সাংকেতিক ভাষায়। 'গ্রিফিন' চমৎকার ভাষায় ভাবের এই সাংকেতিক আদান-প্রদানের বিবরণ দিয়েছেন ঃ

> Jack is altogether ignorant of Bengalee, and the native spirit-dealer is ignorant of English, but the former wants liquor and the latter wants money, and therefore the language of signs is very expressive.

জ্যাক একবর্ণও বাংলা জানে না, পচাইখানার মালিকও একবর্ণও ইংরেজী জানে না। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি চায় পচাই, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি চায় টাকা। অতএব দু'জনের ভাব-প্রকাশের পক্ষে ইঙ্গিতের ভাষাই যথেষ্ট। এই সব পাঞ্চহাউস ও ট্যাভার্নের কথা মনে করে 'গ্রিফিন' কলকাতা শহরের 'pleasures of liberty and brandy' অফুরন্ত ও অতুলনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ দত্তের মতন নিশ্চয় আরও অনেক বাঙালী ব্যবসায়ী ট্যাভার্ন ও কফি-পাঞ্চহাউসের ব্যবসা করতেন, এবং সেগুলি প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির লেনদেনের একটা কেন্দ্রও ছিল বলা চলে। তবে লেনদেনটা হত সাংস্কৃতিক তলানির।

স্পেন্সেস হোটেল। আধুনিক যুগে 'হোটেল' বলতে যা বোঝায়, সেই ধরনের বাসস্থান আঠার শতকের মধ্যে কলকাতা শহরে গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয় না। তার কারণ কলকাতা শহরে তখন যাঁরা যাতায়াত করতেন, তাঁদের ঠিক হোটেলের মতন কোন জায়গায় থাকার বিশেষ প্রয়োজন হত না। ব্যবসায়ের দিক থেকে হোটেল তখন লাভের ব্যবসাও ছিল না। দু'চার দিনের জন্য শহরে যাঁদের মাথা গোঁজার দরকার হত, তাঁরা তা কোনরকমে ট্যাভার্নের ঘরেই মিটিয়ে নিতেন। হোটেলের আরাম-বিরাম, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁদের প্রয়োজন হত না। আঠার শতক পর্যন্ত তাই ইংলণ্ডের শহরের

মতন কলকাতা শহরেও ট্যাভার্ন ও কফিহাউসের প্রাচুর্য ছিল। জনসনযুগের লণ্ডন শহরের সঙ্গে কলকাতার এইদিক দিয়ে সাদৃশ্য ছিল তখন।

উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই মনে হয় কলকাতা শহরে হোটেল গড়ে উঠতে থাকে। কলকাতার আকার-গড়ন, বসতিবিন্যাস, লোকসংখ্যা, ব্যবসাবাণিজ্য, বিদ্যাচর্চা ইত্যাদি সবই তখন থেকে দ্রুত বাড়তে আরম্ভ করে। নানাস্থানের লোকজনের আনাগোনাও বাড়ে শহরে। ব্যবসায়ীরা হোটেল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। এই সময় যেসব হোটেল গড়ে ওঠে, তার মধ্যে 'স্পেন্সেস হোটেল' খুব প্রাচীন। নানাদিক থেকে স্পেন্সেসের একটা ঐতিহাসিক খ্যাতিও আছে। উনিশ শতকের প্রথমভাগে কলকাতায় হোটেল বলতে স্পেন্সেস এবং স্পেন্সেস বলতে হোটেল বোঝাত। এরকম প্রতিষ্ঠা ও সুনাম তখনকার দিনে আর কোন হোটেলের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। মনে হয়, ১৮৩০ সালে স্পেন্সেস হোটেল স্থাপিত হয়েছিল। কলকাতার সুপ্রিমকোর্টের অ্যাডভোকেট জর্জ জনসন ১৮৩০-এর গোড়ার দিকে কলকাতায় আসেন। তিনি লিখেছেন ঃ "কলকাতাগামী জাহাজ 'কেডিগ্রি' (খেজুরী) পর্যন্ত পৌঁছলে, বিদেশী যাত্রীদের উচিত একটি চিঠি ডাকহরকরার নৌকয় কলকাতার কোন বন্ধুর কাছে, অথবা মিঃ স্পেন্স বা মিঃ উইলসন যে-কোন একজনের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আগমন-সংবাদ জানানো।" মিঃ স্পেন্স হলেন স্পেন্সেস হোটেলের মালিক, উইলসন হলেন অকল্যাণ্ড হোটেলের মালিক। শহরাভিমুখী যাত্রীরা কলকাতায় পৌঁছবার আগে খেজুরী বন্দর থেকেই স্পেন্সেস বা অকল্যাণ্ড হোটেলের কামরা রিজার্ভ করার জন্য আগে খবর পাঠাতেন। অকল্যাণ্ডের চেয়ে স্পেন্সেসের কাছেই অবশ্য বেশী খবর পৌঁছত।

জন স্পেন্স ঠিক কোন্ সময় থেকে এই হোটেলের ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন তা জানা যায়নি। ১৮৩২ সালের *Bengal*

*Register*এ 'সেটেলমেণ্টের' (কলকাতার) ইউরোপীয় অধিবাসীদের মধ্যে জন স্পেন্সের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর কাজকর্মের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৮৩৪ সালের *Calcutta Directory*-তে John Spence, Calcutta Hotel, Waterloo Street, also at Becher's Place"—এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে জন স্পেন্সের হোটেল-ব্যবসায়ের হদিশ মেলে। বর্তমান ওয়েলেসলি প্লেস ও ফ্যান্সি লেনই স্পেন্সেস হোটেলের আদিনিবাস।

১৮৩০-৪০এর মধ্যে স্পেন্সেস হোটেলের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কেবল খেজুরী বন্দরে পেঁ ীছেই যে কলকাতার নবাগতরা স্পেন্সেস হোটেলে খবর দিতেন তা নয়, গ্রিফিন লিখেছেন যে ডিঙ্গি বা নৌকয় করে কলকাতার চাঁদপাল ঘাটে পেঁ ীছলেই পাল্কি-বেয়ারারা ঘিরে ধরত এবং শহরের কোন জায়গায় নিয়ে যেতে বললেই সোজা স্পেন্সেস হোটেলে নিয়ে গিয়ে হাজির করত। "The bearers soon ask where to carry? Sahib would say—*Burra Potch Khanna*—great dinner house. In a few minutes they would take to Spence's Hotel." (A Griffin; *Sketches of Calcutta,* ৩১-৩৫)।

স্পেন্সেস হোটেলের খরচের হিসেব দেখে মনে হয়, স্বল্পবিত্ত সাধারণ লোকের পক্ষে সেখানে থাকা সম্ভব হত না। জন স্পেন্স সম্বন্ধে 'গ্রিফিন' বলেছেন, "He may be said to have originated hotels in Bengal" (২৮৫ পৃষ্ঠা)। হোটেলের 'রেট' সম্বন্ধে তিনি বলেছেনঃ "একজনের একখানি থাকার ঘর, ব্রেকফাস্ট, টিফিন, ডিনার ও চা নিয়ে একমাসের জন্য ১০০৲ টাকা; তিন সপ্তাহের জন্য ৯০৲ টাকা; দু'সপ্তাহের জন্য ৭০৲ টাকা; এক সপ্তাহের জন্য ৪০৲ টাকা, এবং একদিনের জন্য ৬৲ টাকা। সুরাপানের খরচ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এক বোতল ক্ল্যারেট, শেরি, পোর্ট ও মদিরার জন্য ৩৲ টাকা, এক বোতল ব্র্যাণ্ডি, জিন ও হুইস্কির জন্য ২৷৹ টাকা,

এবং এক বোতল শ্যাম্পেনের জন্য ৬৲ টাকা দিতে হয়" (২৮৬ পৃষ্ঠা)। অ্যাডভোকেট জনসন যে 'রেটের' কথা বলেছেন তা আরও একটু বেশী মনে হয়। তিনি লিখেছেন ঃ "হোটেলের একতলায় শোয়া-বসার আলাদা ঘরের দু'কামরার 'সুট' নিয়ে থাকতে হলে, খাওয়া সমেত মাসে ২৫০৲ টাকা খরচ লাগত। দোতলায় ও তেতলায় তিন কামরার 'সুট' ছিল, এবং সেখানে থাকার খরচ লাগত মাসে ৩৫০৲ টাকা (G. W. Johnson : *The Stranger in India*, Vol. I, ৩৪-৩৫)। ১৮৪১ সালের 'গেজেটিয়ারে' স্পেন্সেস হোটেলে থাকা-খাওয়ার যে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় তা এই ঃ

প্রতিমাসের খরচ, একজনের

কামরা	১	২	৩	৪	৫	প্রতি কামরার জন্য ১০০৲ টাকা
টাকা	১০০	২৫০	৩৫০	৪৫০	৫৫০	
			তিনসপ্তাহের খরচ			
	৯০	২২৫	৩১৫	৪০৫	৪৯৫	
			দু'সপ্তাহের খরচ			
	৭০	১৭৫	২৪৫	৩১৫	৪১৫	
			একসপ্তাহের খরচ			
	৪০	১০০	১৪০	১৮০	২২০	
			একদিনের খরচ			
	৬	১৫	২৫	২৭		

অতিথির খরচ ঃ প্রতিদিন ৫৲

শহরে অন্যান্য আরও হোটেল যে ছিল না তা নয়। গেজেটিয়ারে আরও তিনটি হোটেলের নাম আছে ঃ

উইলসন্স হোটেল—গভর্নমেণ্ট প্লেস ইস্ট
বেনিটো হোটেল—গভর্নমেণ্ট প্লেস নর্থ
বেণ্টন্‌স হোটেল—রাণীমুদি গলি

কিন্তু এসব হোটেল থাকলেও, 'গ্রিফিন' বলেছেন যে স্পেন্সের সঙ্গে কারও তুলনা হয় না: "There are two others, but Benton's cannot be compared to Spence's, and Bodry's has not the smallest claim to similarity." জন স্পেন্স হোটেল ও কফিহাউস দু'য়েরই ব্যবসা একসঙ্গে করতেন। কিন্তু দুই জায়গায় দুটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেইজন্য পুরনো রেজিস্টারে ও গেজেটিয়ারে দু'টি পৃথক ঠিকানা দেখা যায়। পরে একটি বাড়িতেই কফিহাউস ও হোটেল প্রতিষ্ঠিত হয়। স্পেন্সের কফিহাউস তখনকার দিনে সবচেয়ে অভিজাত মজলিসকেন্দ্র ছিল। কেবল ইয়োরোপীয়রা নন, এদেশীয় সম্ভ্রান্ত ধনিকেরাও স্পেন্সের কফিহাউসে মধ্যে মধ্যে সান্ধ্য মজলিসে মিলিত হতেন। কলকাতার 'মজলিসী-কালচারকে' কফিখানা হোটেলের ভিতর দিয়ে জন স্পেন্স একটা শোভন, সুন্দর ও সংযত রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এ চেষ্টা কলকাতার কালচার-স্নবদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার মতন।

স্পেন্সেস হোটেলের একটি ঐতিহাসিক স্মৃতির কথাও এখানে উল্লেখ করা উচিত। ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইউরোপ থেকে কলকাতায় ফিরে এসে স্পেন্সেস হোটেলে ওঠেন। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আগে থেকে সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁর জন্য কয়েকখানি ঘর বিলেতি কায়দায় আসবাবপত্তর দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, মধুসূদন সেইখানেই এসে বাস করবেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। কলকাতার শ্রেষ্ঠ অভিজাত হোটেল স্পেন্সেসেই তিনি উঠেছিলেন। তাঁর আগমনবার্তা শহরময় রাষ্ট্র হবার পর বন্ধুবান্ধবরা সকলে স্পেন্সেস হোটেলেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য হোটেলে আসেন, এবং মধুসূদন তাঁকে দেখে দৌড়ে এসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেন। কি করবেন ভেবে না পেয়ে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে মধুসূদন

দু'হাতে বিদ্যাসাগরের গলা জড়িয়ে ধরে ঘন-ঘন তাঁকে চুম্বন করে নৃত্য করতে থাকেন। বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন, বাংলার দুই শ্রেষ্ঠ যুগপ্রতিভার এই ঐতিহাসিক মিলনদৃশ্য স্পেন্সেস হোটেলের ঘরেই অভিনীত হয়েছিল। মধুসূদন প্রায় আড়াই বছর স্পেন্সেস হোটেলে ছিলেন। এই সময় কলকাতা শহরের শ্রেষ্ঠ বাঙালীরা স্পেন্সেসে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। নবযুগের বাংলার প্রতিভাবান পুরুষদের কাছে অন্তত আড়াই বছরের জন্য যে স্পেন্সেস হোটেল তীর্থস্থানে পরিণত হতে পেরেছিল, সেজন্য তার প্রতিষ্ঠাতা স্পেন্স সাহেব যথেষ্ট গর্ব বোধ করতে পারেন।

উইলসন-অকল্যাণ্ড-গ্রেট ইস্টার্ন। স্পেন্সেস ছাড়াও আরও দু'তিনটি হোটেল যে তখন কলকাতায় গড়ে উঠেছিল, সেকথা আগে বলেছি। তার মধ্যে উইলসন্স বা অকল্যাণ্ড হোটেলের নাম স্পেন্সের পরেই উল্লেখযোগ্য। ডেভিড উইলসন এই হোটেল ১৮৩৫ সালে স্থাপন করেন। কলকাতা শহরে হোটেলের ব্যবসায়ে জন স্পেন্সের মতন উইলসনও একজন উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। ইতিহাসের দিক থেকে স্পেন্সের পরেই তাঁর নাম করা উচিত। ডেভিড উইলসন শহরের লোকের কাছে 'ডেইন্টি ডেভি' (Dainty Davie) নামে পরিচিত ছিলেন। কলকাতার গাড়োয়ান ও পাল্কিবেয়ারারা তাঁর হোটেলকে উইলসন সাহেবের হোটেল বলত, যদিও তার নাম ছিল 'অকল্যাণ্ড হোটেল'। পরে এই অকল্যাণ্ডই 'গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল' নাম ধারণ করে। 'গ্রেট ইস্টার্ন' নামে ব্যবসা আরম্ভ করার সময় সাময়িক পত্রিকায় তার যে পূর্বের ইতিহাস প্রকাশিত হয়, তার মর্ম এই ঃ

মেসার্স ডি. উইলসন অ্যাণ্ড কোং সম্প্রতি 'The Great Eastern Hotel Company Ld' নামে হোটেলের ব্যবসা করতে

আরম্ভ করেছেন। ব্যবসায়ের মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা, ৬ হাজার শেয়ারে ২৫০৲ টাকা করে বিভক্ত। হোটেলটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৫ সালে। মিস্টার ডি. উইলসন 'ডেইন্টি ডোভ' নামে পরিচিত এবং এই কোম্পানির ১৫০০ শেয়ারের মালিক। ডেভিড উইলসন অনেক আগে ১৮৫১ সালে ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রীট ও রানী মুদি গলিতে (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট) জায়গা কিনে কতকগুলি দোকান খুলেছিলেন, এবং হোটেলের ব্যবসাও আরম্ভ করেছিলেন। তখন তাঁর হোটেলের নাম ছিল 'Auckland Hotel and Hall of all Nations'. এর চোদ্দ বছর পরে, ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫, তিনি 'গ্রেট-ইস্টার্ন' নামে নতুন কোম্পানি করে ব্যবসাটিকে আরও বাড়াবার চেষ্টা করেন। 'Great Eastern Hotel, a Wine and General Purveying Company Limited'—এই ছিল কোম্পানির পুরো নাম। (*The Calcutta Monthly Magazine,* June 16, 1862).

অকল্যাণ্ডের বদলে 'গ্রেট ইস্টার্ন' নামকরণ সম্বন্ধে পত্রিকায় লেখা হয়ঃ "By a curious mistake the Company was described in the conveyance as the Great Eastern Hotel Company Ltd., instead of by its original title of the 'Auckland Hotel and Hall of all Nations". আমাদেরও তাই মনে হয়। অকল্যাণ্ড হোটেলের নামটি, আমাদের মতে, অনেক বেশী সুন্দর ছিল, তার শেষের 'Hall of all Nations' এই অতিরিক্ত পদটির জন্য। আজকের দিনে হঠাৎ শুনলে মনে হয়, U. N. O. বা রাষ্ট্রসংঘের কোন শাখা-প্রতিষ্ঠান হতে পারে। উইলসন সাহেব অবশ্য একশ' বছর আগে প্রখর আন্তর্জাতিকতাবোধের দিক থেকে যে তাঁর হোটেলের নামের শেষে 'Hall of all Nations' পদটি যোগ করেছিলেন তা মনে হয় না। কিন্তু তা হলেও তাঁর নামকরণের মধ্যে নতুনত্ব ও কৃতিত্ব

দুইই ছিল। এদিক দিয়ে স্পেন্স সাহেবকে, ব্যবসায়ের দিক থেকে না হলেও, নাম-নির্বাচনের দিক থেকে উইলসন সাহেব যে হার মানিয়ে ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। হোটেলের ব্যবসায়ে তিনি স্পেন্সের অনুগামী হলেও, হোটেলের আধুনিক 'ডেফিনিশন' নির্ধারণে তিনি এক্ষেত্রে অন্যান্য সকল ব্যবসায়ীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আজ থেকে প্রায় ১২৫ বছর আগে, যখন হোটেল সম্বন্ধে মানুষের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, তখন হোটেলের এরকম একটি আভিধানিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা সহজ কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। আজকের দিনেও যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, 'হোটেল কাকে বলে' এবং যদি কেউ তার উত্তরে বলেন, 'হোটেল' হল 'The Hall of all Nations,' তাহলে কোন ভুল হয় কি? বিংশ শতাব্দীর হোটেল-ব্যবসায়ীরাও স্বচ্ছন্দে উইলসনের এই 'ডেফিনিশনটি' হোটেলের মডার্ন বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করতে পারেন।

আগের বিবরণ থেকে বোঝা যায়, আঠার শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত কলকাতা শহরে ট্যাভার্ন ও কফিহাউসের হঠাৎ যেন একটা জোয়ার এসেছিল। জোয়ারের বেগ তারপর থেকে কমতে থাকে, এবং ধীরে-ধীরে একেবারে লোপ পেয়ে যায়। তার বদলে নানারকমের হোটেল ও চায়ের দোকান বা রেস্টুরেণ্ট গড়ে উঠতে থাকে। কফিহাউস ও ট্যাভার্নগুলি প্রায় একশ' বছর কলকাতার নতুন শহুরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রশ্ন হল, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এখানকার শহুরে সমাজে ও সাংস্কৃতিক জীবনে তারা কোন প্রভাব বিস্তার করেছিল কিনা, এবং করে থাকলে কোন্‌দিক থেকে কতখানি করেছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, আঠার-উনিশ শতকে বাংলাদেশে যে নতুন সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ হচ্ছিল কলকাতা শহর কেন্দ্র করে, তার উপর

বিশেষ কোন প্রভাব ট্যাভার্ন-কফিহাউসের পড়েনি। যেটুকু পড়েছিল তা হয়ত সমাজের তলার দিকে, চীনাবাজারের শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চহাউসের মতন আড্ডাখানার ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে এসেছিল। সেটা পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির একটা পাঁচমেশালি তলানি ছাড়া কিছু নয়, এবং তার অধিকাংশই আমাদের এদেশের সমাজের নর্দমা দিয়ে ভেসে চলে গেছে। হয়ত তারও কিছুটা তলানি সমাজের আনাচেকানাচে কোথাও জমেছে।

আঠার শতকের ইংলণ্ডের শহুরে সমাজ-জীবনের একটা নিদর্শন-রূপে ট্যাভার্ন-কফিহাউস আমাদের সমাজের শহরে শহরে আমদানি হয়েছিল। কেবল কলকাতায় নয়, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরেও ট্যাভার্ন-কফিহাউস যথেষ্ট গড়ে উঠেছিল। ইংলণ্ডের শহরে কফিহাউস গড়ে ওঠার কারণ কি? কফি ও চা দুয়েরই আস্বাদ ইংরেজরা পেয়েছিলেন 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র দৌলতে। সমাজ-ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান লিখেছেন ঃ

> …in Charles II's reign thousands of well-to-do Londoners frequented the 'coffee-houses,' to enjoy the fashionable new drinks brought over by the East India Company. But early in the reign of George III all classes in town and country were drinking tea in their own homes. In his Farmer's Letters for 1767 Arthur Young complained that 'as much superfluous money is expended on tea and sugar as would maintain four millions more subjects on bread.' Tea drinking had become a national habit, a rival to the consumption of spirits and beer; 'the cups that cheer but not inebriate' were already as well known and as highly valued in the labourer's cottage as in the poet Cowper's parlour." (G.M. Trevelyan : *English Social History*, ৩৮৬-৮৭).

দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালেই হাজার হাজার অবস্থাপন্ন লণ্ডনাররা কফিহাউসে যেতে আরম্ভ করেছিলেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমদানি নতুন কফি-পান করার জন্য। কিন্তু তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালের গোড়ার দিকেই শহরে ও গ্রামে ইংলণ্ডের লোকেরা ঘরে বসেই চা-পান করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। ১৭৬৭ সালে আর্থার ইয়ং লেখেন যে ইংলণ্ডের লোক এত টাকা চা-চিনিতে খরচ করতেন যে তাতে অন্তত ৪০ লক্ষ লোকের রুটির খরচ যোগানো যেত। চা-পান ক্রমে ইংলণ্ডে একটা জাতীয় অভ্যাসে পরিণত হল, এবং বিয়ার ও সুরাপানের রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। চা হল এমন এককাপ পানীয় যা মাতায়, কিন্তু মাতাল করে না, তাই মজুরের ঘর থেকে কবি কুপারের 'পার্লার' পর্যন্ত চায়ের আদর বেড়ে যেতে লাগল।

ট্রেভেলিয়ানের এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, কফি ও চা দুইই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমে ও ইংলণ্ডে প্রচলিত হয়েছিল, এবং চায়ের আগে কফি-পান শুরু হয়েছিল শহরে। তাই চাখানার বদলে লণ্ডন শহরে আঠার শতকে কফিহাউসের অত প্রাচুর্য দেখা যায়। কফির দাম বেশী বলে শহরের অবস্থাপন্ন উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের বাইরে কফি-পান তেমন জনপ্রিয় হয়নি। কিন্তু তা না হলেও কফিহাউসগুলি ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। জনসনের যুগের ইংলণ্ডের এইটাই ছিল বড় বৈশিষ্ট্য। এক-একটি কফিহাউস এক-একশ্রেণীর বৃত্তিজীবীর মিলনকেন্দ্র ছিল। বণিক-ব্যবসায়ীরা 'রয়াল এক্সচেঞ্জ', 'গ্যারাওয়ে', 'জোনাথান', 'টমাস ও লয়েডস' কফিহাউসে নিয়মিত মিলিত হতেন। পুস্তক-প্রকাশকদের মেলামেশার স্থান ছিল 'চ্যাপ্টার কফিহাউস', এবং ডাক্তারদের জন্য ছিল 'ব্যাটসন্স'। 'টেম্পলবার' ও 'কোভেণ্ট গার্ডেন' কফিহাউসে ইংলণ্ডের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও রসিকদের মজলিস বসত। সাহিত্যিকদের এই মজলিসে লণ্ডনের শৌখিন অভিজাতরাও মধ্যে মধ্যে এসে যোগ দিতেন। কিন্তু অভিজাতদের জন্য ছিল সেণ্ট জেম্‌স স্ট্রীট ও পল্‌মলের বিখ্যাত

'কফি-চকোলেট-হাউস'। কোভেণ্ট গার্ডেনে সাহিত্যিকদের আড্ডা বসত বটে, কিন্তু 'বেডফোর্ড' কফিহাউস ছিল সাহিত্যিক-শিল্পীদের হেড-কোয়ার্টার। সেখানে ফিল্ডিং, হগার্থ, মার্ফি, কলম্যান প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিকরা মিলিত হতেন। ড্রাইডেন, অ্যাডিসন, স্টীল, এঁরা মিলিত হতেন ব্যাটন্স ও উইল্‌স কফিহাউসে। প্রত্যেক কফিহাউস এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর ও গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল। শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, ডাক্তার, নানাশ্রেণীর ব্যবসায়ী সকলেই নিজেদের এক-একটি গোষ্ঠী তৈরি করে স্বতন্ত্র কফিহাউসে মেলামেশা করতেন। তখনকার ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত সমাজের যে-কোন গোষ্ঠীর লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে তাঁদের বাড়িতে না গিয়ে নির্দিষ্ট কফিহাউসে গেলেই চলত। তাতে আরও সুবিধা হত এই যে একজন সাহিত্যিক বা ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয় না হয়ে, আরও বহু সাহিত্যিক ও ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয় হত। অর্থাৎ লণ্ডনের বণিকসমাজ, বিদ্বৎসমাজ, শিল্পীসমাজ ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হতে হলে তাঁদের নির্ধারিত কফিহাউসের প্রবেশ-পত্র না পেলে চলত না। জনসনের যুগের কফিহাউসগুলিকে এইদিক দিয়ে নিঃসন্দেহে সংস্কৃতিচক্র বলা যায়। জনসন নিজে অবশ্য কফি-হাউসের চেয়ে ট্যাভার্নের পরিবেশই বেশী ভালবাসতেন, এবং তাঁর বিচিত্র ঐতিহাসিক জীবন ট্যাভার্নের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ট্যাভার্নের চেয়ারটিকে জনসন 'the throne of human felicity' মনে করতেন। কফিহাউসে একশ্রেণীর মানুষের একঘেয়ে সমাবেশ তাঁর ভাল লাগত না, তার চেয়ে ট্যাভার্নের মানব-বৈচিত্র্য তাঁকে অনেক বেশী প্রেরণা দিত। (*Johnson's England, An Account of the Life and Manners of his Age :* Edited by A. S. Turberville, Oxford 1933, Vol. I. ১৭৭-৮০)

কফিহাউসের আরও সঠিক ইতিবৃত্ত রচনা করতে হলে বলতে হয়, এর উৎপত্তিস্থল অদূর-প্রাচ্য (Near East)। সেখান থেকে কনস্টানটি-নোপোল, ভিয়েনা ও হামবুর্গ-মার্সাইয়ের মতন বন্দর-শহরের ভিতর দিয়ে

ক্রমে কফিহাউস পৌঁছেছিল লণ্ডনে। লণ্ডনে প্রথম কফিহাউস স্থাপিত হয় ১৬৫২ সালে, প্যারিসে হয় স্টক-এক্সচেঞ্জের কাছে ১৬৭১ সালে। ইংলণ্ডে তখন গণতন্ত্রের ঊষাকাল। সমাজ তার আভাস পাচ্ছে জীবনে। এই সদ্যোজাত গণতান্ত্রিক সমাজের প্রথম অস্ফুট কলকাকলি শোনা যায় কফিহাউসে—"the coffee-houses became the first centres of opinion in a partially democratised society" (Mannheim). তখনও দৈনিক সংবাদপত্রের যুগ আসেনি। সংবাদপত্রের মতন দেখতে বৃহদাকারের নানারকম সব পত্রিকা প্রকাশিত হত, কিন্তু সেগুলি শাসকরা 'সেন্সর' করতেন, এবং তা নিয়মিত পড়ার অভ্যাসও লোকের হয়নি। সুতরাং "the Coffee-houses··· presented a place for free expression, where pamphlets were read and speeches given" (Mannheim). আমাদের কলকাতার কফিহাউসেরও দু'একজন স্বত্বাধিকারী তাঁদের পেট্রনদের জন্য প্যাম্ফলেট রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। 'ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ কফিহাউস'এর মালিক ১৭৯৮ সালে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়েছিলেন যে তিনি 'some of the most curious and interesting political pamphlets' বিদেশ থেকে আমদানি করার ব্যবস্থা করবেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, আঠার শতকে কফিখানার রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল খুব বেশী। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। (Karl Mannheim : *Essays on The Sociology of Culture*, ১৩৮-৩৯)

আধুনিক ক্লাবের (Club) বিকাশ হয়েছিল কফিহাউসের পরে। কফিহাউস যখন ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে গেল, তখন ইংলণ্ডের শহর-নগর ক্লাবে-ক্লাবে ছেয়ে গেল। সমাজতত্ত্ববিদ্ ম্যানহাইম বলেছেন: "The clubs retained much of the character of the coffee-houses. First of all, they mostly centred around shared opinions." কফিহাউসের বৃত্তিকেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধতার

বৈশিষ্ট্য নিয়ে আধুনিক ক্লাব গড়ে উঠেছে, এবং পরবর্তী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ক্লাবের প্রভাব বেড়েছে সবচেয়ে বেশী।

ইংলণ্ডের সমাজে ট্যাভার্ন-কফিহাউসের যে প্রবল প্রভাব ছিল, বাংলার সমাজে কলকাতার ট্যাভার্ন ও কফিহাউসের প্রভাব তার শতাংশের একাংশও ছিল না। বিদেশী ব্যবসায়ীরা এখানে ঠিক ইংলণ্ডের শহরের অনুকরণে এই সব ট্যাভার্ন ও কফিখানা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা তাঁদের ব্যর্থ হয়েছিল। এদেশের সম্ভ্রান্ত ইংরেজরাও এগুলিকে আপনার করে নিতে পারেননি। বেডফোর্ড, কোভেণ্ট গার্ডেন বা জনসনের ট্যাভার্নের মতন একটিও কফিহাউস বা ট্যাভার্ন কলকাতা শহরে গড়ে উঠতে পারেনি। তার কারণ, আমাদের বাংলার সমাজ ইংরেজদের প্রভাবেও লণ্ডন-সমাজের মতন বাইরের জীবনের অনুরাগী হয়ে ওঠেনি। তাই উনিশ শতকের কোন শ্রদ্ধেয় বাঙালী সমাজনেতা বা সাহিত্যিক কলকাতার কফিহাউস বা ট্যাভার্নের মজলিসে যোগ দিয়েছেন বলে শোনা যায় না। রামমোহন রায় থেকে দেশের সাধারণ লোকের জীবনে পর্যন্ত ঘর ও বৈঠকখানার প্রভাবই তখন সর্বাধিক ছিল। ট্যাভার্ন-কফিহাউস, এমন কি বাইরের সভা-সমিতি পর্যন্ত, দীর্ঘকাল এদেশের ঘরোয়া-বৈঠকখানার বিকল্প মজলিসকেন্দ্র হতে পারেনি। নব-যুগের বাংলার বুদ্ধিজীবীরা, এমনকি চরম-প্রগতিপন্থী ডিরোজিয়ান বা ইয়ংবেঙ্গল দলও যে কফিহাউসে মিলিত হতেন, তার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। অথচ ইয়ংবেঙ্গলের 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর বৈঠক ডিরোজিওর বৈঠকখানায় বা শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে না বসে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে কলকাতার কোন ভাল কফি-হাউসে বা ট্যাভার্নে বসতে পারত। কিন্তু তা বসত না। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকান বিপ্লব, ইংলণ্ডের রিফর্ম ইত্যাদি বিষয়ে বিদেশী রাজনৈতিক পুস্তক-পুস্তিকা পড়বার আগ্রহ ইয়ংবেঙ্গলের যথেষ্ট ছিল, এবং সেজন্য তাঁরা জাহাজের পথ চেয়ে থাকতেন। 'ক্যালকাটা এক্সচেঞ্জ কফিহাউস'-এর মতন কোন জায়গায় তাঁদের যাতায়াত থাকলে তাঁরা হয়ত এই ধরনের

অনেক পুস্তক-পুস্তিকার খবর পেতেন। কিন্তু সেরকম কোন কফিহাউসের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল বলে মনে হয় না। হয়ত তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দু'একবার কফিহাউসে 'হানা' দিয়েছেন, বিদেশী রাজনৈতিক পুস্তিকাদির সন্ধানে, কিন্তু লণ্ডনের মতন কলকাতার কোন ট্যাভার্ন বা কফিহাউস তাঁদের গোষ্ঠীবদ্ধ পোষকতায় ধন্য হয়ে ওঠেনি। এদেশের কফিহাউস তাই বিদেশী পরগাছার মতন গজিয়ে উঠে মাটির রসের অভাবে আপনা থেকেই শুকিয়ে গেছে। গণতন্ত্রের ঊষাকালে স্বাধীন লণ্ডন শহরে ট্যাভার্ন-কফিহাউস যেমন 'partially democratised' সমাজের 'centres of opinion' হয়েছিল, পরাধীন কলকাতা শহরে বিদেশী শাসকের অধীনে তা যে হতে পারেনি তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তা না হতে পারাই স্বাভাবিক। অনেক পরে, বিংশ শতাব্দীর প্রায় দ্বিতীয় দশক থেকে, আমাদের দেশে কলকাতা শহরের চা-খানাগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর লণ্ডনের কফিহাউসের ভূমিকা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। এবং তারও অনেক পরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বলা চলে, কলকাতা শহরে কফিহাউসের বিকাশ হয়েছে জনসনযুগের লণ্ডনের মতন।

সাহেব-নবাবদের টাউন

পলাশীর যুদ্ধের পর নবাবী আমল অস্ত গেল। ইতিহাসের এক যুগ শেষ হল, আর-এক নতুন যুগ এল, যেমন এক পুরুষের পর আর-এক পুরুষ আসে তেমনি। পুরুষানুক্রমের সঙ্গে যুগানুক্রমের এই জৈবিক সাদৃশ্য একেবারে অর্থহীন নয়। পূর্বপুরুষের চারিত্রিক দোষগুণ উত্তর-পুরুষ যেমন জৈবিকসূত্রে খানিকটা বহন করে, পূর্বযুগের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ও ধ্যান-ধারণাও তেমনি উত্তরযুগ, অনেক সময় অজ্ঞাতসারেই, বহন করে এগিয়ে চলে। সেইজন্য কোন বিশেষ সন-তারিখে ইতিহাসের কোন যুগ শেষ হয়ে যায় না। পলাশীর রণাঙ্গনে নবাবী আমল সরকারীভাবে শেষ হয়ে গেলেও, তার বে-সরকারী অস্তিত্ব আরও প্রায় একশ বছর, উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বজায় ছিল।

কলকাতা শহরের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে। পলাশীর যুদ্ধ যদি নবাবী আমলের শেষ সীমারেখা হয়, তা হলেও জব চার্নকের পরে প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত কলকাতা শহর বাংলার নবাবদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বাধীনে ছিল বলা যায়। সঠিকভাবে বলতে গেলে, ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত গোটা কোম্পানির আমলটাকেই বাদশাহী ও নবাবী আমল বলা যায়। এই

নবাবী আমলটা কলকাতা শহরের বাল্যকাল। এই সময়েই প্রধানত নতুন কলকাতা শহর কেন্দ্র করে, নতুন সামাজিক পরিবেশে বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, নানা শ্রেণীর লোকের উৎপত্তি হতে থাকে। এমন একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যার প্রভাবে মানুষের, বিশেষ করে শহুরে মানুষের, চরিত্র দ্রুত বদলাতে থাকে। এই সব নানা শ্রেণীর মানুষ নিয়ে নব যুগের নতুন শহুরে-সমাজ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে কলকাতা শহরে সমাজের এই নতুন শ্রেণী-রূপায়ণের এক আশ্চর্য চিত্র দেখা যায়। ভারতবর্ষের আর-কোন শহরে, বোম্বাই-মাদ্রাজেও, শহুরে-সমাজে এই ধরনের অভিনব শ্রেণী-সমাবেশ ঘটেনি। তার কারণ, ঐতিহাসিক ঘটনার এমন বৈচিত্র্য আর কোথাও দেখা যায়নি। এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর শহুরে মানুষের মধ্যে 'সাহেব নবাবরা' সৌখিন বিদেশী ফুলের মতন এদেশের মাটিতে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের কোনদিক থেকেই এদেশের সমাজে কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। আমাদের দেশের নতুন শহুরে সমাজে (এবং ইংলণ্ডের সমাজেও) তাঁদের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান কতকটা নাটকীয় হলেও, তা ঐতিহাসিক কারণে স্মরণীয় ও বর্ণনীয়।

কয়েকজন ইংরেজ বণিক একত্রে মিলিত হয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যখন একটি কোম্পানি স্থাপন করেছিলেন, এবং 'সাত সমুদ্দুর তের নদী' পার হয়ে যখন সুদূর 'ইস্ট ইণ্ডিজে' তাঁরা বাণিজ্যের মুনাফার সন্ধানে অভিযান করেছিলেন, তখন তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি যে রাত পোহালে তাঁদের সেই বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দেবে। ইংলণ্ডের লিডেনহল স্ট্রীটে অনারেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে অফিসঘর ছিল এখন আর তা নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই বিচিত্র স্থাপত্যের নিদর্শন আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। অনারেবল কোম্পানির সেই সব বাণিজ্যপোতও আজ আর দেখা যায় না। কোম্পানির নিশান,

কোম্পানির আমলের আদব-কায়দা, চাল-চলন সব আজ লোপ পেয়ে গেছে। চসার ও ডক্টর জনসনের আমলে সেই সব সাম্রাজ্যজয়ী ইংরেজ বীরপুরুষদের কথা বর্তমানকালের বংশধররা শীতের রাতে চুল্লির পাশে বসে হয়ত রূপকথার মতন শোনেন। রবিনসন ক্রুসোর কাহিনী তাঁদের মনে পড়ে, পূর্বপুরুষদের কীর্তিকথা স্মরণ করে। বাস্তবিকই কোম্পানির আমলের সেইসব দুর্ধর্ষ কূটবুদ্ধি বণিক সাহেবদের রূপকথার নায়ক বলেই মনে হয়। বিলেতের ইণ্ডিয়া অফিসে স্তূপাকার রেকর্ডের তলায়, আমাদের দেশের মহাফেজখানায়, দেশ-বিদেশের গোরস্থানের পাথুরে ফলকে, অষ্টাদশ শতাব্দীর এই সাহেব-নবাবদের বিচিত্র সব কীর্তির কথা লেখা রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে সেই লেখার পাঠোদ্ধার করাও কঠিন। বিদেশের কথা জানি না, কলকাতা শহরের সেণ্ট জনস গির্জা-প্রাঙ্গণে ও পার্ক স্ট্রীটের প্রাচীন গোরস্থানে একবার ইতিহাসমুখী মন নিয়ে পা দিলেই মাটির তলা থেকে দেড়শ-দু'শ বছরের পুরনো মৃত সাহেব-নবাবদের কঙ্কালগুলো রক্তমাংসের মূর্তিতে জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনে হয় কেউ প্রকাণ্ড লম্বা চাবুক হাতে করে কাছারি ঘরের বারান্দায় দৃপ্ত ভঙ্গিতে পায়চারী করছেন, এবং মেঝের উপর চাবুকাঘাত করে অদ্ভুত অ্যাংলো-বাংলা-হিন্দি ভাষায় সামনে দণ্ডায়মান কম্পিতকলেবর দেশী বাঙালী নেটিবদের গালি দিচ্ছেন। নেটিবরা করজোড়ে 'হুজুর', 'স্যার', 'সাহেব', 'ইউ ফাদার গ্র্যাণ্ড-ফাদার সাহেব' বলে কাকুতি-মিনতি করছে। কেউ তাকিয়া ঠেস দিয়ে কৌচে শুয়ে আলবোলায় তামাক খাচ্ছেন, হুঁকোবরদাররা কল্কে জ্বালিয়ে রাখছে, হেয়ার-ড্রেসাররা পেছনে দাঁড়িয়ে কেশবিন্যাস করে দিচ্ছে, একদিকে দাঁড়িয়ে আছে খানসামা-খিদমৎগার, আর-একদিকে দাঁড়িয়ে আছে সদানুব্জপৃষ্ঠ টিপিকাল বাঙালী সরকারবাবু। কখন কখন হঠাৎ ঘোড়ার খুরের খট্‌খট্ শব্দে নিস্তব্ধ গোরস্থানের শূন্য সমাধিগুলি যেন কেঁপে ওঠে। সাহেব-নবাব ঘোড়ায় চড়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন, ঘোড়ার পেছনে নেটিব সহিসের দল ছুটে চলেছে। সাহেবের ফিটন ও বগির পইস্-পইস্ শব্দও মধ্যে

মধ্যে শোনা যায়। ওড়িয়া পাল্কি-বেয়ারাদের সমবেত ঐকতানে নির্জন গোরস্থান মুখর হয়ে ওঠে, অন্ধকারের মধ্যেও পরিষ্কার দেখা যায়, পাল্কির খোপের ভিতর থেকে সাহেব-নবাব কটাচক্ষু মেলে শস্য-শ্যামলা বাংলার প্রকৃতির দিকে চেয়ে আছেন, কোথাও বা সাহেব-প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ডুয়েল লড়ছেন, কোথাও মুরগীর লড়াই দেখছেন, কোথাও বা চড়কের গাজনে ও দুর্গোৎসবে নেটিবদের সঙ্গে আমোদ করছেন। কোথাও দেখা যায়, হিন্দুদের দেবালয়ে নাছোড়বান্দা পাণ্ডাদের কবলিত হয়েছেন সাহেব। 'প্রাইভেট ট্রেড' ও 'ইন্টারলোপিঙে' সাহেবের যাতে দু'পয়সা হয়, অথবা কূটনৈতিক চালে সাহেব যাতে বাজিমাৎ করতে পারেন, সেজন্য তিনি নেটিবদের সংস্কার মেনে দেবতার কাছে মানত করছেন। 'অ্যাকালচারেশনের' এও এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত। সাহেব-নবাব শ্রেণীও দুই দেশের 'কালচার-কনট্যাক্টের' অপূর্ব নিদর্শন।

'নবাব' কথাটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজী ভাষাতে চলিত হয়ে যায়। অক্সফোর্ড ইংরেজী অভিধানে 'নবাব' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে মোগল আমলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা বলে। কিন্তু 'transferred sense'এ 'নবাব' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'a person of great wealth ; specifically, one who has returned from India with a large fortune acquired there ; a very rich and luxurious person'. এই প্রসারিত অর্থে নবাব শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন হোরেস ওআলপোল ১৭৬৪ সালে, 'Mogul Pitt and Nabob Bute' বলে। বুট অবশ্য ঠিক নবাব ছিলেন না, এবং ১৭৬১ সালেই ওআলপোল লিখেছিলেন, 'West Indians, Conquerors, Nabobs and Victorious admirals attack every borough'. ইউল ও বার্নেলের 'Hobson-Jobson' অভিধানে নবাব কথার এই অর্থ করা হয়েছে ঃ

> It began to be applied in the Eighteenth Century when the transactions of Clive made the epithet familiar in England, to Anglo-Indians who returned with fortunes from the East, and Foote's play of the 'The Nabobs' (1768) aided in giving general currency to the word in this sense.

পলাশীর যুদ্ধের পরেই 'নবাব' কথাটি ইংরেজদের মুখে মুখে প্রচলিত হতে থাকে। ফুট এই কথাটিকে যে জনপ্রিয় করেছিলেন তা ঠিক নয়। ১৭৭২ সালে (১৭৬৮ সালে নয়) *The Nabob* নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়, এবং ফুট ভারতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে পার্লামেণ্টারি তদন্তের সুযোগ নিয়ে কথাটিকে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরেন। অর্থাৎ ইংরেজরা যখন কেবল বাণিজ্যের মুনাফালোভী ছিলেন, সাম্রাজ্যের প্রতি তাঁদের প্রখর দৃষ্টি ছিল না, তখন নবাবী বিলাসিতা ও চালচলনের প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হননি। তার অনেক পরে, যুদ্ধবিগ্রহে জয়লাভ করে এবং এদেশের অফুরন্ত ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়ে, যখন তাঁরা রাজ্যশাসনের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, তখন থেকেই এদেশের নবাবদের অনুকরণে তাঁদেরও মনে নবাব হবার বাসনা জাগল। সাহেব-নবাবীর জন্ম হল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝির পর থেকে। ১৭৭৩ সালেই কোম্পানির একজন স্টকহোল্ডার দুঃখ করে বলেছিলেন, "That old commercial Dividend which we enjoyed for a Series of Years, long before we had to do with Nabobs." এইজন্যই ঐতিহাসিকরা বলেন যে সাহেব-নবাবদের নবাবীটা আর যাই হোক অন্তত 'কমার্সিয়াল' নয়। বাস্তবিকই কমার্সের সঙ্গে নবাবীর কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। নবাবীটা এদেশী শাসকদের কাছে যা ছিল, বিদেশীরা ঠিক সেইভাবেই তাকে গ্রহণ করে বাস্তব জীবনে প্র্যাক্টিস করার চেষ্টা করেছিলেন। এই নবাবী হল স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরম ভোগবিলাসিতার নামান্তর মাত্র।

নবাবী বিলাসিতা সহজ ব্যাপার নয়। তার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কোম্পানির কর্মচারীরা কোথা থেকে এবং কি উপায়ে এই অপরিমিত অর্থ উপার্জন করতেন? এ প্রশ্ন প্রথমেই মনে জাগা স্বাভাবিক। কোম্পানির কর্মচারীদের চাকরির গ্রেড ছিল প্রধানত চারটি, রাইটার (Writer), ফ্যাক্টর (Factor), জুনিয়র মার্চেণ্ট ও সিনিয়র মার্চেণ্ট। প্রথমে রাইটারের পদে কোম্পানির চাকরিতে ঢুকতে হত। আবেদনকারীরা দরখাস্ত করতেন এই মর্মে, 'having been duly educated in Writing, Arithmetick, & Merchants Accompts, he is desirous of serving your Honours as a Writer in India & prays therefore to be admitted accordingly, being ready to give the Security Required.' ক্লাইবের যুগে রাইটারের বেতন ছিল বছরে ৫ পাউণ্ড, সিনিয়র মার্চেণ্টের বেতন ছিল বছরে ৪০ পাউণ্ড। পরে অবশ্য তাঁদের বেতন ও ভাতা আরও বেড়েছিল, কিন্তু এমন কিছু বাড়েনি যাতে তাঁরা নবাব হবার স্বপ্ন দেখতে পারেন। তাহলে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ তাঁরা রোজগার করতেন কি উপায়ে?

কোম্পানির কর্মচারীদের অর্থ রোজগারের প্রধান উপায় ছিল নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্য, এবং তার চেয়েও বড় পন্থা ছিল নানারকমের উৎকোচ ও উপঢৌকন। ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্যে তাঁরা 'ইণ্টারলোপিং' (Interloping) করতেন বেশী—'An interloper was an independent violator of the Company's monopoly.' নবাবী আমলের আগে টমাস পিট (Thomas Pitt) ইণ্টারলোপিং করে অগাধ অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। ধুরন্ধর ইণ্টার-লোপারদের মধ্যে উইলিয়ম বোল্টস (William Bolts) ছিলেন অন্যতম। ইণ্টারলোপিং করে কোম্পানির রাইটার, ফ্যাক্টর ও মার্চেণ্টরা প্রচুর পরিমাণে অর্থ রোজগার করতেন, এবং সেই অর্থ এদেশের রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নবাবী বিলাসিতায় ব্যয় করতেন।

তাতেও তাঁদের সঞ্চিত অর্থের ভাণ্ডার শূন্য হত না। অবৈধ বাণিজ্যের বিচিত্র সব সুড়ঙ্গপথে যে অফুরন্ত অর্থের সমাগম হত তা খরচ করে তাঁরা কুল পেতেন না। তার সঙ্গে ছিল উৎকোচ ও উপঢৌকনের অসংখ্য চোরাপথে আমদানি অর্থ। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে এই উৎকোচের পথ আরও অনেক প্রশস্ত হয়ে গেল। ইংরেজ বণিকরা, প্রায় রাতা-রাতিই বলা চলে, আমাদের দেশের king-maker হয়ে উঠলেন। প্রচুর টাকা উৎকোচের বিনিময়ে রাজসিংহাসনেরও লেনদেন হতে থাকল। ১৭৫৭ সালে সিরাজউদ্দৌলার বদলে মীরজাফরকে, ১৭৬০ সালে দুর্বল মীরজাফরের বদলে মীরকাসিমকে, এবং ১৭৬৪-৬৫ সালে প্রবল মীরকাসিমের বদলে নিজামউদ্দৌলাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার সময়ে ইংরেজ king-makerরা প্রচুর টাকা উৎকোচ পেয়েছিলেন। হিসেব না দেখলে তার পরিমাণ অনুমান করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন সালের টাকার পরিমাণ এই (পাউণ্ডের হিসেব):

১৭৫৭ সাল

ড্রেক	৩১,৫০০	ম্যাকেট	১১,৩৬৬
ক্লাইব	২১১,৫০০	কোলেট	১১,৩৬৭
ওয়াট্স	১১৭,০০০	আমিয়াট	১১,৩৬৬
কিলপ্যাট্রিক	৬০,৭৫০	পীয়ার্কস	১১,৩৬৬
ম্যানিংহাম	২৭,০০০	ওয়াল্শ	৫৬,২৫০
বেশার	২৭,০০০	স্ক্র্যাফটন	২২,৫০০
বোডাম	১১,৩৬৭	লাশিংটন	৫,৬২৫
ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড	১১,৩৬৭	মেজর গ্র্যাণ্ট	১১,২৫০

১৭৬০ সাল

ভ্যানসিটার্ট	৫৮,৩৩৩	ম্যাকগুইর	২৯,৩৭৫
হলওয়েল	৩০,৯৩৭	স্মিথ	১৫,৩৫৪
সামনার	২৮,০০০	ইয়র্ক	১৫,৩৫৪
	কেলড	২২,৯১৬	

১৭৬৪ সাল

মেজর মুনরো	১৩,০০০	তাঁর সহকারীরা	৩,০০০

১৭৬৫ সাল

স্পেন্সার	২৩,৩৩৩	বার্ডেট	১১,৬৬৭
জনস্টোন	২৭,৬৫০	গ্রে	১১,৬৬৬
মিড্লটন	১৪,২৯১	কার্নাক	৩২,৮৬৬
সিনিয়র	২০,১২৫	ক্লাইব	৫৮,৩৩৩
লেসেস্টার	১৩,১২৫	জি: জনস্টোন	৫,৮৩৩
প্লেডেল	১১,৬৬৭		

এটা নবাব-অদলবদলের দক্ষিণা। এ ছাড়া আরও অনেক রকমের উৎকোচের পথ খোলা ছিল। পুরোপুরি রাজা হবার আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশের জমিদার হয়েছিলেন, এবং জমিদারি সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা যথাসম্ভব উৎকোচ-উপঢৌকনের পথে পরিচালিত করেছিলেন। এদেশে জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করার সময় এবং নতুন জমিদারি বিলিব্যবস্থা করার সুযোগে তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে উৎকোচ ও উপঢৌকন গ্রহণ করতেন। বর্ধমান জেলার কলেক্টর জন ব্যাথো (John Bathoe) স্থানীয় জমিদারকে লবণ-ব্যবসায়ের সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন প্রথম দু'বছরে ২৮ হাজার টাকা ঘুষের বিনিময়ে। প্রথম বছরের ঘুষের ১৪ হাজার টাকা তিনি নিজের জন্যই রেখেছিলেন, দ্বিতীয় বছরের ১৪ হাজার পাটনার কৌন্সিলের সভ্যদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। কৌন্সিলের চীফ হিসেবে জর্জ ভ্যান্সিটার্ট ৪১৪৮ টাকা পেয়েছিলেন (India Office, Personal Records etc, Vol. 14, ১১১)। উৎকোচ ও উপঢৌকন সম্বন্ধে মিল তাঁর *History of India* (Vol. III) গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> When the English suddenly acquired their extra-ordinary power in Bengal, the current of persents, so well accus-

tomed to take its course in the channel drawn by hope and fear, flowed very naturally and very copiously, into the lap of the strangers.

এদেশে এসে ইংরেজরা উৎকোচ গ্রহণের কৌশলটাকে প্রায় চারুকলার পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে পদে পদে যখনই তাঁরা ঘুষ নেবার সুযোগ পেতেন, তখনই তা বিনা দ্বিধায় ও নিঃসঙ্কোচে নিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যখন বাংলাদেশে কুঠি স্থাপন করে তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেন, তখন থেকেই তাঁরা ঘুষের ব্যাপারে দক্ষ হতে থাকেন। উইলিয়ম হেজেস যখন কোম্পানির 'এজেণ্ট' ছিলেন তখন এদেশের বণিকদের কাছ থেকে তিনি উৎকোচ সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ শুনেছেন এবং আবেদনপত্রও পেয়েছেন। তার একটির নমুনা এখানে হেজেসের ডাইরি থেকে উল্লেখ করছি ঃ

The Petition of W[m] Hedges, Agent, from Y[e] Hugly Merchants, viz. :—Muttrasaw, Rupsuliman, Rogoodee, Giachundsaw, Rogonaut, Horkissincotma, Ramchund-paramanick, Ramnarrain, Mudducaun.

SHEWETH. That to have their goods taken for agreement made with Y[e] Company, they have been forced to give Mr. Ellis, warehouse keeper, each of them, a Bribe, as per Y[e] underwritten account, in mony and goods, appears : for which your Petitioners complain to you, desiring Justice :

Muttrasaw, 1,150 Rupees, in mony and goods ; Giachundsaw, 73 Rupees ; Horkissincotma, 102 Rupees 8 Annas in mony and goods, Ramnarrain, for Mulmulls taken from him ; Rupsuliman, Rogonaut, Ramchund-paramanick, Mudducawn, Rogoodee, 4 Annas upon each piece, for 4,453 pieces, amounts to 1,113 Rupees 4

Annas, for which he has taken out of one Chest of Dollars delivered Rogonaut, 500 pieces of Eight on account.

অয়ার-হাউসকিপার (গুদোম-সাহেব) এলিস একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এরকম শত-শত 'এলিস' ছিলেন কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে। দেশীয় বণিকদের কাছ থেকে কিভাবে ঘুষ নিয়ে তাঁরা মলমল, রেশম ও অন্যান্য মালপত্র গ্রহণ করতেন, মথুরা সাহা (Muttrasaw), হরেকৃষ্ণ (Horkissin), রামনারায়ণ (Ramnarrain), রূপসুলেমান (Rupsuliman), রঘুনাথ (Rogonaut), রামচাঁদ পরামাণিক (Ramchundpramanick), মধু খাঁ (Mudducawn) রঘু দে (Rogoodee) প্রভৃতি বণিকদের অভিযোগ থেকে তা বোঝা যায়। এই ঘুষ তাঁরা দেশীয় বণিক, বেনিয়ান, মুচ্ছুদ্দি, দালাল ও গোমস্তাদের কাছ থেকেও নিতেন। দেশীয় বণিক ও দালালশ্রেণীও সাহেবপ্রভুদের তুষ্ট করার জন্য যে উৎকোচ-উপঢৌকন দিতেন, তা কড়ায়-গণ্ডায় পুষিয়ে নিতেন তাঁতি, কর্মকার ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদকদের কাছ থেকে। অর্থাৎ কোম্পানির সঙ্গে যে-মূল্যে পণ্যদ্রব্য সরবরাহের চুক্তি তাঁরা করতেন, তার চেয়ে অনেক কম মূল্যে তাঁরা তাঁতি ও কারিগরদের বাধ্য করতেন পণ্য উৎপাদন করতে এবং তাঁদের সরবরাহ করতে। তা ছাড়া একেবারে বেকার হয়ে অনাহারে মৃত্যুর ভয়ে দেশীয় কারিগররা এই দালালদের নানাভাবে তোষণ করতেও বাধ্য হতেন। দেশীয় বণিক ও দালালরা কারিগরদের অস্থিমজ্জা পর্যন্ত শোষিত অর্থের খানিকটা অংশ সাহেব-দেবতাদের খুশি করার জন্য ব্যয় করতেন।

এই সব উপায়ে অর্থ উপার্জন করতেন ইংরেজরা। নবাবের সিংহাসন নিয়ে চক্রান্ত করে, জমিদারী বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায়ের নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, ব্যক্তিগত ও অবৈধ বাণিজ্য থেকে প্রচুর মুনাফা করে, এবং আরও নানা উপায়ে উৎকোচ উপঢৌকন নিয়ে, চার্নক-হেজেস-ক্লাইব-হেস্টিংস-কর্নওয়ালিসের আমলের কোম্পানির কর্মচারীরা যে কি পরিমাণে বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন তা কল্পনা করা যায় না। দেখতে দেখতে প্রচুর অর্থ

ও নতুন রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে কোম্পানির সাহেবরা সত্যি-সত্যি 'নবাব' বনে গেলেন। তাঁদের মেজাজ ও চালচলন সবই দিন দিন নবাবের মতন হয়ে উঠতে লাগল। কেন হতে লাগল সে সম্বন্ধে ক্লাইভের এই বিখ্যাত উক্তির কথা মনে পড়েঃ

> Consider the situation in which the victory at Plassey had placed me! A great Prince was dependent on my pleasure; an opulent city lay at my mercy; its richest bankers bid against each other for my smiles; I walked through vaults which were thrown open to me alone, piled on either hand with gold and jewels! Mr. Chairman, at this moment I stand astonished at my own moderation!

ক্লাইভ বলেছিলেনঃ "পলাশীর যুদ্ধ জয়ের পর আমি যে কি সুযোগ পেয়েছিলাম তা একবার বিবেচনা করে দেখুন! একজন নামজাদা নবাব তখন আমার মর্জির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন; ধনৈশ্বর্যে ভরা বিরাট একটি মহানগর (কলকাতা) আমার হাতের মুঠোয় ছিল; বড় বড় ধনিক দেশীয় মহাজনেরা আমার মুখে একটু হাসি ফোটাবার জন্য টাকা ছোড়াছুড়ি করতেন; একমাত্র আমার জন্যই ধনকুবেরদের ধনাগার উন্মুক্ত থাকত, এবং তার দু'পাশে থাকত সোনা ও মণিমুক্তা। মিঃ চেয়ারম্যান, ঠিক এই মুহূর্তে, আমি যখন এই সব কথা আপনাকে বলছি, তখন আমার নিজের সংযমবোধের কথা ভেবে আমি সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি।"

লর্ড ক্লাইভ ঠিক লর্ডের মতনই কথা বলেছেন। যিনি একদা বাংলার রাজসিংহাসন নিয়ে দু'হাতে জাগ্‌লারের মতন লোফালুফি করতেন, যাঁর ঠোঁটের কোণে দ্বাদশীর চাঁদের মতন সামান্য একটু মুচকি হাসি দেখার জন্য বাংলার রথচাইল্ডরা পরস্পর ঠেলাঠেলি করতেন, তাঁর মুখে এই ধরনের কথা শুনলে একেবারেই অবাক লাগে না। কিন্তু অবাক লাগে তখন যখন দেখা যায়, কোম্পানির সকল শ্রেণীর কর্মচারীরা ক্লাইভের মতন নিজেদের 'লর্ড' মনে করতেন। গোটা দেশটাকেই তাঁরা

মঘের মুল্লুকে পরিণত করে ফেলেছিলেন। লুটের ও ঘুষের টাকা সবই যে তাঁরা থলে ভর্তি করে নিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতেন তা নয়। দুই হাতে সেই টাকার অনেকটা অংশ নিজেদের ভোগবিলাসের জন্য এদেশে খরচ করতেন। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে কলকাতা শহরে অথবা অন্য যে-কোন শহরে-নগরে ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের জন্য অর্থব্যয় করার সুযোগ নিশ্চয় বিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বের মতন প্রশস্ত ও বিচিত্র ছিল না। সমাজের ভোগের স্তরও (Consumption Standard) তখন খুব উন্নত ছিল না, অর্থাৎ ভোগের পণ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না কিছুই। মানুষের ভোগাভ্যাস বা consumption pattern তখন কয়েকটি বাঁধাধরা ভোগ্যদ্রব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের সাধারণ স্তর থেকে মধ্যস্তরের প্রায় শেষসীমা পর্যন্ত তার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। একেবারে সর্বোচ্চ স্তরে ভোগের যে চেহারা দেখা যেত তাকে বিলাসিতা তো নিশ্চয়ই, বরং উপভোগের বদলে 'অপভোগ' বলাই সঙ্গত বলে মনে হয়। আধুনিক অর্থনীতির ভাষায় তাকে কেবল 'conspicuous consumption' বললেই যথেষ্ট বলা হয় না, 'super-conspicuous consumption' বলা উচিত। এই ভোগবিলাসকেই আমরা আমিরী ও নবাবী বিলাস বলে থাকি। কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীরা তাঁদের লুটের কাঁচা টাকার খানিকটা পরিমাণ যখন আত্মবিলাসের জন্য অপব্যয় করতে চাইতেন, তখন তা নবাবী চালেই তাঁদের করতে হত। আমাদের দেশে রাজারাজড়া ও নবাব-বাদশাহরা এই জাতীয় উচ্ছৃঙ্খল ভোগবিলাসের অপব্যয়ে সারা পৃথিবীতে প্রায় অদ্বিতীয় ছিলেন বলা চলে। তাঁদের অন্তিমকালে এই অসংযত বিলাসিতার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিলেন বিদেশী সাহেবরা।

ইংরেজদের দিক থেকে বিচার করলে আমাদের দেশের অষ্টাদশ শতাব্দীটাকে মোটামুটি 'নবাবী আমল' বলতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশই ছিল ইংরেজদের প্রধান কর্মকেন্দ্র, এবং কলকাতা

শহরই ছিল তার হেডকোয়ার্টার। শহর কলকাতাতেই কোম্পানির কর্মচারীদের ভোগবিলাসের লীলাখেলা চলত। সুতরাং কলকাতা শহরের পরিবেশটা তখন ঠিক কি রকম ছিল তা না জানলে তাঁদের বিলাসের বহরটা অনুমান করা সম্ভব নয়।

১৭০৭ সালে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু হয়। সেই বছরেই কৌন্সিলের ১২ জুনের 'ডায়রি ও কনসাল্টেশন বুকে' তখনকার কলকাতার জমি-জরিপের একটা হিসেব পাওয়া যায়। এই হিসেব থেকে বোঝা যায়, সাহেব-নবাবদের আমলের কলকাতার বাইরের রূপ কিরকম ছিল, এবং সেই বাইরের রূপ থেকেই তার ভিতরের সামাজিক রূপেরও খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। যতদূর জানা গেছে, এই জরিপই কলকাতার সবচেয়ে পুরনো জরিপ ঃ

বাজার কলকাতা

ঘরবাড়ি	...	৪০১ বিঘা	১০ ৩/৪ কাঠা
কুয়া	...	১৫ "	৩ ১/২ "
কলাবাগান	...	৭ "	৪ ৩/৪ "
*চূণাপোড়া	..	৯ "	৩ "
জলাডোবা	...	৩ "	১২ "
বাগান	...	১৯ "	৩ "
ফুল	...	×	৬ "
তূলাক্ষেত	...	×	৩ "
শাকসব্জী	...	×	১০ "
তামাক	...	×	১১ "
সরষে	...	×	১৭ "
ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মোত্তর ?)	...	২৬ "	৮ ৩/৪ "
কুয়া	...		১৩ "
চূণাপোড়া		১ "	
জলাডোবা		১ "	৭ "
বাগান			১৭ "
	মোট ..	৪৮৮ বিঘা	৯ ৩/৮ কাঠা

* প্রাচীন কলকাতায় আগে কলিচূণ তৈরী হত। চূণাপোড়া মনে হয়, এই চূণ পোড়াবার জায়গা।

গোবিন্দপুর

ঘরবাড়ি	...	৫৭ বিঘা	৯ কাঠা
ধানক্ষেত	...	৫১০ „	১১ „
শাকসব্জী	...	৩৫ „	১৪ „
পান	...	× „	২ „
তামাক	...	১৩৯ „	১৬ „
বাগান	...	৫৯ „	২ „
কলাবাগান	...	১২ „	৩ „
বাঁশবাগান	...	৪ „	১০ „
ঘাস	...	১৮ „	× „
কুয়া	...	১০ „	৩ „
পুকুর	...	× „	৯ „
জলা ও খামার	...	১৮ „	১৫ „
ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মোত্তর)	...	৫৭ „	১৬ „
জঙ্গল	...	৮৩ „	১৪ „
পতিত জমি	...	১৬৯ „	১২ „
	মোট	১,১৭৮ বিঘা	৭ কাঠা

টাউন কলকাতা

ঘরবাড়ি	...	২৪৮ বিঘা	৬ কাঠা
ধানক্ষেত	...	৪৮৪ „	১৭ „
কলাবাগান	...	১৬৯ „	১৮ „
শাকসব্জী	...	৭৭ „	১৮ „
তামাক	...	৩৮ „	৭ „
তূলা	...	১৯ „	১৫ „
বাগান	...	৭০ „	১ „
ঘাস	...	১৫ „	৯ „
বাঁশবাগান	...	১ „	১৬ „
ফুল	...	৬ „	২ „
জলাডোবা	...	× „	৯ „
আউস ক্ষেত	...	১১ „	৯ „
খামারজমি	...	৭২ „	১০ „
ব্রাহ্মণ	...	১০৯ „	১৫ „
জঙ্গল	...	৩৬৩ „	১৫ „
পতিতজমি	...	২৭ „	৩ „
	মোট	১,৭১৭ বিঘা	১০ কাঠা

সুতানুটি

ঘরবাড়ি	...	১৩৪ বিঘা	৪ কাঠা
আউস ক্ষেত	...	২ „	৬ „
ধানক্ষেত	...	৫১৫ „	৬ „
শাকসব্জী	...	৩২ „	১৯ „
কলাবাগান	...	৬০ „	৭ „
বাগান	...	১৪৭ „	৭ „
তামাক	...	৮ „	৬ „
আখ	...	× „	১১ „
বাঁশ	...	১ „	১ „
নল	...	১১ „	১৬ „
তূলা	...	× „	১৮ „
ফুল	...	১৪ „	৭ „
চূণাপোড়া	...	২ „	১১ „
নলখাগড়া	...	২ „	× „
জলাডোবা	...	× „	৪ „
খামারজমি	...	১০ „	১৯ „
		৭৬ „	১৪ „
পুকুর ও পথ	..	৭২ „	৬ „
জঙ্গল	..	৪৮৭ „	১ „
ব্রাহ্মণ	...	১১১ „	৩ „
	মোট	১,৬৯২ বিঘা	১২ কাঠা।

আড়াইশ' বছর আগেকার কলকাতার চেহারা এই জরিপ থেকে বোঝা যায়। বাজার-কলিকাতার ও টাউন-কলিকাতার সীমানা ছিল মোটামুটি পুবে বৌবাজার থেকে পশ্চিমে লালদীঘি বড়বাজার পর্যন্ত। অর্থাৎ উত্তরে হ্যারিসান রোড ও দক্ষিণে ধর্মতলা স্ট্রীটের পশ্চিমদিকে ছিল টাউন-কলিকাতা, এবং পুবদিকে ছিল বাজার-কলিকাতা। ডালহৌসির বর্তমান অফিস অঞ্চল ছিল টাউন-কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত।

সাহেবদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল এই অঞ্চলে। সেইজন্য বাকি কলিকাতার প্রাচীন গ্রাম্যনামের মধ্যে এই অঞ্চলটুকুরই তখন নাম হয়েছিল টাউন-কলিকাতা। প্রাচীন কতকগুলি গ্রামের ভিতর থেকে নবযুগের নতুন 'টাউন' এই সময় ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। টাউন-কলিকাতায় স্বভাবতঃই লোকবসতি ছিল খুব কম। মোট জমির মাত্র আটভাগের একভাগ ছিল বসতি; এবং তখনও টাউন অঞ্চলেরই চারভাগের একভাগ জমিতে ধানচাষ হত। বসতির সমান অংশে ছিল কলাবাগান ও সব্জীক্ষেত। এই ধানক্ষেত ও কলাবাগানের ভিতর থেকেই টাউন-কলিকাতা অতি সন্তর্পণে গাত্রোত্থান করছিল। টাউন-কলিকাতাই ছিল আদিযুগের সাহেব-নবাবদের বাসস্থান ও বিলাসক্ষেত্র।

বর্তমান চৌরঙ্গির অধিকাংশই ছিল তখন গোবিন্দপুর গ্রামের মধ্যে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে গোবিন্দপুর গ্রামে খুব সামান্য লোকবসতি ছিল দেখা যায়। প্রায় এগারশ' বিঘা জমির মধ্যে সাতান্ন বিঘা আন্দাজ জমিতে লোকজন বসবাস করত। উনিশ শতকের প্রথম পাদেও 'চৌরঙ্গি' গ্রাম বলেই গণ্য হত। প্রাচীন নথিপত্রের মধ্যে 'চৌরঙ্গি রোড' নাম পাওয়া যায়, কিন্তু জমিজমার প্রাচীন দলিলপত্রে দেখা যায় এই পথটিকে বলা হয়েছে 'the great road leading from Calcutta to Russa Puglah' অথবা 'the road bounding the Esplanade'. চৌরঙ্গির দক্ষিণে ছিল 'ডিহি বির্জি' গ্রাম, তার দক্ষিণে ছিল 'ডিহি চক্রবেড়িয়া'। ১৭৬৮ সালে জর্জ ভ্যান্সিটার্ট এই 'বিরজি' ও 'চক্রবেড়িয়া' গ্রামে (Chokorber) প্রায় ৬৩২ বিঘা জমি বাৎসরিক ৭৮৯ টাকা খাজনায় লীজ নিয়ে বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক হন। পরে চার্লস শর্ট এই সম্পত্তি কিনে নিয়ে এর একাংশে একটি বাজার বসান। 'শর্টস বাজার স্ট্রীট' নামটি আজও শর্ট সাহেবের বাজারের স্মৃতি বহন করছে। গোবিন্দপুর গ্রামের প্রায় অর্ধেকই ছিল ধানক্ষেত আর বাকি অর্ধেকের অধিকাংশই ছিল খানা-ডোবা-বনজঙ্গল।

চিৎপুরসহ উত্তর-কলকাতা ছিল 'সূতানুটি' গ্রাম। সূতানুটিতেও লোকবসতি বিরল ছিল। প্রায় ১৭০০ বিঘা জমির মধ্যে ১৫০ বিঘারও কম জমিতে ছিল লোকের ঘরবাড়ি। বেশীর ভাগ জমিতেই ধানচাষ হত। বাকি সব ছিল জলাজঙ্গল ও বাগান। এই ছিল একালের সমগ্র কলকাতা শহরের সেকালের চেহারা। শহর বলে তখন কিছু ছিল না, একটুখানি শুধু 'টাউন'রূপে মাঝখানে গড়ে উঠেছিল, ছোট্ট একটি 'নিউক্লিয়াসের' মতন। এইভাবেই অবশ্য নগরের প্রাথমিক বিকাশ হয়। তারপর প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও কর্মকেন্দ্রের 'নিউক্লিয়াস' থেকে ধীরে ধীরে চারিদিকে নগর শাখা-প্রশাখা মেলতে থাকে। ছোট্ট নগর ক্রমে মহানগর ও শহরের রূপ ধারণ করে। আদি-কলকাতা জব চার্নকের আমলে পুরনো কেল্লা (Old Fort) কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। সেই পুরনো কেল্লার একটু-আধটু অংশ এখনও বড়-ডাকঘরের সীমানার মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনরূপে রক্ষিত আছে। এই পুরনো কেল্লাকেন্দ্রিক শহরের সীমানা ছিল বর্তমান লালদীঘির খানিকটা অংশ। কোম্পানির ডিরেক্টররা এই কেল্লাটি পঞ্চভূজ আকারে (pentagonal) নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রথমে তৈরি হয় দক্ষিণ-পূর্ব কোণের প্রাকার ও তার সংলগ্ন দেয়ালগুলি। গবর্নর বিয়ার্ড ১৭০১ সালে উত্তর-পূর্ব কোণের দেয়াল নির্মাণ করান। ১৭০২ সালে বিয়ার্ডের আমলেই কেল্লার মধ্যে কোম্পানির কুঠি বা 'গবর্নমেণ্ট হাউস' তৈরি হতে থাকে এবং ১৭০৬ সালে 'রোটেশন' গবর্ণমেণ্ট এই 'piece of architecture' সমাপ্ত করেন। ১৭১৬ সালের একটি চিঠিতে দেখা যায় 'the long row of lodgings for the writers is finished' লেখা হয়েছে। বর্তমান কাস্টমস হাউস-এর কাছে গঙ্গাতীরে বস্তির মতন সারবন্দী এই ঘরগুলিই ছিল প্রথম যুগের 'রাইটার্স বিল্ডিং'. হ্যামিল্টন গবর্নরের বাড়ি দেখে তখন মন্তব্য করেছিলেন, 'the best and most regular piece of architecture that I ever

saw in India,' সারা ভারতে এরকম অপূর্ব স্থাপত্যের নিদর্শন তিনি নাকি আর দেখেননি। ১৭১৩ সালে কোম্পানির ডিরেক্টররা কলকাতার পুরনো কেল্লার ঘরবাড়ির সমালোচনা করে লিখেছিলেন 'a very pompous show to the waterside by high turrets of lofty buildings.' সেদিনকার এই অতিনগণ্য ঘরবাড়িগুলির বাইরের দৃশ্য কোম্পানির সাহেবদের খুব জমকাল মনে হয়েছিল, কারণ তখনও বাংলার নবাবের মনোভাব সম্পর্কে তাঁরা একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। পাছে তাঁদের কেল্লা ও ঘরবাড়ির তু'-চারটে উদ্ধত চূড়া দেখে নবাবের মনে কোন তুরভিসন্ধির সন্দেহ জাগে, সেই কারণে তাঁরা 'high turrets'এর 'pompous show' সম্বন্ধে বিচলিত হয়েছিলেন। কয়েকটি বড় বড় রপ্তানি-আমদানির মালের গুদামঘর ছাড়া ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের আগে পর্যন্ত আর কোন ভাল ঘরবাড়ি বিশেষ কিছু তৈরি হয়নি শহরে।

গবর্নরের বাড়ি তখন ছিল পুরনো কেল্লার মধ্যে। কিন্তু ক্লাইভ, হলওয়েল ও কোম্পানির অন্যান্য বড়কর্তারা তখন কোথায় ও কোন বাড়িতে থাকতেন, এ কৌতূহলও অনেকের মনে জাগতে পারে। কার্জন সাহেবের 'ট্যাব্‌লেট' অনুযায়ী পুরনো রয়াল এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং (১৯১৫ সালে যা ভেঙে ফেলা হয়) ক্লাইভের কলকাতা শহরের বসতবাড়ি ছিল। কিন্তু ফার্মিঙ্গার ও অন্যান্য কেউ কেউ মনে করেন ক্লাইভের বাড়ি এখানে ছিল না। ১৭৬০, ২২ সেপ্টেম্বরের 'Public Consultations'এ ক্লাইভের বাড়ির একটি নির্দেশ পাওয়া যায়ঃ 'The Sea Customs master reports to the Board that he has pitched upon the Dwelling House belonging to Huzaroomull, lately possessed by Colonel Clive, as the most proper place for a Custom House.' জন জেফানিয়া হলওয়েল বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রধান সার্জন,

কলকাতার মেয়র (১৭৪৭-৪৮), এবং কলকাতার জমিদারও ছিলেন। ক্লাইভের সমকক্ষ না হলেও, তাঁর সমসাময়িক সাহেব-নবাবদের মধ্যে তিনি কম প্রতিপত্তিশালী ছিলেন না। সেকালের কলকাতায় হলওয়েলের বাড়িটি ছিল 'contiguous to the old ditch'—পুরনো খালের কাছে। এই পুরনো খালটি 'কাঁচা গদি ঘাট' (Colvin's Ghat) থেকে বর্তমান হেস্টিংস স্ট্রীটের উপর দিয়ে, ডিঙ্গাভাঙ্গা খাল দিয়ে (বর্তমান Creek Row) ধাপায় (Salt Lakes) গিয়ে পড়ত। এই খালের ধারে, বর্তমান হেস্টিংস স্ট্রীটের কাছে কোথাও কোন বাড়িতে কলকাতার দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার, সার্জন ও মেয়র হলওয়েল সাহেব বাস করতেন। চৌরঙ্গি অঞ্চলের সবচেয়ে পুরনো বাড়িটি ছিল উইলিয়ম ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড সাহেবের। বর্তমান মিড্‌লটন রো-তে অবস্থিত লরেটো কনভেন্টের বাড়িটি হল সেই ঐতিহাসিক বাড়ি। ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড কলকাতা কৌন্সিলের মেম্বর ছিলেন, এবং ১৭৫৬ সালে ইম্পোর্ট অয়ারহাউসের 'কিপার' ছিলেন। নবাবের কলকাতা অভিযানের সময় তিনি লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্নেল নিযুক্ত হন। শোনা যায়, তিনি অলিভার ক্রমওয়েলের প্রপৌত্র। ১৭৪৯ সালে এই বাড়িটি ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ডের দখলে ছিল এবং ১৭৫৭ সালে অর্মির (Orme) কলকাতার মানচিত্রে বাড়িটি চিহ্নিতও করা ছিল। এই গৃহেই স্যার এলিজা ইম্পে বাস করতেন। পরে বিশপ হেবারও কিছুকাল এই বাড়িটিতে ছিলেন। গবর্নর হেনরি ভ্যানসিটার্ট এই বাড়িটি কিনে তাঁর বাগানবাড়িতে পরিণত করেন। কলকাতায় তখনও গবর্নরের নিজের বাড়ি বলে কিছু ছিল না। Grandpre ১৭৯০ সালে কলকাতায় এসে গবর্নরের বাড়ি সম্বন্ধে লিখেছিলেন ঃ

> The G. G. of the English settlements east of the Cape of Good Hope resides at Calcutta. As there is no palace yet built for him, he lives in a house on the esplanade opposite the citadel. The house is handsome, but by no means equal to what it ought to be for a personage

of so much importance. Many private individuals in the town have houses as good…

১৭৮৮ সালে কর্নওয়ালিস এই বাড়িতেই বাস করতেন। কিন্তু বাড়ির মালিক ছিলেন প্রাক্তন নায়েব-দেওয়ান রেজা খাঁ। তা সত্ত্বেও এই বাড়িটিকে 'গবর্নমেণ্ট হাউস' বলা হত কেন? ফার্মিংগার বলেছেন, তখনও গবর্নমেণ্ট বলতে নবাবের ও তাঁর নায়েব-দেওয়ানের গবর্নমেণ্ট বোঝাত। তাই বোধ হয় নায়েব-দেওয়ানের সরকারী বসতবাড়িকে সাধারণ লোক এবং বিদেশীরাও 'গবর্নমেণ্ট হাউস' বলতেন। ফার্মিংগারের অনুমান সত্য বলেই মনে হয়।

তখন 'মেয়রের কোর্ট' বসত সেণ্ট অ্যান গির্জার 'চ্যারিটি স্কুলে'। স্কুল বাড়িটির নাম সেইজন্য 'কোর্ট হাউস' হয়ে যায় এবং 'Old Court House Street' নামের মধ্যে আজও সেই পুরনো স্মৃতি জড়িত হয়ে রয়েছে। কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরাও কিছুকাল এই আদালতগৃহে বিচারে বসেছেন, এবং এখানেই মহারাজ নন্দকুমার বিচারের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। জাস্টিস হাইড তাঁর নোটবুকে ১৭৮২, ২রা জানুয়ারি তারিখে নতুন আদালত সম্বন্ধে লিখেছেন:

> We sat this day for the first time at the New Court House, which has been taken by the Company for the use of the Court at the monthly rent of two thousand five hundred rupees. This new Court House is near Chand Paul Ghaut and is near the road which bounds the Esplanade on one side. The house is the property of Archibald Keir and is let by him to the Company for five years.

নবাবী-আমলের কলকাতায় পুরনো ঘরবাড়ির মধ্যে লালবাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 'প্লে হাউস' ছিল অন্যতম। মিসন-রো'র পুবদিকে ছিল ব্রাউন সাহেব ও লেডি রাসেলের বাড়ি। রাসেলের বাড়ির সামনের

খালি জায়গার নাম ছিল তখন 'রোপ ওয়াক'। ১৭৬৭ সালে পাদ্রি কিয়েরন্যাণ্ডার 'ওল্ড মিশন চার্চ' নির্মাণ আরম্ভ করেন এবং ১৭৭০ সালে শেষ করেন। মিশন চার্চের উত্তর-পশ্চিমে ছিল পুরনো 'প্লে হাউস'। এই পুরনো প্লে-হাউসের পশ্চিমে লালবাজারের সামনে ছিল পুরনো কলেক্টরের কাছারি। কাছারির পশ্চিমে ছিল পুরনো জেলখানা। উইলসন বলেন, জেলখানার বাড়িটি ছিল লালবাজার ও মিশন রো-র কোণে। হিল (S. C. Hill) বলেন, লালবাজারের দক্ষিণে বর্তমান বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের সংযোগস্থলে পুরনো 'Ambassador's House' ও জেলখানা ছিল। জেলখানাটিকে 'দূতাবাস' বলা হত, কারণ ১৭১২ সালে পারস্যের রাজদূত যখন কলকাতার পথে দিল্লীতে মোগল বাদশাহের কাছে সাক্ষাৎ করার জন্য যাচ্ছিলেন, তখন এই বাড়িতেই কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীরা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে থাকতে দেন। পুরনো গোবিন্দপুরে (নতুন কেল্লার কাছে) যখন 'রাজদূত' এসে উপস্থিত হন, তখন স্বয়ং গবর্নর রাসেল কোম্পানির পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা করতে যান। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, পারস্যের দূত মারফৎ বাদশাহের কাছে কোন সুযোগ-সুবিধার জন্য আবেদন করা। কলকাতায় প্রায় আট মাস পারস্যের দূত এই বাড়িটাতে ছিলেন। সেইজন্য বাড়িটার নাম হয়ে গিয়েছিল Ambassador's House বা দূতাবাস। পরে এই দূতাবাসটিকেই জেলখানা করা হয়। ১৭৮২ সালের কমন্স-সভার সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে লালবাজারের এই পুরনো জেলখানাটির একটি বিবরণ আছে। বিবরণটি অ্যাটর্নি উইলিয়ম হিকি প্রদত্ত। তার মর্ম এই ঃ

> জেলখানার মধ্যে প্রায় ষাট হাত স্কয়ার একটি পুকুর ছিল। এই পুকুরে কয়েদীরা 'promiscuously' স্নান করত ও কাপড়চোপড় কাচত। পুকুরের পাশে ছোট ছোট হোগলার ঘর তৈরি করে সাহেব-কয়েদীদের থাকতে দেওয়া হত। তাদের পক্ষে বেশী দিন থাকা খুবই কষ্টকর হত, কারণ ভিতরের ময়লার দুর্গন্ধে টেকা যেত না। অসুখবিসুখ হলে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না, এবং অপরাধ অনুযায়ী কয়েদীদের শ্রেণীভেদ করা হত না।

লালবাজারের কোম্পানির আমলের এই পুরনো জেলখানায় মহারাজ নন্দকুমার তাঁর ঐতিহাসিক মামলার সময় বন্দী হয়েছিলেন।

মিশন রো-র পুবদিকে প্রায় একটানা খালি জায়গা ছিল। এখন যেখানে নিউম্যান কোম্পানির বাড়ি আছে, সেই জায়গাটি কোম্পানি চার্লস ওয়েস্টনকে দিয়েছিলেন। শর্ত ছিল যে জায়গাটির উপর কোন বাড়িঘর করা চলবে না। ১৭৯৫ সালে ওয়েস্টন একই শর্তে জায়গাটি বিক্রি করে দেন। ১৮৩৩ সালে নিউম্যান কোম্পানির এই বাড়িটিতেই 'বেঙ্গল ক্লাব' ছিল।

অক্সফোর্ড ইংরেজী অভিধানে 'Esplanade' কথার অর্থ লেখা আছে, 'level space seperating citadel of fortress from town'—অর্থাৎ দুর্গ থেকে শহরাঞ্চলের মধ্যবর্তী সমতলভূমিকে 'এসপ্লানেড' বলা হয়। এখন এসপ্লানেড বলতে দুটি এসপ্লানেড বোঝায় —ময়দানের উত্তরে অবস্থিত পূর্ব ও পশ্চিম এসপ্লানেড। কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করতে হলে ময়দানটিকে বলতে হয় নতুন কেল্লার 'glacis' এবং বর্তমানের দুটি এসপ্লানেড ছাড়াও চৌরঙ্গি থেকে লোয়ার সার্কুলার রোড, ক্যালকাটা ক্লাব, প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল হয়ে খিদিরপুর ব্রিজ পর্যন্ত ছিল ঐতিহাসিক এসপ্লানেডের সীমানা।

কলকাতার বহিরঙ্গের এই বিবরণের পর এবারে জমিজমার মূল্যের কিছু বর্ণনা দেব। বর্তমান কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত পাঠকরা এবিষয়ে নিশ্চয় কৌতূহলী হবেন। আঠার শতকে কলকাতার জমিজমার মূল্যের বিবরণ মেয়রস কোর্টের প্রাচীন দলিলপত্রে পাওয়া যায়, এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকের বিবরণ পাওয়া যায়, 'লটারি কমিটির' রিপোর্টের মধ্যে। পলাশীর যুদ্ধের সময় ১৭৫৭ সালে কুমোরটুলিতে এক কাঠা জমির দাম ছিল ১১৲ টাকা। ১৭৮০ সালে সিমলে অঞ্চলে জমির দাম ছিল কাঠা প্রতি ১০৲ টাকা, এবং বাগবাজারে ২৫৲ টাকা, তিন বিঘে

উনিশ কাঠা একটি বাগান বিক্রি হয়েছিল ৯০০৲ সিক্কা টাকায়। ১৭৮৪ সালে চৈতন্যচরণ বসু ডিহি কলকাতায় (বর্তমান মধ্য-কলকাতায়) ৫ কাঠা পরিমাণ জমি ভোলানাথ বড়ালকে বিক্রি করেন ১২০১৲ টাকায়। মধ্য-কলকাতায় আঠার শতকের শেষদিকে জমির দাম প্রায় ২০০৲-২৫০৲ টাকা কাঠা হয়েছিল দেখা যায়। তাও সর্বত্র হয়েছিল বলে মনে হয় না, কারণ লটারি কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় উনিশ শতকের প্রথম দিকেও মধ্য-কলকাতায় ধর্মতলা, বৌবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে ১৫০-২০০৲ টাকা কাঠা জমির দাম ছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ম্যাঙ্গো লেন, ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রীট অঞ্চলে জমির দাম কাঠা প্রতি ১০০০-১৫০০৲ টাকা পর্যন্ত বেড়েছিল। এণ্টালি-পদ্মপুকুর অঞ্চলে ১৮১৯-২০ সালে জমির দাম ছিল ১২০-১২৫৲ টাকা কাঠা, এবং জানবাজার অঞ্চলে ১৫০৲ -২০০৲ টাকা কাঠা। ওয়েলিংটন স্কোয়ার ট্যাঙ্ক খোড়ার পর লটারি কমিটি আশপাশের জমির দাম বাড়িয়ে ১৮২০ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন 'ফ্রি স্কুল স্ট্রীট' তৈরির পরিকল্পনা করেন, তখন রাস্তার জন্য যাদের জমি দখল করা হয় তাদের ৪০০৲ টাকা থেকে ৪৭৫৲ টাকা কাঠা হারে জমির দাম দেওয়া হয়। ওয়েলিংটনের কাছে ছিল 'ডিঙ্গাডাঙ্গা খাল'। ১৮২০ সালে যখন এই খাল বুজিয়ে ফেলার পরিকল্পনা করা হয় তখন লটারি কমিটি হিসেব দেন যে প্রতি মাসে ২০০ কুলির জন্য ৭৫০৲ টাকা করে লাগবে, এবং খাল ভরাট করতে যে চারমাস সময় লাগবে তাতে মোট ৩০০০৲ টাকা খরচ হবে। এই খাল ভর্তি হবার পর তার উপর যে রাস্তা তৈরি হয়, তার নাম হয় 'ডিঙ্গাভাঙ্গা স্ট্রীট'। ১৮২১, ৮ মার্চ লটারি কমিটির সেক্রেটারি গবর্নমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারিকে লিখে জানান: 'The new Tank and Square are now denominated Wellington Square, and the new street leading from the Dhurrumtollah to the Bow Bazar Wellington Street. The new road leading from the East of the Square

to the Circular Road is called Dinga Bhanga Street'. এই ডিঙ্গাভাঙ্গা স্ট্রীটের পরে নাম হয় 'ক্রীক রো'। পটলডাঙ্গা ও মির্জাপুর অঞ্চলে ১৮২০-২১ সালে জমির দাম ছিল ১৫০৲ টাকা কাঠা। ১৮২০ সালের রিপোর্টে দেখা যায়, লটারি কমিটির সেক্রেটারি কোম্পানির অ্যাটর্নিকে ব্যাঙ্কসাল স্ট্রীটের পুবদিকের ৫ কাঠা ১২ ছটাক জমি জন বার্চ সাহেবের নামে দলিল করে দেবার জন্য চিঠিতে অনুরোধ করছেন। দলিলে জমির দাম ৬০০৲ টাকা কাঠা উল্লেখ করা হয়েছে।

আঠার শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত মধ্য ও উত্তর-কলকাতার জমির মূল্যের মোটামুটি এই হার ছিল। লটারি কমিটির রিপোর্ট পাঠ করলে বোঝা যায়, কিভাবে খানাডোবা, বনজঙ্গল ও খালবিল-ক্ষেতের ভিতর থেকে কয়েকটি গ্রাম ধীরে ধীরে নতুন নগরের মূর্তি ধারণ করছিল। নতুন নতুন ট্যাঙ্ক, স্কয়ার ও যানবাহন চলাচলের একটানা রাস্তা নির্মাণ করে গ্রামগুলিকে আধুনিক শহরের রূপ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু এই সময় কলকাতা শহর যে রূপ ধারণ করছিল তা 'baroque city'র রূপ। ল্যুইস মামফোর্ড (Lewis Mumford) তাঁর *The Culture of Cities*' গ্রন্থে এই 'বারোক' শহর সম্বন্ধে বলেছেন: 'It was one of the great triumphs of the baroque mind to organise space, make it continuous, reduce it to measure and order, to extend the limits of magnitude, embracing the extremely distant and the extremely minute; finally to associate space with motion.' প্রধানত এই 'baroque mind' নিয়েই লটারি কমিটি কলকাতার উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। বহুদূরবিস্তৃত সোজা সোজা রাজপথ তৈরি করে তাঁরা সেকালের কলকাতার অফুরন্ত অবিন্যস্ত 'স্পেস' এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুবিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, যার ভিতর থেকে যান্ত্রিক মনোভাবটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু রাস্তাঘাটের

সেই যান্ত্রিক রূপবিন্যাসের ভিতরেও একটা নতুন 'motion' বা গতি সঞ্চারিত হয়েছিল। মধ্যযুগের নগরের অলিগলির বদ্ধতা ও সংকীর্ণতা তার মধ্যে বিশেষ ছিল না। পথের প্রসার ও বিস্তারের জন্য পথিকের দৃষ্টি বহুদূর দিগন্ত পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে প্রসারিত হত। নতুন পথে পথ চলার উৎসাহ ও গতিও বেড়ে যেত অনেক। নবযুগের নতুন ঐতিহাসিক-সামাজিক গতিশীলতা নতুন কলকাতা শহরে পথঘাট ও ঘরবাড়ির বিন্যাসের মধ্যেও ধীরে-ধীরে এইভাবে ফুটে উঠেছিল।

পুরনো গ্রামের নতুন নাগরিক রূপান্তরের জন্য স্থানীয় সাধারণ মানুষের বিশেষ কোন উপকার হয়নি। লটাবি কমিটির রিপোর্ট পড়লেই বোঝা যায়, সাধারণ দরিদ্র হিন্দু-মুসলমানরাই কলকাতার আদিবাসিন্দা ছিল। নগরের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনে এবং বহিরাগত লোকের চাপে তারা ধীরে-ধীরে শহরের নানাস্থান থেকে উৎখাত হয়ে যায়। নতুন শহরের রাস্তাঘাট এবং নতুন শহরবাসীর ইটপাথরের ঘরবাড়ির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছিল তারা অনেকদিন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শহুরে জমির ফাট্‌কাবাজ দালালদের চক্রান্তে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। সেকালের গ্রাম্য দরিদ্রশ্রেণী শহরের সীমানা থেকে নির্বাসিত হয়েছিল যেমন, তেমনি শহুরে সমাজে আবার নতুন এক দরিদ্রশ্রেণীর আর্বিভাবও হয়েছিল। শহরের কুলি-মজুর, গৃহভৃত্য, পাল্কিবেয়ারা, গাড়োয়ান, সাধারণ কারিগর প্রভৃতিদের নিয়ে নতুন এক দরিদ্রশ্রেণী গড়ে উঠেছিল। অল্প বেতনের চাকুরিজীবি নিম্ন-মধ্যবিত্তেরও ভিড় বাড়ছিল শহরে। সুতরাং ধনিক-বণিকশ্রেণীর নতুন শহরে আভিজাত্যের বাইরের স্থাপত্যরূপের সামঞ্জস্য সর্বত্র বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। মামফোর্ডের ভাষায় বলা যায়ঃ 'The pressure of competition for space forced up land values and high land values hardened into a bad pattern for housing. Slum housing for a large part of population became the characteristic mode of the city.'

কলকাতা শহরে নতুন ধনিকদের বড় বড় অট্টালিকা যেমন গড়ে উঠেছিল, তেমনি নতুন দরিদ্রশ্রেণীর বসবাসের বস্তিও, কতকটা ব্যাঙের ছাতার মতন, চারিদিকে গজিয়ে উঠছিল। তার মধ্যে পুরনো গ্রাম্য-বাসিন্দাদের হোগলা-খড়-পাতার কুঁড়েঘরও ছিল যথেষ্ট। জর্জ জনসন তাঁর '*The Stranger in India*' (লণ্ডন ১৮৪৩) গ্রন্থে লিখেছেন যে, কলকাতায় তখন উকিল-ব্যারিস্টার-অ্যাডভোকেটরা সুপ্রিম কোর্টের কাছাকাছি এসপ্লানেড অঞ্চলে থাকতেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যে বাঙালী বা ভারতীয়ের সংখ্যা তখন খুবই নগণ্য ছিল। আঠার শতকের শেষে বা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্যারিস্টার-অ্যাডভোকেটদের মধ্যে সকলই প্রায় বিদেশী ছিলেন। জনসন বলেছেন, কোম্পানির কর্মচারী, ডাক্তার ও মার্চেন্টদের মধ্যে অধিকাংশই থাকতেন তখন গার্ডেনরীচ ও চৌরঙ্গি অঞ্চলে। গার্ডেনরীচ অঞ্চলে তখন সাহেবদের বড় বড় বাগানবাড়ি ছিল। উইলিয়ম হিকি (William Hickey) তাঁর 'স্মৃতিকথায়' গার্ডেনরীচ সম্বন্ধে চমৎকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। চৌরঙ্গি অঞ্চলে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বড় বড় উদ্যানবেষ্টিত অট্টালিকা প্রধানত সাহেবদের বসবাসের জন্য গড়ে উঠেছিল। ১৮২২ সালে ফ্যানি পার্কস (Fanny Parkes : *Wanderings of a Pilgrim etc,* London 1850) কলকাতা শহর দেখে তার 'City of Palaces' নাম সার্থক বলে স্বীকার করেছিলেন। চৌরঙ্গি অঞ্চল তিনি দেখেছিলেন, 'filled with beautiful detatched houses, surrounded by gardens'. বিনা আসবাবপত্রে চৌরঙ্গি অঞ্চলের বাড়িভাড়া ছিল তখন মাসে ৩০০৲ টাকা থেকে ৫০০৲ টাকা পর্যন্ত। ফ্যানি তাঁর নিজের জন্য ৩২৫৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় একটি বাড়ি নিয়েছিলেন।

এই প্রাসাদপুরী কলকাতা আরও একজন বিদেশী পর্যটক দেখেছিলেন উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে। ভদ্রলোক অক্টারলোনি মনুমেণ্টের মাথায় উঠে সারা কলকাতা শহরের দিকে চেয়ে ঘরবাড়ি-বসতির যে-দৃশ্য

দেখেছিলেন, তা সাহেব-নবাবের আমলের মহানগরের একটি নিখুঁত বাস্তবচিত্র হিসেবে অবিস্মরণীয় (A Griffin : *Sketches of Calcutta* etc, Glasgow 1843)। মনুমেণ্টের মাথায় উঠে 'নেটিব টাউন' কলকাতার দিকে চেয়ে সাহেব বিস্মিত হয়ে লিখেছেন ঃ

> There is behold a countless number of flat-roofed houses with and without balustrades, so close do these roofs appear to be one another that he who inclines, may apparently walk and jump over them from the end of the native town to the other without interruption from streets, lanes, squares and compounds. In other parts of the native town the houses are covered with tiles, these houses are if possible closer to one another than the flat-roofed ones, and have not a pleasing appearance...and the most of the chunamed houses in the north-east part of it are dingy...

সাহেবের চোখের সামনে অসংখ্য ফ্ল্যাট-ছাদওয়ালা বাড়ি ভেসে উঠেছিল। বাড়িগুলির ছাদ এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, সাহেবের মনে হয়েছে, ছাদ থেকে ছাদান্তরে লাফ দিতে দিতে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যে-কেউ ইচ্ছা করলে ঘুরে বেড়াতে পারেন। রাস্তাঘাট, অলিগলি, স্কয়ার-কম্পাউণ্ড, কোন কিছুই তাঁর লম্ফযাত্রাপথে বাধা বলে মনে হবে না। শহরের অন্যান্য অংশে বেশীর ভাগই হল টালির ঘর, এবং তা দেখতে আদৌ মনোরম নয়। উত্তর-পুবের চূনকাম করা ঘরগুলি খুবই ঘিন্‌জি।

এই দৃশ্য দেখে সাহেব মনুমেণ্টের মাথার উপর থেকে নিচে নেমে এসে পাল্কিতে চড়ে 'টাউন' পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত করেন। দর্শনান্তে বিবরণ দেওয়ার আগে তিনি গোড়াতেই সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে ঃ 'প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, এই দাম্ভিক মহানগরের

অধিকাংশ লোকের বসতবাড়ি নগণ্য পর্ণকুটির ছাড়া কিছু নয়। এই সব কুটির এত ছোট যে মাত্র সাতফুট লম্বা, পাঁচফুট চওড়া ও পাঁচফুট উঁচু এক-একটা ঘরের আয়তন। এই সব ঘরে একটি করে চারপাঁচ জনের পরিবার বসবাস করে। সাহেবের বর্ণিত এই কুটিরগুলি 'বস্তি' ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন কোন জায়গায় বস্তিগুলি বড়লোকদের বড় বড় অট্টালিকার পাশেই অবস্থিত। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন (P. Sorokin) বলেছেন যে, শহর হল সত্যকার একটি '*coincidentia oppositorum*', অর্থাৎ 'the place of coexistence of the greatest contrasts and contact of people of most opposite social status, standards, capacities, occupations, religions, mores, manners and what not'. প্রাসাদপুরী কলকাতা শহর, উনিশ শতকের প্রথম ভাগের মধ্যেই, ভয়াবহ বস্তিপুরীতেও পরিণত হয়েছিল। কোটিপতি, লক্ষপতি ধনিকশ্রেণীর তলায় নতুন শহুরে সমাজে বিপুল-কলেবর এক নিঃস্ব মেহনতজীবী দরিদ্রশ্রেণীর যে বিকাশ হয়েছিল, তারই সামাজিক ব্যবধান ও বৈসাদৃশ্য ফুটে উঠেছিল প্রাসাদ-বস্তির পাশাপাশি স্থাপত্য-বৈকট্যের মধ্যে।

অবশেষে ছদ্মবেশী সাহেব অভিযোগ করেছেন যে, এত বড় মহানগরে পাল্কিতে চড়ে নির্বিঘ্নে পথচলাও মধ্যে মধ্যে দায় হয়ে ওঠে। তার কারণ কলকাতার পথেঘাটে, অলিগলিতে প্রায়ই দেখা যায়, এক-একটি বৃহদাকার 'brahmanic bull' (বোধ হয় ধর্মের ষাঁড়) ধ্যানগম্ভীর মূর্তিতে দণ্ডায়মান। পথযাত্রী ও যানবাহন, সকলের প্রতিই তারা নির্বিকার। সাহেবের অভিযোগ মিথ্যা নয়। ধর্মের ষাঁড়েরা সেদিন পর্যন্ত কলকাতা শহরে পথচলাচলে অনেক ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। একেবারে সম্প্রতি তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে অটোমোবাইলের তাড়নায়।

যে কলকতা শহরে সাহেব-নবাবরা তাঁদের জীবনের সোনার দিনগুলি চরম ভোগবিলাসিতার মধ্যে কাটিয়েছিলেন, এবং স্বদেশে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে ‘Nabob’ বলে খ্যাতিলাভ করা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন যে-দিনগুলির স্মৃতি তাঁরা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি, আমরা এতক্ষণ টুকরো টুকরো বর্ণনা সহযোগে শহরের সেই রূপটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। সাহেবরা সেকালের কোম্পানির সাধারণ কর্মচারী থেকে কিভাবে নানা কৌশলে অর্থ রোজগার করে এদেশে ‘নবাব’ বনে গিয়েছিলেন, তারও কিছুটা বিবরণ দিয়েছি। সামান্য একজন রাইটার ও ফ্যাক্টর থেকে কিভাবে তাঁদের মধ্যে অনেকে কোম্পানির চাকরিতে শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন, সেকথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

এডওয়ার্ড বাবের (Edward Baber) ১৭৬৩ সালে বাংলাদেশের ‘রাইটার’ ছিলেন, ১৭৬৮ সালে ‘ফ্যাক্টর’ হন, ১৭৭১ সালে ‘জুনিয়ার মার্চেণ্ট’ ও মেদিনীপুরের ‘রেসিডেণ্ট’ হন, ১৭৭৪ সালে ‘সিনিয়র মার্চেণ্ট’ ও মুর্শিদাবাদের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। ১৭৮৩ সালে বাবের প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যান। **রিচার্ড বারওয়েল** (Richard Barwell) ১৭৫৬ সালে বাংলাদেশের ‘রাইটার’ ছিলেন। ১৭৭৩ সালের ‘রেগুলেটিং অ্যাক্টে’র পর কৌন্সিলের সদস্য হন। হেস্টিংসের একজন বড় সমর্থক ছিলেন বারওয়েল। ১৭৮০ সালে অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে তিনি ইংলণ্ডে ফিরে যান। **রিচার্ড বেশার** (Richard Becher) ১৭৪৫ সালে ‘ফ্যাক্টর’ ছিলেন, ১৭৪৬ সালে কাশীমবাজার কৌন্সিলের চতুর্থ সভ্য হন, পরে জুনিয়র মার্চেণ্ট ও কাশীমবাজারের দ্বিতীয় সভ্য হন। ১৭৫১ সালে সিনিয়র মার্চেণ্ট ও গবর্নরের কৌন্সিলের একাদশ সভ্য হন, ১৭৫৬ সালে ঢাকার প্রধান কর্মকর্তা ও গবর্নরের কৌন্সিলের চতুর্থ-সভ্য হন। ১৭৫৭ সালে আমদানি মালগুদামের বড়কর্তা হন। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার পরাজয়ের সময় লুণ্ঠিত ধনের বখ্‌রা পান ২৭০০০ পাউণ্ড।

১৭৭০ সালে কৌন্সিলের দ্বিতীয় সভ্য ও মুর্শিদাবাদে রেভিনিউ কৌন্সিলের 'চীফ' নিযুক্ত হন। ১৭৮১ সালে ঢাকার টাকশালের 'সুপারিনটেণ্ডেণ্ট' হয়ে, ১৭৮২ সালে কলকাতায় মারা যান। **জন বার্ডেট** (John Burdett) ১৭৫৫ সালে 'রাইটার' ছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার অভিযানের সময় অন্ধকূপে বন্দী হন, কিন্তু বেঁচে যান। ১৭৬৫ সালে নিজামউদ্দৌলার সিংহাসনলাভের সময় ১১৬৬৭ পাউণ্ড ঘুষের ভাগ পান। **আলেকজাণ্ডার ক্যাম্পবেল** (Alexander Campbell) ১৭৬৩ সালে 'জুনিয়র মার্চেণ্ট' ও 'Assaymaster' হয়ে বাংলাদেশে আসেন, পরে 'সিনিয়র মার্চেণ্ট' ও গবর্নরের কৌন্সিলের সভ্য হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা যায় যে, তিনি 'মিণ্টমাস্টার' থাকাকালে বহু টাকা বে-আইনীভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন। **জন কার্টিয়ের** (John Cartier) ১৭৪৯ সালে 'রাইটার' ছিলেন, ১৭৫৫ সালে 'ফ্যাক্টর' ও ঢাকার 'অ্যাসিস্টাণ্ট' হন। ১৭৬১ সালে 'জুনিয়র মার্চেণ্ট' ও ঢাকা কৌন্সিলের দ্বিতীয় সভ্য হন। ১৭৬২ সালে ঢাকার 'চীফ' ও গবর্নরের কৌন্সিলের সভ্য হন। ১৭৭০ সালে গবর্নর হন। ১৭৭৪ সালে ইংলণ্ডে ফিরে কেণ্টে অগাধ সম্পত্তি কিনে অবসর গ্রহণ করেন। **জেরার্ড ডুকারেল** (Gerard Ducarel) ১৭৬৫ সালে 'রাইটার' হন, পরে ১৭৭০-৭২ সালে 'ফ্যাক্টর' ও পুর্ণিয়ার 'কলেক্টর' হন। ১৭৭৫ সালে কলকাতার রেভিনিউ কমিটির সভ্য হন, এবং ১৭৭৬ সালে 'সিনিয়র মার্চেণ্ট' ও ১৭৮২ সালে বর্ধমানের 'কমিশনার' হন। **চার্লস গোরিং** (Charles Goring) ১৭৬৩ সালে 'রাইটার' হন, ১৭৬৪ সালে কাশীমবাজারের সহকারী হন। পরে 'সিনিয়র মার্চেণ্ট' হয়ে ১৭৭৬ সালে কলকাতা রেভিনিউ কমিটির 'চীফ' পদে নিযুক্ত হন। ইনি ফ্র্যান্সিসের একজন অনুরাগী ছিলেন। **উইলিয়ম হারউড** (William Harwood) ১৭৬৩ সালে 'রাইটার' ছিলেন, ১৭৬৮ সালে ...টর হন, ১৭৭০-৭১ সালে 'জুনিয়র মার্চেণ্ট' এবং রাজমহল ও

ভাগলপুরের 'সুপারভাইজর' হন। ১৭৭২ সালে এই জেলার কলেক্টর হন। ১৭৭৪ সালে 'সিনিয়র মার্চেন্ট' ও কলকাতা রেভিনিউ কমিটির সভ্য হন। ১৭৭৫ সালে দিনাজপুরের 'চীফ' নিযুক্ত হন। **টমাস হেঞ্চম্যান** (Thomas Henchman) ১৭৬৫ সালে 'রাইটার' ছিলেন, ১৭৬৯-৭০ সালে 'ফ্যাক্টর' ও কাশীমবাজারের সহকারী হন। মালদহের 'রেসিডেন্ট' হন ১৭৭১ সালে। ১৭৭৬ সালে হন 'সিনিয়র মার্চেন্ট'। **উইলিয়ম ম্যারিয়ট** (William Marriott) ১৭৬৪ সালে 'রাইটার' ছিলেন, ১৭৭০ সালে ফ্যাক্টর ও বর্ধমান জেলার সহকারী, এবং ১৭৭১ সালে দিনাজপুরের 'সুপারভাইজর' হন। 'জুনিয়র মার্চেন্ট' ও দিনাজপুরের কলেক্টর হন ১৭৭২ সালে। ১৭৭৬ সালে 'সিনিয়র মার্চেন্ট' ও কলকাতা রেভিনিউ কমিটির সভ্য হন, এবং বর্ধমানের 'চীফ' নিযুক্ত হন ১৭৭৯ সালে। **মেজর চার্লস মারস্যাক** (Major Charles Marsack) ১৭৬৫ সালে 'বেঙ্গল আর্মির' দ্বিতীয় লেফ্‌টেন্যান্ট ছিলেন, ১৭৬৭ সালে লেফ্‌টেন্যান্ট ও ১৭৭১ সালে ক্যাপ্‌টেন হন। ভারতবর্ষ থেকে ইংলণ্ডে ফিরে রিচার্ড বেশারের কন্যাকে বিবাহ করেন। অক্সফোর্ডশায়ারে প্রায় ১ লক্ষ ৭ হাজার পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তির মালিক ছিলেন তিনি, এবং তাঁর ব্যক্তিগত ধনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭৬ হাজার পাউণ্ড। **চার্লস স্ট্যাফোর্ড প্লেডেল** (Charles Stafford Playdell) ১৭৪৪ সালে বাংলাদেশে 'রাইটার' ছিলেন, ১৭৫৩ সালে 'জুনিয়র মার্চেন্ট,' ১৭৫৬ সালে 'সিনিয়র মার্চেন্ট' এবং ১৭৫৯ সালে ঢাকার 'চীফ' হন। নিজামউদ্দৌলার সিংহাসনলাভের সময় প্লেডেল ১১৬৬৭ পাউণ্ড উৎকোচের অংশ পান। ১৭৭৪ সালে হেস্টিংস তাঁকে পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট নিযুক্ত করেন। হলওয়েলের জামাই ছিলেন প্লেডেল। ১৭৭৯ সালে প্লেডেল কলকাতায় মারা যান। **জন সেক্সপীয়র** (John Shakespear) ১৭৬৭ সালে 'রাইটার' ছিলেন, পরে ফ্যাক্টর, জমিদার, জুনিয়র ও সিনিয়র মার্চেন্ট ও ঢাকার 'চীফ' হন।

১৭৮২ সালে কাজ থেকে অবসর নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যান। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক থ্যাকারের পিতামহ **উইলিয়ম থ্যাকারে** (W. M. Thackeray) বাংলাদেশে ১৭৬৬ সালে 'রাইটার' ছিলেন, পরে ১৭৭১ সালে 'ফ্যাক্টর' ও ঢাকার কৌন্সিলের সভ্য হন। ১৭৭২ সালে শ্রীহট্টের 'কলেক্টর' হন। সেই সময় কোম্পানিকে হাতী সাপ্লাই করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ১৭৭৭ সালে ইংলণ্ডে ফিরে যান। **জর্জ ভ্যান্সিটার্ট** (George Vansittart, হেনরি ভ্যান্সিটার্টের ভাই) ১৭৬১ সালে 'রাইটার' ছিলেন, পরে ফার্সী অনুবাদক ও 'ফ্যাক্টর' হন। ১৭৬৭ সালে মেদিনীপুরের 'রেসিডেন্ট', ১৭৬৯ সালে 'জুনিয়র মার্চেন্ট', ১৭৭২ সালে 'সিনিয়র মার্চেন্ট' ও পাটনার রেভিনিউ কৌন্সিলের 'চীফ' নিযুক্ত হন। বোর্ড অফ ট্রেডের সভ্য হন ১৭৭৪ সালে। **হেনরি ভ্যান্সিটার্ট** (Henry Vansittart) প্রথমে মাদ্রাজে ছিলেন। ভাল ফার্সী শেখেন এবং ক্লাইভের বন্ধু হন। প্রচুর অর্থ উপার্জন করে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে অল্পদিনের মধ্যে তা উড়িয়ে দেন। কৌন্সিলের সভ্য হয়ে আবার ভারতবর্ষে ফিরে আসেন, এবং ১৭৫৯ সালে ফোর্ট উইলিয়মের গবর্নর নিযুক্ত হন। ১৭৬০ সালে মীরকাশীমের সিংহাসনলাভের সময় ৫৮৩৩৩ পাউণ্ড উৎকোচের অংশ পান। পরে ক্লাইভের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটে, এবং তিনি ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে সাহেব-নবাবগোষ্ঠীর একজন প্রধানরূপে বসবাস করতে থাকেন। ১৭৬৯ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'ডিরেক্টর' হন। ১৭৭০ সালে বাংলাদেশে কোম্পানির কাজকর্মের পদ্ধতি সংস্কারের জন্য যে তিনজন 'সুপারভাইজর' নিযুক্ত হন, তাঁদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। কিন্তু সমুদ্রপথে জাহাজডুবির ফলে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও মারা যান। **হ্যারি ভেরেলস্ট** (Harry Verelst) ১৭৪৯ সালে 'রাইটার' ছিলেন, পরে 'ফ্যাক্টর' হন। সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক বন্দী হন, পলাশীর যুদ্ধের পর মুক্তি পান। ১৭৬৫-৬৬ সালে বর্ধমানের 'সুপারভাইজর' হন। ১৭৬৮ সালে গবর্নর নিযুক্ত হন।

এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, কেন ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, ইংলণ্ডের উচ্চাভিলাষী সাহসী যুবকেরা কোম্পানির অধীনে সামান্য বেতনে 'রাইটারের' চাকরি নিয়ে আসার জন্য উদ্‌গ্রীব হতেন। 'সাত সমুদ্র তের নদী পারের' অজানা দেশে অনিশ্চিত ভাগ্যের সন্ধানে এসে স্বদেশে ফিরে যাবার সম্ভাবনাও তখন তেমন ছিল না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নানারকম অসুখবিসুখে মৃত্যুর সম্ভাবনাই তখন বেশী ছিল। বিদেশে বাংলাদেশে কোম্পানির অনেক কৃতী ও কুখ্যাত কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। কলকাতা শহরে পার্ক স্ট্রীটের ও প্রাচীন গীর্জাপ্রাঙ্গণের গোরস্থানে ঘুরলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তা ছাড়া, কলকাতার বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যেখানে যেখানে ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি ও কর্মকেন্দ্র ছিল, সেই সব অঞ্চলে জরাজীর্ণ ঘরবাড়ির অনতিদূরেই দেড়শ-দু'শ বছরের প্রাচীন সব গোরস্থান দেখা যায়। এই সব গোরস্থানে মৃত ইংরেজদের স্মৃতিফলকের লেখাগুলি পাঠ করলে মনে হয়, তাঁদের নশ্বর দেহের সঙ্গে অনেক ইচ্ছা-আশা-আকাঙ্ক্ষারও সমাধি হয়েছে এদেশের মাটিতে। তাঁদের কীর্তির গৌরব, অথবা নানা উপায়ে অর্জিত, লুণ্ঠিত ও সঞ্চিত ধনসম্পদ, কোন কিছুই তাঁরা-স্বদেশে নিয়ে গিয়ে অন্যান্য ভাগ্যবানদের মতন উপভোগ করতে পারেননি। অবশ্য ধনসম্পদ যে তাঁরা এদেশে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন তা নয়, তাঁদের স্ত্রীপুত্র-কন্যারা তা দেশে নিয়ে গিয়ে ঠিকই ভোগ করেছেন। কিন্তু তবু কোম্পানির আমলের এই নতুন ইংরেজ নবাবগোষ্ঠীর অনেকেই যে স্বদেশে ফিরে নবাবের জীবন যাপন করতে পারেননি, সেটা নিশ্চয়ই তাঁদের দিক থেকে আফশোসের কথা। আফশোসের এই সামান্য কারণটুকু বাদ দিলে, ব্যক্তিগত জীবন এদেশেও তাঁরা চূড়ান্তভাবে উপভোগ করে গেছেন দেখা যায়। জীবনের ভোগবিলাসের দিক থেকে অন্তত তাঁদের কোনকালেই কোন আফশোস করার কারণ ঘটেনি। স্বদেশে ইংলণ্ডে তাঁরা নতুন নবাব বলে পরিচিত হয়েছিলেন, আর

নবাবের দেশ বলে এদেশে তাঁদের 'সাহেব' পরিচয়ই লোকের মনে যথেষ্ট ভয় ও বিস্ময় উদ্রেক করত। নবাব ও নবাবের অভিজাত আমলা-অমাত্যদের হালচাল তাঁরা যথাসম্ভব অনুকরণ করে চলবার চেষ্টা করতেন। খানাপিনার সমারোহে, নাচগানের সভায়, ভোজ-বাজির উৎসবে, চলাফেরার ও আদবকায়দার বিলাসিতায় কেউ কেউ এদেশের নবাবদের পর্যন্ত হার মানিয়ে দিতেন। তারই কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়ে সাহেব-নবাবদের টাউনের কথা শেষ করব।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইংরেজরা বাংলাদেশে প্রথমে হুগলীতে যখন বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন, তখন বহু বাধাবিপত্তি, অসুবিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তাঁদের জীবন কাটাতে হত। তখন তাঁরা একদল বিদেশী বণিক ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। এদেশের নবাবরা, অথবা তাদের আমলা-অমাত্যরা তাঁদের বিচিত্র রূপ ও আচার-ব্যবহার দেখে কৌতূহলী হতেন বটে, কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যের পদ্ধতি দেখে সবসময় প্রীত হতেন না। ইংরেজরাও তাই তখন অন্যান্য বিদেশী বণিকদের মতন সর্বদাই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন এবং নবাব ও তাঁর কর্মচারীদের মেজাজ লক্ষ্য করে চলতেন। কোম্পানির বড় কর্তারাও বিলেত থেকে মধ্যে মধ্যে তখন কড়া নির্দেশ পাঠাতেন, তাঁদের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য। কোম্পানির কুঠির চৌহদ্দিও তখন খুব বড় ছিল না, ভিতরের ঘরবাড়িগুলিও অতিসাধারণ ছিল। কোম্পানির কর্মচারীরা কুঠির এলাকার মধ্যে এইসব ঘর-বাড়িতে বাস করতেন। কর্মচারীদের সংখ্যাও তখন অল্প ছিল। হুগলীর কুঠির পরিচালক ছিলেন চারজন, এবং তাঁদের-মধ্যে 'এজেন্ট' ছিলেন প্রধান কর্মকর্তা। এই চারজন ছাড়া কৌন্সিলের একজন 'সেক্রেটারি' থাকতেন। এ ছাড়া একজন 'চ্যাপলেন', একজন 'সার্জেন', এবং 'রাইটার', 'ফ্যাক্টর', 'জুনিয়র-সিনিয়র মার্চেন্ট' ও অন্যান্য 'অ্যাপ্রেন্টিসরাও' থাকতেন। এজেন্টের

বেতন বছরে একশ পাউণ্ড থেকে ১৬৮২ সালে দু'শ পাউণ্ড পর্যন্ত হয়। চ্যাপলেনের বেতন ছিল বছরে ১০০ পাউণ্ড, ফ্যাক্টরদের বেতন ছিল ২০ থেকে ৪০ পাউণ্ড, এবং রাইটারদের বেতন ছিল বছরে মাত্র ১০ পাউণ্ড। উইলসন (C. R. Wilson) বলেছেন ঃ

> These rates of salary were merely nominal : what the real incomes of the various ranks were it is impossible to say, for, besides what they gained by private trade, they drew considerable sums from the public funds as allowances for various purposes.

কুঠির বাইরে এজেণ্টের বিনা হুকুমে কারও যাবার কোন অধিকার ছিল না। কুঠির ভিতরের পরিবেশ ছিল ঠিক স্কুল-কলেজের মতন। সকালে কাজের সময় ছিল বেলা ৯-১০ থেকে ১২টা পর্যন্ত, তারপর বিকেলে আরও ঘণ্টা দুই, বেলা প্রায় ৪টা পযন্ত। দুপুরে সকলে মিলে একটি হলঘরে বসে খাওয়াদাওয়া করতেন, এবং পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রত্যেকের বসবার ব্যবস্থা ছিল। উইলসন লিখেছেন ঃ 'There was a plentiful supply of plate···They drank arrack punch and Shiraz wine. European wine and bottled beer were great luxuries.' প্রচুর পরিমাণে খাদ্যের ব্যবস্থা থাকত, এবং ভারতীয়, পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, প্রভৃতি সকল রকমের রাঁধুনিরা সেগুলি রান্না করে দিত। মদ্যপান তাঁরা করতেন, কিন্তু বিলাতি মদ রীতিমত বিলাসিতার ব্যাপার ছিল বলে দেশী ধেনোতেই কাজ সেরে নিতেন। রবিবার ও ছুটির দিনে শিকার করতে যাওয়া তাঁদের একটা বড় কাজ ছিল। শিকার থেকে ফিরে এসে সকলে প্রচুর পরিমাণে পানভোজন করতেন, একেবারে তরুণবয়স্ক 'রাইটাররা' পর্যন্ত বাদ যেতেন না। সেই পানোন্মত্ত অবস্থায় সকলে উচ্চকণ্ঠে রাজার ও কোম্পানির দীর্ঘজীবন কামনা করে গান করতেন। কেবল মদ্যপান ও উন্মত্ততার ব্যাপারে নয়,

উইলসন বলেছেন, "The English in Bengal were equally notorious for their quarrels'. প্রত্যেকেই যে-কোন প্রকারে অর্থ রোজগারের ধান্ধায় থাকতেন এবং তাই নিয়ে পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি, অবশেষে মারামারি পর্যন্ত হত। প্রত্যেক কর্মচারী কোম্পানির গোয়েন্দার কাজও করতেন, কেউ কাউকে বিশ্বাস করতেন না। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জন্য প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হত এবং ঝগড়া হলেই তার সমাপ্তি হত মারামারিতে। সায়েস্তা খাঁ একবার বিরক্ত হয়ে তাই এই ইংরেজ বণিকদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'a Company of base quarrelling people and foul dealers,' এবং তাঁর কথা যে অনেকটা সত্য তা কুঠির সাহেবদের জীবনযাত্রার এই ধারা দেখলেই বোঝা যায়। তাও তো তখন তাঁরা 'full-নবাব' হননি, 'half-নবাব' মাত্র ছিলেন। হুগলীর কুঠির আমলে, চার্নক-হেজেস-স্ট্রেনশ্যাম মাস্টারের দিনে, ইংরেজরা এদেশের হালচাল দেখে সবেমাত্র সিকি-নবাব হয়েছিলেন, 'ফুল' তো দূরের কথা, 'হাফ' নবাবও সকলে হতে পারেননি।

আঠার শতকের মধ্যে তাঁরা খুব দ্রুত 'ফুল-নবাব' হয়ে উঠলেন। কলকাতা, ২৪-পরগণা, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার জমিদার হয়ে, বিশেষ করে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করার পর থেকে, তাঁদের নবাবীর লক্ষণগুলি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেতে থাকল। আতসবাজির জমকাল উৎসবে, নাচগান-পানের বড় বড় ভোজসভায়, আমেরী নৌকাবিলাসে এবং অসংখ্য ভৃত্যবেষ্টিত দৈনন্দিন জীবনের বিলাসিতায়, সতের শতকের শেষার্ধের নাবালক ইংরেজ নবাবরা আঠার শতকে সবেগে সাবালক নবাব হয়ে উঠলেন।

বাজির তামাসায় সাহেব-নবাবরা কত লক্ষ লক্ষ টাকা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছেন তার হিসেব নেই। 'Vauxhall and Fire-works, at Cossinaut Baboo's Garden House, in the Durrumtollah'—১৭৮৮ সালের একটি বিজ্ঞাপনের 'হেডিং'।

বিজ্ঞাপনদাতা গেরার্ড নামে জনৈক খেলোয়াড় সাহেব। ইংরেজদের কোন বিজয়োৎসব উপলক্ষে এই বাজির খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। 'God save the king,' 'Long live the king' ইত্যাদি নানারকমের ব্রিটিশ রাজভক্তির কথা বাজির আগুনের অক্ষরে কলকাতার আকাশে লিখে দিয়ে গেরার্ড সাহেব 'নেটিব' শহরবাসীদের বিমুগ্ধ বাহবা পেয়েছিলেন। ১৮০৩ সালে মারাঠা যুদ্ধের জয়োৎসবে যে আতসবাজির অনুষ্ঠান হয়েছিল কলকাতায় (ওয়েলেসলির আমলে), সমসাময়িক পত্রিকায় তারও বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮০৩, ফেব্রুয়ারি মাসের 'The Calcutta Monthly Journal' পত্রিকা থেকে এই বাজির অনুষ্ঠানের বিবরণ উদ্ধৃত করছি ঃ

> The fireworks afforded an abundant display of ingenious variety and execution. The most remarkable objects were, four figures of fire representing the fight of the Elephant, admirably conducted; a Volcano of fire, which continued for a considerable time to discharge Rockets and Flames of different colours; two beautiful Temples, some very fine fountains of fire and blue lights, and a great variety of Stars, Suns etc. Amongst other ingenious devices was a Globe, which after discharging fire for sometime, opened, and discovered a transparency in Persian characters to the following effect: 'May your prosperity be Perpetual'.

মহাশূন্যে হাতির লড়াই, রঙ-বেরঙের রকেট ও হাউই, সুন্দর সুন্দর দেবালয়, নানারকমের আলোর খেলা, বিচিত্র সব চন্দ্র, সূর্য, তারা, এবং অবশেষে প্রকাণ্ড একটি গোলাকার গ্লোবের ভিতর থেকে ফার্সী অক্ষরে লেখা কল্যাণবাণী—এই সব ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। কেবল বাজি-উৎসবের এই এলাহি সমারোহ কল্পনা করা যায় না।

এগুলি সরকারী উৎসব হলেও, সাহেব-নবাবরা ব্যক্তিগত পারিবারিক অনুষ্ঠানেও এই ধরনের চোখ-ধাঁধানো বাজির খেলা দেখাতে ভালবাসতেন। এদেশের সাধারণ মানুষের মেহনত ও জাতীয় সম্পদ শোষণ করে যে বিপুল অর্থ তাঁরা সঞ্চয় করেছিলেন, তার একটা বড় অংশ এইভাবে তাঁরা বাজির আগুনে পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করেছিলেন।

কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট জর্জ জনসন তাঁর '*The Stranger in India*' গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'The Characteristic—the curse—of English society in India is its extravagance.' জনসন এই সাহেব-সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি চমৎকার বর্ণনাও দিয়েছেন। সকালে উঠেই সাহেব সহিসকে ডাকেন ঘোড়া নিয়ে আসার জন্য। সহিস অবশ্য ঘোড়া সাজিয়েই তৈরি হয়ে থাকে। অশ্বপৃষ্ঠে প্রাতঃভ্রমণ না করলে সাহেবের মেজাজই ঠিক হত না। তার জন্য আবার আর্বী ঘোড়ার দরকার হত। তখনকার দিনেই ১০০০-১২০০৲ টাকার কমে একটা আর্বী ঘোড়া পাওয়া যেত না। এক কাপ গরম কফি খেয়ে সাহেব প্রাতঃভ্রমণে বেরুতেন এবং ফিরে এসে প্রাতরাশ ভোজনে বসতেন। বেলা ৯টা বাজত এই 'ব্রেকফাস্ট' খেতে। নাম 'ব্রেকফাস্ট' হলেও, খাবার টেবিলে প্রচুর খাদ্যের আয়োজন করা হত। এ কেবল রুটি-মাখন-আণ্ডার সামান্য ব্যাপার নয়, সিদ্ধ মাছ মাংস ডিম, কারি, কেক, টোস্ট ইত্যাদির ঢালাই ব্যাপার। যে-কোন পাত্রে খাবার দিলে সাহেবের মুখে রুচত না, তার জন্য দামি দামি সিলভার ও চায়না প্লেট-বৌল ইত্যাদি দরকার হত। প্রাতরাশের সঙ্গে সংবাদ-পত্র পাঠ শেষ করে সাহেবরা যে যার কাজকর্মে বেরুতেন। কেউ যেতেন অফিসে, কেউ নিলামঘরে, কেউ কোম্পানির কাজে, কেউ বা নানারকমের অবৈধ বাণিজ্যের ধান্ধায়।

সাহেব বেরিয়ে যাবার পর দ্বারোয়ানকে বলে যেতেন, মেমসাহেবের জন্য 'বাক্সওয়ালা' (Boxwallah) ডেকে দিতে। সাহেবের দেওয়া

নাম 'বাক্সওয়ালা' হলেও, এরা আমাদের শহরের বহু-পরিচিত রকমারি জিনিসের ফেরিওয়ালারা ছাড়া আর কেউ নয়। পিঠে বিরাট একটি বোঁচকা বেঁধে, তার মধ্যে ডজন ডজন ছোটবড় বাক্সে নানারকমের জিনিস নিয়ে, কলকাতার পথে পথে ঘুরে এই ফেরিওয়ালারা ফিরি করে বেড়াত। রকমারি জিনিসের সুদীর্ঘ তালিকাটি তারা সুন্দর একটি সুর করে আবৃত্তি করত—যেমন, 'মাথার কিলিপ-কাঁটা চায়', 'হেজলিন চায়,পমেটম চায়' ইত্যাদি। বোধ হয় পুঁটলির মধ্যে বাক্সের বহর দেখে সাহেবরা এদের 'বাক্সওয়ালা' নাম দিয়েছিলেন। 'বাক্সওয়ালা' এলে মেম-সাহেবরা তাঁদের খুশি ও পছন্দ মতন নানারকম জিনিসপত্র কিনতেন। ফেরিওয়ালারাও 'money not want, mem say own price', ইত্যাদি নানারকমের কথা বলে মেমকে প্রচুর জিনিস ধারেও গছিয়ে দিয়ে যেত। অবশেষে মাসান্তে যখন ফেরিওয়ালার বিল বড়সাহেবের কাছে আসত, তখন তাঁর দু'টি চক্ষুই আকর্ণ বিস্ফারিত হয়ে যেত। তবু বিবির ইচ্ছায় ও স্বাধীনতায় সাহেব কখনও হস্তক্ষেপ করতেন না, ধীরে ধীরে দেনার অকূল সমুদ্রে ডুবে যেতেন।

ফেরিওয়ালার কাছে জিনিস কেনাকাটা শেষ হলে মেমসাহেব দুইঘোড়া বা চারঘোড়ার গাড়ী যুতে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন। পরিচিত মহলে ঘুরে বাড়ি আসতে তাঁর মধ্যাহ্ন পার হয়ে যায়। তারপর টানাপাখার তলায় শুয়ে তিনি দ্বিপ্রহরের সুখনিদ্রায় অভিভূত হন। এই সুখনিদ্রাকে জনসন 'luxury of a deshabille siesta' বলেছেন। নিদ্রা ভাঙতে বেলা পাঁচটা বেজে যায়। সাহেবরা তখন কাজকর্ম থেকে ফিরে আসেন, এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে স্নানঘরে ঢুকে আরামে স্নান করেন। তারপর নতুন গাড়ীতে নতুন ঘোড়া যুতে সাহেব ও মেম দু'জনেই সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ভ্রমণ সেরে রাত আটটার মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসেন 'ডিনার' খাবার জন্য। এই ডিনারকে জনসন 'something like a repast' বলেছেন। আগেকার দিনের গরুভেড়ার মাংসের অত্যাচার ডিনার-টেবিলে আর সহ্য করতে হয় না।

ষাঁড় ও ভেড়ার বদলে এখন ভাল ভাল মুর্গীর ফরাসী খানাও খেতে পাওয়া যায়। জনসন বলেছেন, ইংলণ্ডের উৎকৃষ্ট ডিনারের সঙ্গে এদেশের ডিনারের কোন পার্থক্য নেই। তিনি বলেছেন ঃ 'Plate is displayed profusely ; the services are beautiful, and the glass costly'. শুধু তাই নয়, পানীয় হলেই তাতে বরফ দেওয়া হত, এবং মদিরা, ক্ল্যারেট, শ্যাম্পেন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে খেতে পাওয়া যেত।

রাত দশটার সময় কফি দেওয়া হত বটে, কিন্তু তাতেই সারাদিনের কর্তব্য শেষ হয়ে যেত না। হয় 'গবর্নমেণ্ট হাউসে', না হয় টাউন হলের বা কোন ক্লাবের 're-union'-এ অথবা কোন বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে পানভোজন ও নাচগানহল্লার নিমন্ত্রণ থাকত। প্রায় সারারাত ধরে সেখানে সাহেব ও মেমদের সুরাপান ও নাচগান চলত। শেষরাত্রে ক্লান্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে তাঁরা ঘরে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়তেন। কেল্লার কামানের শব্দে ভোরবেলা আবার তাঁদের ঘুম ভাঙত। সাহেবরা অভিযোগ করতেন যে এদেশের আবহাওয়া তাঁদের সাদা-চামড়ার শরীরে সহ্য হয় না। অ্যাডভোকেট জনসন বলেছেন, কারও শরীরেই এরকম যথেচ্ছাচার সহ্য হতে পারে না—'such a round of extravagance would ruin a Rothschild, and disorder the liver of a Hercules'—এরকম বে-হিসেবি বিলাসিতায় 'রথসচাইল্ড'এর মতন ধনকুবেরও ধ্বংস হয়ে যাবেন এবং হার্কিউলিসের মতন বীরপুরুষেরও লিভার পচে-গলে নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য।

এইভাবে সাহেব-নবাবরা এদেশে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। একেবারে আমেরী জীবন ছাড়া একে আর অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। এই জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে তাঁরা যখন স্বদেশে ইংলণ্ডে ফিরে যেতেন, তখন দেশের লোক যে চালচলন দেখে 'Nabob' বলত, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু নবাবী দেশে ফিরে গিয়ে তাঁরা খুব বেশী করতে পারেননি, যতটা এদেশে

বাস করার সময় করেছিলেন। কেউ কেউ প্রচুর ধনসম্পত্তি কিনে লর্ড বনে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশেরই ভাগ্যে তা ঘটে ওঠেনি। তার কারণ আগেই বলেছি, অনেকের এদেশেই মৃত্যু হয়েছিল এবং যাঁরা দেশে ফিরে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে সঞ্চিত অর্থের প্রায় সবটাই চরম উচ্ছৃঙ্খল ভোগবিলাসে এদেশেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিপুল ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে কেউ দেশে ফিরে গিয়েছিলেন, কেউ এদেশেই দেহত্যাগ করেছিলেন। পিটের 'ইণ্ডিয়া বিলের' বিতর্কের সময় স্কট (Scott) তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় বলেছিলেনঃ "গত ২২ বছরের মধ্যে ৫০৮ জন 'সিভিল সার্ভেন্ট' বাংলাদেশে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে মাত্র ৩৭ জন দেশে ফিরে এসেছিলেন; ১৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখন বাংলা-দেশে যে ৩২১ জন কর্মচারী আছেন, তাঁদের মধ্যে আগামী দশ বছরে ৩৭ জনও ফিরে আসবেন কিনা সন্দেহ। আগে যে ৩৭ জন ফিরে এসেছেন তাঁরা কেউই খুব বেশী ধনদৌলত নিয়ে ফিরতে পারেননি। অনেকেই ২০,০০০ পাউণ্ডেরও কম সঞ্চয় নিয়ে ফিরে এসেছেন, কেউ কেউ আবার এক শিলিংও নিয়ে ফিরতে পারেননি" (Parliamentary History, Vol. XXIV, Col. 1144-1146)।

স্কটের কথা খুব মিথ্যা নয়, কারণ অ্যাডভোকেট জনসনই বলেছেন, সাহেবরা যেভাবে এদেশে জীবনযাপন করতেন তাতে রথসচাইল্ডের মতন ধনকুবেরও উচ্ছন্নে যেতে বাধ্য। অধিকাংশ ইংরেজ কর্মচারী বাংলাদেশে এইভাবে উচ্ছন্নে গিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেরা তো গিয়েছিলেনই, এদেশের নতুন ধনিকদেরও সেই পথে টেনে নামিয়েছিলেন। সাহেব-নবাবরাই ছিলেন নতুন দেশী নবাবদের আদর্শ পুরুষ। উভয়েই স্বেচ্ছাচারী বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তার চেয়েও আশ্চর্য সাদৃশ্য হল, উভয়েই স্বদেশে মাটির প্রবল টানে সেকালের জমিদারশ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন। হোল্‌জম্যান লিখেছেনঃ

> Land hunger was perhaps the most general characteristic of the returned Nabob, a parliamentary seat and a landed estate were declared to be the 'twin apples of the Nabob's eye,' and the latter probably loomed larger (J. M. Holzman : *The Nabobs in England* N. Y. 1926, Ch. IV).

আমাদের বাংলাদেশেও তাই হয়েছিল। দেওয়ানি-বেনিয়ানি-দালালি ও ব্যবসাবাণিজ্যের বিপুল অর্থ নতুন বাঙালী ধনিকশ্রেণী বেশীর ভাগ ভূসম্পত্তিতে নিয়োগ করেন, এবং ক্রমে নতুন এক কর্মহীন ও লক্ষ্যহীন জমিদারশ্রেণীতে পরিণত হন। এই নতুন জমিদারশ্রেণীই ব্রিটিশ শাসকদের 'ডান হাত' বলে গণ্য হতেন। সুতরাং ভূসম্পত্তি ছাড়াও দেশের ব্যবস্থাপরিষদের ও কৌন্সিলের 'সভ্য' হওয়া তাঁদেরও কাম্য ছিল। নতুন বিদেশী-নবাব ও নতুন দেশী-নবাবদের মধ্যে এতদূর পর্যন্ত ঐতিহাসিক সাদৃশ্য বাস্তবিকই কল্পনা করা যায় না। কার্ল মার্ক্সের (Karl Marx) ভাষায় বলা যায়, ব্রিটিশ 'moneyocracy,' ব্রিটিশ 'oligarchy,' এবং ব্রিটিশ 'millocracy' ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলাদেশে মোগলযুগের 'নবাবে' পরিণত করেছিল। তাঁরা স্বদেশে ফিরে গিয়েও অনেকেই শেষ পর্যন্ত আধুনিক শিল্পপতি হতে পারেননি। ব্রিটিশ শিল্পবাণিজ্যের ও শিল্পবিপ্লবের প্রসারের পথ তাঁরাই প্রশস্ত করেছিলেন, কিন্তু নিজেরা হয়েছিলেন অলস, আরামপ্রিয় ভূস্বামী। এই একই ব্রিটিশ 'মানিওক্রেসি' ও ব্রিটিশ 'মিলোক্রেসির' চক্রান্তে বাংলাদেশের নব-ধনিকশ্রেণীও একদল অকর্মণ্য ভূস্বামীশ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন, এবং ইংলণ্ডের সাহেব-নবাবদের মতন বাংলাদেশের নবযুগের দেশী-নবাবরাও বহু ছড়া গাথা প্রবাদ ও কাহিনীর খোরাক যুগিয়েছিলেন। আজ তাঁদেরই বংশধরদের কাছে সেই সব কাহিনী অবাস্তব রূপকথা বলে মনে হবে।

নতুন বাঙালী বড়লোক

সুরসিক ভবানীচরণ কলকাতা শহরকে 'কমলালয়' বলেছেন, এবং সাগরের সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। সাগরে 'অপেয়' অগাধ জল, বর্ষাকালে সেই জল নির্গত হয়ে দেশ-বিদেশে যায়, নানা নদীর সমাগম হয় সাগরে। সাগর নানাবিধ রত্নের আকর। দেবাসুর সংগ্রামে সাগর মন্থিত হয়ে হলাহল ও অমৃত উঠেছিল। সাগরে হাঙ্গর কুমীর থেকে ভগবান নারায়ণ ও লক্ষ্মী পর্যন্ত বাস করেন। সাগরে সর্বদা তরঙ্গ ও কল্লোল শোনা যায়। এ-হেন সাগরের সঙ্গে কলকাতা শহরের সাদৃশ্য কোথায়?

সাদৃশ্য আছে। ভবানীচরণ লিখেছেন, "কলিকাতা মুদ্রারূপ অপেয় অগাধ জলে পরিপূরিতা হইয়াছে বৃহৎ কর্মকালে মুদ্রাজল নির্গত হইয়া নানাদিগদেশগামি হইতেছে নানাবিধ মুদ্রানদীর নিরন্তর গমনাগমন হইতেছে বিবিধ বিদ্যা ও বিদ্বানরূপ বহু রত্ন আছে।" ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যে সংগ্রাম হয়েছিল, তাকেই তিনি দেবাসুর সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তার ফলে দেশের মধ্যে বিষাদের হলাহল ও হর্ষের অমৃত উঠেছে, এবং কলকাতা শহর হয়েছে 'নিরুপমা ও সর্ব্বদেশখ্যাতা'। পরনিন্দাপরায়ণ লোকদের তিনি হাঙ্গর বলেছেন, এবং মূর্খদের বলেছেন কুমীর। এরকম অনেক নিন্দুক হাঙ্গর ও মূর্খ কুমীরের বাস হয়েছে

কলকাতা মহানগরে। লক্ষ্মী যে সর্বদাই শহরে বিরাজ করছেন তা বলে দিতে হয় না, কারণ এই শহরের পথের ধুলো ভাগ্যবান লোকের হাতে পড়ে মুঠো-মুঠো সোনা হয়ে যায়। সাগরের মতন শহরেও 'ধনমত্ততাদির' তরঙ্গ ও কল্লোল নিয়ত শোনা যায়।

এই কলকাতা শহরে, ভবানীচরণের ভাষায়, "ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন"। আমরা এখানে সকল পন্থার হদিস ও পরিচয় দিতে পারব না। কলকাতা যখন অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ধীরে ধীরে মহানগরের রূপ ধারণ করতে থাকল, এবং ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুনাফা-শিকারের প্রধান লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠল, তখন এদেশের লোকের কাছেও অর্থ রোজগারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হয়ে উঠল নতুন মহানগর। নাগরিক সমাজে বংশগত ও জাতিগত বৃত্তির বন্ধন ক্রমে শিথিল হয়ে গেল, কুলগত পেশার ও কর্মের সামাজিক কোন বাধ্যতা বিশেষ রইল না। কুলের চেয়ে ব্যক্তি হয়ে উঠল বড়। নানাবিধ বৃত্তি পেশা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজকর্মের স্বাধীন মুক্ত পরিবেশ যখন সৃষ্টি হল শহরে, তখন নানাশ্রেণীর ও নানাজাতির লোকের অফুরন্ত কর্মপ্রেরণা ও কুশলতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশও সম্ভব হল তার মধ্যে। ভবানীচরণ ঠিকই বলেছেন, শহরের ভিতর থেকে 'মুদ্রাজল' নির্গত হয়ে নানাদেশে যাচ্ছে, এবং নানাবিধ 'মুদ্রানদীর' নিরন্তর গমনাগমন হচ্ছে শহরের মধ্যে। এই সব 'মুদ্রানদীতে' অবগাহন করে যাঁরা প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেছিলেন, এবং তারই দৌলতে নতুন নাগরিক সমাজে উচ্চশ্রেণীতে আরোহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সেকালের বাঙালী দেওয়ান, বেনিয়ান, দাদনী-ব্যবসায়ী ও দালালরা প্রধান। কলকাতার শহুরে সমাজের বিকাশের আদিপর্বে, অর্থাৎ আঠার শতক থেকে উনিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত, এঁরাই আমাদের দেশের নতুন বড়লোক বা ধনিকশ্রেণীরূপে গড়ে উঠেছিলেন। এঁদের সম্বন্ধেই আমরা দু'চার কথা বলব।

ভারত-সরকারের জাতীয় মহাফেজখানায় পররাষ্ট্র-বিভাগের নথিপত্রের মধ্যে (১৮৩৯ সালের) কলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয়সহ একটি নামের তালিকা আছে (Foreign Department Miscellaneous Records, S. No. 131). এই দীর্ঘ তালিকা থেকে আমরা কয়েকজনের কথা এখানে উল্লেখ করছি ঃ

মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর। রাজকৃষ্ণ হলেন মহারাজা নবকৃষ্ণের পুত্র ও বংশধর। বাংলার মসনদে মিরজাফরের প্রতিষ্ঠার সময় নবকৃষ্ণ ক্লাইবের দেওয়ান ছিলেন। নবকৃষ্ণ সম্বন্ধে দলিলে বলা হয়েছে ঃ "He amassed an immense fortune on that occasion and subsequently upon the acquisition of the Dewanee, was placed by Lord Clive in most confidential situations." ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর ক্লাইব তাঁর উপর গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেন। ১৭৯৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। রাজকৃষ্ণ তখন নাবালক। রাজকৃষ্ণের ছয় পুত্রের মধ্যে শিবকৃষ্ণ দেব হলেন জ্যেষ্ঠ। এই বংশের কালীকৃষ্ণ দেব ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে রাজাবাহাদুর উপাধি পান।

বাবু গোপীমোহন দেব। ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র। নবকৃষ্ণের যখন কোন পুত্রলাভের আশা ছিল না, তখন তিনি গোপী-মোহনকে দত্তক গ্রহণ করেন এই শর্তে যে ভবিষ্যতে তাঁর পুত্র হলেও তিনি মহারাজার সম্পত্তির অর্ধাংশের ন্যায্য অধিকারী হবেন। এই উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর সঙ্গে রাজকৃষ্ণের সুপ্রিমকোর্টে মামলা হয় এবং তিনি মামলায় জয়ী হন। গোপীমোহনের একমাত্র পুত্র ও বংশধর হলেন রাধাকান্ত দেব। পিতা ও পুত্র উভয়েই সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

রাজা রামচন্দ্র রায়। ইনি রাজা সুখময় রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কয়েক বছর আগে রাজা সুখময় মারা যান, এবং তার আগে দেড়লক্ষ টাকা দান করে যান জগন্নাথযাত্রীদের রাস্তা তৈরির জন্য। এই

বংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত ধর কর্নেল ক্লাইব ও অন্যান্য গবর্নরদের বাণিয়ার (বেনিয়া বা ব্যাংকার) কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। সুখময় হলেন তাঁর দৌহিত্র। তিনি স্যার এলিজা ইম্পের দেওয়ানী করে মাতামহের ধনসম্পত্তি অনেক বেশী বৃদ্ধি করেন। মিণ্টোর আমলে তিনি 'রাজা' উপাধি পান। তাঁর বিশাল সম্পত্তির সমান অংশীদাররা হলেন রাজা রামচন্দ্র ও তাঁর ভাই বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বাবু বৈদ্যনাথ রায়, বাবু শিবচন্দ্র রায় ও বাবু নরসিংহ রায়।

মল্লিক পরিবার। এই পরিবার কলকাতায় বহুদিন থেকে প্রতিষ্ঠিত, এবং কয়েক পুরুষ আগেই তাঁরা বিপুল ধনসম্পত্তিলাভের সুযোগ পান। শুকদেব মল্লিক ও নয়নচন্দ্র মল্লিক দুই ভাই এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। মল্লিক বংশের দু'টি প্রধান শাখার একটি হল বর্তমানে শুকদেবের পৌত্রদের নিয়ে, আর-একটি নয়নচন্দ্রের প্রপৌত্রদের নিয়ে গঠিত। নয়নচন্দ্রের দুই পুত্র গৌরচরণ ও নিমাইচরণ। নিমাইচরণ 'নিমু মল্লিক' বলেই কলকাতার সমাজে সমধিক খ্যাত। নিমু মল্লিকের অগাধ সম্পত্তি তাঁর আটজন পুত্রের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। ভাগাভাগি নিয়ে সুপ্রিমকোর্টে অনেকদিন ধরে মামলা চলে এবং তাতে ছয় লক্ষেরও বেশী টাকা ব্যয় হয়ে যায়। দলিলে উল্লেখ আছে: "The litigation of this property in the Supreme Court is said to have cost upwards of six lac of rupees already and there are Appeals still pending in England."

বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ। ইনি কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের নাবালক পুত্র। কৃষ্ণচন্দ্র 'লালাবাবু' বলেই জনসমাজে সুপরিচিত। কয়েক বছর আগে বৃন্দাবনে লালাবাবুর মৃত্যু হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন লালাবাবুর পিতামহ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। গঙ্গাগোবিন্দ ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে কৌন্সিল ও 'বোর্ড অব্ রেভিনিউ'র দেওয়ান। দেওয়ানী করে তিনি অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হন।

আন্দুলের রায়বংশ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান রামচরণ রায়ের বংশধররা হলেন রাজনারায়ণ রায়, তারকনাথ রায় ও অন্যান্য রায়েরা। গবর্নর ভ্যান্সিটার্ট ও জেনারেল স্মিথের দেওয়ান ছিলেন রামচরণ। দেওয়ানী করে তিনি প্রচুর ধনৈশ্বর্যের মালিক হন।

খিদিরপুরের ঘোষাল পরিবার। এই পরিবারের কালীশঙ্কর ঘোষাল হলেন জয়নারায়ণ ঘোষালের পুত্র। কিছুদিন আগে বারাণসীতে জয়নারায়ণের মৃত্যু হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ভেরেলস্ট সাহেবের দেওয়ানী করে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেন। সেই সূত্রেই তিনি সন্দীপের জমিদারী লাভ করেন।

ঠাকুর পরিবার। দলিলে এই বিখ্যাত পরিবার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে ঃ "This is an extensive and very rich family, the principal branch of it is that derived from Durop Narayun Thakoor who made his fortune as Dewan to Mr. Wheeler and in the Pay Office of that time." এরকম ধনিক ও প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী পরিবার এদেশে বিরল। এই পরিবারের প্রধান শাখার আদিপুরুষ হলেন দর্পনারায়ণ ঠাকুর। দর্পনারায়ণ হুইলার সাহেবের দেওয়ানী করে সর্বপ্রথম প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর সাত পুত্র—রামমোহন ঠাকুর (মৃত), গোপীমোহন ঠাকুর (পিতার সম্পত্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করে ১৮১৬ সালে মারা যান), কৃষ্ণমোহন ঠাকুর (উন্মাদ), প্যারিমোহন ঠাকুর (বোবা ও মৃত), হরিমোহন ঠাকুর (জীবিত ও সর্বজনশ্রদ্ধেয়), ল্যাড্‌লিমোহন ঠাকুর (জীবিত) এবং মোহিনীমোহন ঠাকুর (বছর দুই আগে শিশুসন্তান রেখে মারা যান)। গোপীমোহন ছয় পুত্র রেখে মারা যান। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্যকুমার ঠাকুর নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন। বাকী পুত্রদের মধ্যে চন্দ্রকুমার ঠাকুর, কালীকুমার ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত আছেন।

ঠাকুর-পরিবারের আর-একটি শাখার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না দলিলপত্রের মধ্যে। এই শাখাটিকে 'নবীন শাখা' (Junior Branch) বলা হয়। জয়রাম ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নীলমণি ঠাকুরের বংশধরদের নিয়ে এই শাখা গঠিত। ঠাকুরবংশের এই শাখায় দ্বারকানাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন ১৭৯৪ সালে। কোম্পানির অধীনে দ্বারকানাথ বহুদিন কমার্সিয়াল এজেন্ট ছিলেন। পরে তিনি ২৪-পরগণার কলেক্টর ও নিমক-এজেন্টের সেরিস্তাদার থেকে নিমক-মহলের (Salt Agency) দেওয়ান হন। কিছুকাল তিনি 'কাস্টমস্-সল্ট-ওপিয়াম' বোর্ডেরও দেওয়ানী করেন। এদেশের স্বাধীন বাণিজ্যক্ষেত্রের প্রথম কৃতী পুরুষদের মধ্যে তিনি স্মরণীয়। দ্বারকানাথ কয়লা খনির ব্যবসায়ে এদেশের একজন উদ্‌যোগী পুরুষ এবং 'কার, ট্যাগোর অ্যাণ্ড কোম্পানির' প্রতিষ্ঠাতা। বিত্ত ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে তাঁর সমসাময়িককালে দ্বারকানাথের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কিনা সন্দেহ। দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং দেবেন্দ্রনাথের পুত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

শেঠ পরিবার। বহুদিন থেকে এই পরিবার কলকাতার অধিবাসী। শেঠদের বর্তমান বংশধর গৌরচরণ শেঠ, কৃষ্ণমোহন শেঠ, ব্রজকুমার শেঠ ও রাজকুমার শেঠের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তাঁরা "conducting a very extensive banking business in the Bura Bazar where they have established for several generations." এঁরা কিন্তু বাঙালী তন্তুবণিক 'শেঠ', কলকাতার 'সূতানুটি' বাজারের প্রতিষ্ঠাতা।

বসাক পরিবার। এই পরিবারের রাধাকৃষ্ণ বসাক জেনারেল ট্রেজারির খাজাঞ্চি। ইনি বড়বাজারের বিখ্যাত শরফ (Shroff) পরিবারের সন্তান, শেঠদের আত্মীয় এবং অত্যন্ত ধনী। এঁরাও তন্তুবণিক বাঙালী, কলকাতার আদিবাসিন্দা।

রামদুলাল দে। কলকাতার সিমলা অঞ্চলে দে-পরিবার বলতে এঁরই পরিবারকে বোঝায়। রামদুলাল ছিলেন কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনকুবের ও ব্যবসায়ী। সরকারী দলিলপত্রে তাঁর কথা এইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে: "Ram Doolal De, the richest man nearly in Calcutta, acquired his wealth wholly by trade and as Dewan to Messrs. Fairlie & Co. He had most extensive dealings with Americans at the time when they engrossed much of the carrying trade of the Port. Ram Doolal is now old, but still carries on business." ১৮৩৯ সালেও রামদুলাল জীবিত ছিলেন, এবং বৃদ্ধ হলেও তিনি তখনও তাঁর বিরাট ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান করতেন। রামদুলালের পুত্র আশুতোষ দেবেরও কলকাতার ধনিক ও বাবুসমাজে অখণ্ড প্রতিপত্তি ছিল।

রামহরি বিশ্বাস। ভুলুয়া ও চট্টগ্রামের নিমক-মহলের এজেণ্ট হ্যারিস সাহেবের দেওয়ান ছিলেন রামহরি বিশ্বাস। দেওয়ানী করে তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তি করেন এবং তাঁর দুই পুত্র প্রাণহরি বিশ্বাস ও জগমোহন বিশ্বাস সেই সম্পত্তি পরে বহুগুণ বৃদ্ধি করেন। কয়েক বছর আগে জগমোহনের মৃত্যু হয়। প্রাণকৃষ্ণ ও তাঁর পুত্র আনন্দময় বারাকপুরের কাছে বহু ভূসম্পত্তির মালিক।

জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার। শান্তিরাম সিংহ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাটনার চীফ্ মিঃ মিড্লটন ও স্যার টমাস রামবোল্ড সাহেবের দেওয়ান ছিলেন তিনি। তাঁর দুই পুত্র প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রাজকৃষ্ণ, শিবকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ট্রেজারির খাজাঞ্চি ছিলেন।

কুমোরটুলির মিত্র পরিবার। ভগবতীচরণ মিত্র, ভবানীচরণ মিত্র এবং তাঁদের আর চার ভাই অভয়চরণ মিত্রের পুত্র। এঁরা সকলে বিশ্বনাথ মিত্রের পুত্র কাশীনাথ মিত্রের সঙ্গে প্রপিতামহ গোবিন্দরাম

মিত্রের বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছেন। গোবিন্দরাম কলকাতার জমিদারী কাছারির দেওয়ান ছিলেন। কোম্পানির আমলে কলকাতার দেওয়ানী করে তো বটেই, অন্যান্য ব্যবসায়ের দ্বারাও তিনি প্রচুর বিত্তলাভ করেছিলেন।

গোকুল মিত্রের পরিবার। নবকৃষ্ণ মিত্র, হরলাল মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি গোকুলচন্দ্রের পৌত্র। রসদের ঠিকাদারী করে তিনি সমৃদ্ধি-লাভ করেন, এবং বাগবাজারে চিৎপুর রোডের কাছে বিশাল বসতবাড়ি নির্মাণ করেন।

গঙ্গানারায়ণ সরকার। মেসার্স পামার কোম্পানির খাজাঞ্চি ছিলেন সরকার মশাই। দলিলে বলা হয়েছে যে গঙ্গানারায়ণ হলেন "one of the richest natives in Calcutta," এবং তিনি কেবল ব্যবসায়ের দ্বারাই বিত্তলাভ করেন ("made his fortune wholly by trade")।

পালচৌধুরী পরিবার। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণচন্দ্র পাল-চৌধুরী সম্বন্ধে দলিলে বলা হয়েছে, "One of the three brothers originally in very low circumstances, acquired an immense fortune in the salt trade." তাঁর চার পুত্র পৈতৃক সম্পত্তি অনেক বৃদ্ধি করেছেন, কিন্তু তাঁর পিতৃব্যপুত্ররাও সেই সম্পত্তির অংশীদার। সম্প্রতি কৃষ্ণচন্দ্রের ছোট ভাইয়ের একমাত্র পুত্র বৈদ্যনাথও সুপ্রিমকোর্টের বিচারে পালচৌধুরীদের সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মালিক সাব্যস্ত হয়েছেন।

ব্যানার্জী পরিবার। রামসুন্দর ব্যানার্জী এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। রাধামাধব ব্যানার্জী ও গৌরীচরণ ব্যানার্জী তাঁর দুই পৌত্র। রাম-সুন্দর কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং রাজনারায়ণ মিশ্রের এক ভগিনীকে তিনি বিবাহ করেন। দলিলে বলা হয়েছেঃ "By this (বিবাহ) and as Dewan to the Patna Opium Agent the family acquired a considerable fortune. There are

several other rich families of the name of Bannoorjea, all Koolins."

পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ পরিবার। শিবনারায়ণ ঘোষ ও তাঁর দুই ভাই রামলোচন ঘোষের পুত্র এবং তাঁর বিশাল ধনসম্পত্তির মালিক। রামলোচন ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের সরকার এবং এই সরকারী করেই তিনি বিপুল বিত্তলাভ করেছিলেন।

মল্লিকবংশ। পূর্বোক্ত মল্লিক-পরিবারের সঙ্গে এই বংশের কোন সম্পর্ক নেই। পরলোকগত সনাতন মল্লিকের ভাই বৈষ্ণবদাস মল্লিক এবং তাঁর ভাইপো নীলমণি মল্লিক অত্যন্ত ধনী এবং সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণ মল্লিক প্রধানত ব্যবসায়ের দ্বারাই সমৃদ্ধিলাভ করেছিলেন।

মদন দত্তের পরিবার। কলকতার বিখ্যাত ধনিক ব্যবসায়ী ছিলেন মদন দত্ত, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। তাঁর দুই পুত্র রসিকলাল দত্ত ও হরলাল দত্ত। রসিকলাল বেশীর ভাগ সময় বারাণসীতেই থাকেন, এবং তাঁর পুত্র উদয়চাঁদ দত্ত কলকাতার ভদ্রাসনে বাস করেন। পাঁচ পুত্র রেখে হরলাল ১৮০০ সালে মারা যান।

এই কয়েকটি পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের ধনিক বাঙালী ভদ্রলোকদের ("rich Bengalee Gentlemen") নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। দলিল ছাড়াও অন্যান্য পুথিপুস্তক থেকে আমরা আরও দু'চারটি পরিবারের বিবরণ দিচ্ছি।

দেওয়ান কাশীনাথের পরিবার। কাশীনাথের পিতামহ ঘাসিরাম বাদশাহ সাজাহানের দেওয়ান ছিলেন। ঘাসিরাম জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং লাহোরে বাস করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্র মুলুকচাঁদ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রথমে বাংলাদেশে মুর্শিদাবাদে আসেন এবং সেখান থেকে পরে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে

আরম্ভ করেন। তাঁরই একমাত্র পুত্র হলেন বিখ্যাত দেওয়ান কাশীনাথ, বাইরে 'কাশীনাথবাবু' বলে সমধিক পরিচিত। কয়েক পুরুষ ধরে বাংলাদেশে বাস করে এঁরা প্রায় বাঙালীই হয়ে গেছেন। এঁরা সাধারণত 'দাসবর্মণ' পদবী ব্যবহার করেন।

দেওয়ান কাশীনাথ কোম্পানির আমলের গোড়ার দিকে কিছুদিন ক্লাইবের দেওয়ানী করেছেন। তাছাড়া তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ধনিক রাজা ও জমিদারদের স্থানীয় প্রতিনিধির কাজ করতেন কলকাতায়। শ্যামলদাস ও শ্যামাচরণ নামে দুই পুত্র রেখে তিনি অতিবৃদ্ধ বয়সে মারা যান। শ্যামল দাসের পৌত্র দামোদর দাসবর্মণ (রাজাবাবু) কলকাতার সমাজে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে, একজন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন।

শ্যামবাজারের বসু পরিবার। দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। কৃষ্ণরাম লবণের ব্যবসায়ে প্রচুর বিত্তলাভ করেন। এমন একসময় ছিল (আঠার শতকের শেষদিকে) যখন তিনি কলকাতা শহরে গবর্নমেণ্টের সমস্ত লবণের Public Sale-এর প্রধান এজেণ্ট ছিলেন। লবণ ছাড়া আরও অন্যান্য ব্যবসায়ে পরে তিনি প্রচুর অর্থলাভ করেন এবং শেষে পদস্থ কর্মচারী হবার বাসনায় কোম্পানির অধীনে হুগলীতে দেওয়ানীর কাজে নিযুক্ত হন।

কলুটোলার শীল পরিবার। মতিলাল শীল এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। উনিশ শতকের প্রথমভাগে কলকাতার ধনিক ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। বাইশ-তেইশ বছর বয়সে, ১৮১৫-১৬ সালে, তিনি সর্বপ্রথম ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং কেল্লার সৈন্যদের রসদ সরবরাহ করতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন তিনি কলকাতার কাস্টমস আফিসের দারোগার কাজ করেন। তারপরে তিনি বেনিয়ানি করতে আরম্ভ করেন এবং স্মিথসন ও অন্যান্য প্রায় সাত-আটজন ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর বেনিয়ান নিযুক্ত হন। বেনিয়ানি করে তিনি প্রচুর বিত্তলাভ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম 'মেসার্স মুর

হিকি অ্যাণ্ড কোং' নামে একটি ইণ্ডিগো (নীল) মার্ট স্থাপন করেন এবং এই ব্যবসায়ে বহু টাকা মুনাফা করেন। কলকাতার সমাজে মতিলালও ধনকুবের বলে পরিচিত ছিলেন এবং অনেক টাকাকড়ি তিনি ও তাঁর পুত্ররা স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদির জন্য দান করে খ্যাত হয়েছেন।

মতিলাল পরিবার। বহুবাজারের বিশ্বনাথ মতিলাল এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি দুর্গাচরণ পিতুড়ির ভাগ্নে। ১৭৭৯ সালে বিশ্বনাথ জয়নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং এক লবণের গোলায় মাসিক ৮ টাকা বেতনের মুহুরি হয়ে প্রথম কর্মক্ষেত্রে যোগ দেন। পরে স্বাধীনভাবে নানারকম ব্যবসাবাণিজ্য করে তিনি মৃত্যুকালে নগদ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ও বহু বিষয়সম্পত্তি রেখে যান। বাণিজ্যসূত্রে তিনি দু'টি বিখ্যাত ব্রিটিশ কুঠি 'ম্যাকিন্টস' কোম্পানি ও 'ক্রুটেণ্ডন' কোম্পানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। একসময় বড়বাজারের কাঁসারিপট্টির মালিক ছিলেন মতিলালরা।

ঠন্‌ঠনিয়ার ঘোষ পরিবার। 'ঠন্‌ঠনের ঘোষ' বলতে স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষের পরিবারকে বোঝায়। রামগোপালের পিতা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ব্যবসাবাণিজ্য করতেন, এবং কুচবিহারের মহারাজার কলকাতার এজেন্ট ছিলেন। ১৮১৫ সালে রামগোপালের জন্ম হয়। তিনি শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে ও হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর কাছে শিক্ষালাভ করেন। ডিরোজিওর শিষ্য ইয়ং বেঙ্গলদলের তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন এবং তাঁর শিক্ষাদীক্ষার জন্য তিনি কলকাতার শিক্ষিত বাঙালী সমাজে 'এজুরাজ'—অর্থাৎ এজুকেটেডদের রাজা—বলে পরিচিত ছিলেন।

ডেভিড হেয়ারের অনুরোধে জোসেফ নামে ইহুদী ব্যবসায়ী রামগোপালকে তাঁর প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন। অল্পদিনের মধ্যে এদেশের শিল্পদ্রব্যের রপ্তানির বাণিজ্যে রামগোপাল এমন দক্ষতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেন যে জোসেফ সাহেব তাঁর প্রতি বিশেষ

আকৃষ্ট হন এবং তাঁকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য পরিচালনার কাজে প্রধান পরামর্শদাতার সম্মান দিতে থাকেন। কিছুদিন পরে যখন জোসেফ ইংলণ্ডে চলে যান, তখন রামগোপালের উপরেই তাঁর প্রতিষ্ঠানের সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে যেতে দ্বিধা করেননি। কেলসল নামে এক সাহেব পরে জোসেফের অংশীদাররূপে যোগ দেন। তখনও অবশ্য রামগোপাল তাঁদের সহকারী ছিলেন। ব্যবসা থেকে জোসেফ যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন কেলসল তাঁকেই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করে নেন। প্রতিষ্ঠানের নাম হয় 'কেলসল ঘোষ অ্যাণ্ড কোং'। অল্পদিনের মধ্যে কেলসলের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়, এবং তিনি ১৮৪৬ সালে দুই লক্ষ টাকা নিয়ে তাঁর অংশ ছেড়ে দেন। এই সময় গবর্নমেণ্ট তাঁকে ছোট-আদালতের বিচারকের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কোম্পানির নিমক খাবেন না বলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে স্বাধীন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন।

আরাকান ও বর্মার চালের ব্যবসায়ে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং আকিয়াব, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে কোম্পানির শাখা স্থাপনে উদ্‌যোগী হন। স্বাধীন ব্যবসায়ী হিসেবে কলকাতার ইউরোপীয় বণিকসমাজেও তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং তার ফলে ২৬ নভেম্বর ১৮৫০, 'বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্সের' সভ্যপদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৪ সালে ফিল্ড নামে এক সাহেব তাঁর ব্যবসায়ে পার্টনাররূপে যোগ দেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তিনি ব্যবসাক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৪৭ সালের বাণিজ্যিক সংকটের সময়, যখন অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান 'ফেল' হয়ে যায়, তখন রাম-গোপালের প্রতিষ্ঠান একটুও টলেনি পর্যন্ত। দু'একজন চতুর ব্যবসায়ী তাঁকে তখন বেনামী ব্যবসা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর উত্তরে বলেছিলেন, "I would rather sell the last rag I have than deceive my creditors with such swindling tricks." কোন অপকৌশলের বা চালাকির প্রয়োজন

হয়নি তাঁর। নিজের বুদ্ধি, নিষ্ঠা ও সততার জোরেই বাংলাদেশের 'এজুরাজ' প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে তিনি কলকাতার মতন মহানগরে 'বণিকরাজ' হবারও যোগ্য।

রামবাগানের দত্ত পরিবার। লোকনাথ ঘোষ লিখেছেন: "The members of this family are noted for their learning as well as for the highly honorable offices they have held and still hold under Government." এই পরিবারের রসময় দত্ত তাঁর সময়ে একজন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেন 'মেসার্স ডেভিডসন অ্যাণ্ড কোম্পানির' সামান্য একজন খাতালেখার কেরানী হিসেবে। পরে তিনি 'Court of Requests'-এর কমিশনার নিযুক্ত হন এবং এই পদই পরে ছোট-আদালতের জজের পদে পরিণত হয়। কলকাতার হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের কর্মকর্তাদের মধ্যে রসময় দত্ত একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র দত্ত ও গিরিশচন্দ্র দত্ত সকলেই প্রায় কলকাতার বিত্তবান ও বিদ্বান-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন।

কুমোরটুলির সরকার পরিবার। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বনমালী সরকার। কুমোরটুলিতে তাঁর বিশাল প্রাসাদতুল্য বসতবাড়ির খ্যাতি তাঁর নিজের নামের চেয়েও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল বেশী। গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ির মতন তাঁর বাড়ির কথাও শহরের লোকের মুখে মুখে শোনা যেত। অতুল সম্পদের মালিক ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এই বিস্ময়কর প্রাসাদ নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল। পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেণ্টের দেওয়ান ছিলেন বনমালী সরকার এবং কিছুকালের জন্য তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলকাতার ডেপুটি-ট্রেডারের পদেও নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর বিপুল বিত্তের অধিকাংশই তিনি নানাস্থানে জমিদারী কিনে ব্যয় করেন এবং বাকী অংশ দানধ্যানে, উৎসব-পার্বণে ও ধর্মকর্মে উড়ে যায়।

বাগবাজারের মুখার্জী পরিবার। দুর্গাচরণ মুখার্জী এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। 'দেওয়ান মুখুজ্যে' বলে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। তার কারণ তিনি রাজসাহীর কলেক্টর রুস সাহেবের, মিণ্ট-মাস্টার হ্যারিস সাহেবের এবং আফিমের এজেণ্ট হ্যারিসন সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ানী করে মুখুয্যে মশায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, কিন্তু তার অনেকটা অংশই বাগবাজারের গঙ্গাতীরে 'দুর্গাচরণ মুখুজ্যের ঘাট' নির্মাণেই ব্যয় হয়ে যায়। বাকী অর্থ ভূ-সম্পত্তিতেই গর্ভস্থ হয়।

রামচন্দ্র মিত্রের পরিবার। রামচন্দ্র সেকালের কলকাতার একজন বিখ্যাত বেনিয়ান ছিলেন। কলকাতার বন্দরে যে-সব ইউরোপীয় ক্যাপ্টেন বাণিজ্যের জাহাজ নিয়ে আসতেন এবং নিজেরাও নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা করতেন, মিত্র মশায় ছিলেন তাঁদের অন্যতম বেনিয়ান। তিনি বেনিয়ানি করে প্রচুর অর্থ রোজগার করেন এবং অগাধ সম্পত্তির মালিক হন। তাঁর একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণ মিত্র, 'জয়া মিত্তির' বলে খ্যাত, নিশ্চিন্ত আলস্য-বিলাসে সেই সম্পত্তি ভোগ করেন। কায়স্থ-পরিবারে জন্মেও তিনি লেখাপড়ার বিশেষ চর্চা করেননি, কিন্তু বহু দেবদেবীর মন্দির নির্মাণ করে তিনি গোঁড়া হিন্দুয়ানির বহর দেখাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

নিমতলার মিত্র পরিবার। এই বিখ্যাত পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাধর মিত্র বাণিজ্যসূত্রে খ্যাতনামা ব্যবসায়ী রামদুলাল দে-র সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ও কিশোরীচাঁদ মিত্র গঙ্গাধরের পৌত্র। কলকাতার শিক্ষা ও সাহিত্য-সমাজে প্যারীচাঁদের অখণ্ড প্রতিপত্তি ছিল এবং প্রগতিশীল ইয়ং বেঙ্গল দলের তিনিও একজন প্রধান মুখপাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা ছাড়াও, স্বাধীন বাণিজ্যলব্ধ অর্থের জোরে তিনি কলকাতার ধনিক-সমাজে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তা রামগোপাল ঘোষের মতনই বিস্ময়কর। প্যারীচাঁদ যখন 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর' সহকারী লাইব্রেরীয়ান ছিলেন, তখনই (১৮৩৯-৪০) তিনি কালাচাঁদ শেঠ ও তারাচাঁদ চক্রবর্তীর

সহযোগে 'কালাচাঁদ শেঠ অ্যাণ্ড কোং' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্যে লিপ্ত হন। ১৮৪৪ সালের আগস্ট মাসে তারাচাঁদ চক্রবর্তী ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করলে, প্যারীচাঁদ ও কালাচাঁদ উভয়ে মিলে পুনরায় ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ সালে কালাচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ট্রাস্টিরা (trustees) ব্যবসায়ের হিসেবপত্র চুকিয়ে দেন। প্যারীচাঁদ তখন সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই ব্যবসা করতে আরম্ভ করেন এবং নিজের দুই পুত্রকে অংশীদার করে নিয়ে, প্রতিষ্ঠানের নাম দেন 'প্যারীচাঁদ মিত্র অ্যাণ্ড সন্স'। ব্যবসায়ের দ্বারা তিনি প্রচুর অর্থও উপার্জন করেন। সততা ও বলিষ্ঠতার জন্য রামগোপালের মতনই ইউরোপীয় ব্যবসায়ী মহলে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ও প্রভাব ছিল। এই সুনামের জন্যই তিনি 'গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল', 'পোর্ট ক্যানিং ল্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং', 'হাওড়া ডকিং কোং', 'বেঙ্গল টি কোং,' 'ডারাং টি কোং' প্রভৃতি বহু বিখ্যাত বিলিতি কোম্পানির 'ডিরেক্টর' নির্বাচিত হন।

ইংরেজ আমলে 'অধিক ধনা হওনের' নানারকম পন্থার কথা ভবানীচরণ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পন্থাগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করেননি। কলকাতার প্রাচীন কয়েকটি বনেদী পরিবারের আত্মপ্রতিষ্ঠার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা দিয়েছি, তা থেকে এই ধনিক হওয়ার অন্তত কয়েকটি ঐতিহাসিক পন্থার আভাস পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রধান হল এইগুলি : (১) দেওয়ানী, (২) বেনিয়ানি (৩) এবং নানাধরনের ব্যবসাবাণিজ্য।

দেওয়ান ছিলেন যে-কোন অফিসের, প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির প্রধান কর্মচারী। তাঁর উপরেই সমস্ত কাজকর্মের দায়িত্ব থাকত। তিনি ব্যবসায়ীর ব্যবসা দেখতেন, জমিদারদের জমিদারী তদারক করতেন, রাজকর্মচারীর কাজকর্মের দায়িত্ব পালন করতেন, অর্থাৎ এককথায় তিনিই

ছিলেন প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্রের হর্তাকর্তাবিধাতা। ইউল ও বার্নেল তাঁদের 'হবসন্-জবসন্' অভিধানে বলেছেন ঃ

> Dewaun is the chief native officer of certain government establishments···or the native manager of a Zemindary, or (in Bengal) a native servant in confidential charge of the dealings of a house of business with natives.

সেইজন্য দেখা যায়, ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে, আঠার শতকের মধ্যে, কলকাতা শহরের যে সমস্ত কৃতী ব্যক্তি তাঁদের পরিবারের আভিজাত্যের ভিত্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁরা অধিকাংশই তার রসদ (টাকা) সংগ্রহ করেছিলেন বড় বড় রাজপুরুষ ও ব্যবসায়ীদের দেওয়ানী করে। প্রাচীন ধনিক বনেদী পরিবারের আদি-প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অনেকেই তাই দেখা যায় দেওয়ান ছিলেন। একপুরুষের দেওয়ানী করে তাঁরা যে বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন, তাই পরবর্তী বংশধরদের পুরুষ-পরম্পরায় আভিজাত্যের খোরাক যুগিয়ে এসেছে।

দেওয়ান ছাড়া, কলকাতার অনেক 'ফ্যামিলি ফাউণ্ডার' বেনিয়ান ছিলেন। 'বেনিয়া' বা ব্যবসায়ী কথা থেকে 'বেনিয়ান' কথার উৎপত্তি হয়েছে। 'হবসন্-জবসন্' লিখেছেন ঃ

> In Calcutta it is (or perhaps rather was) specifically applied to the native brokers attached to houses of business, or to persons in the employment of a private gentleman doing analogous duties.

বেনিয়ানরাও সাধারণত ব্যবসায়ী বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতেন। বিশেষ করে তাঁরা ছিলেন বিদেশী ব্যবসায়ীদের প্রধান পরামর্শদাতা। আঠার শতকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও তাঁদের কর্মচারীরা এদেশে যখন ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেন, তখন দেশ ও দেশের লোক সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণাই ছিল না বলা চলে।

সেইজন্য তাঁদের ব্যবসায়ের মূলধন নিয়োগ থেকে আরম্ভ করে পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই পদে পদে যাঁদের উপর নির্ভর করতে হত, তাঁরাই হলেন 'বেনিয়ান'। এই বাঙালী বেনিয়ানরাই প্রথমযুগের ইংরেজ ব্যবসায়ীদের দোভাষী ছিলেন, বাণিজ্য-প্রতিনিধি ছিলেন, লাভ-লোকসানের গ্যারান্টর ছিলেন, হিসেবরক্ষক ছিলেন, এমন কি তাঁদের মহাজনও ছিলেন বলা চলে। এই কারণেই ইংরেজরাই আঠার শতকের বেনিয়ানকে বলেছেন, "interpreter, head book-keeper, head secretary, head broker, the supplier of cash and cash-keeper...serving to further such acts and proceedings as his master durst not avow...They knew all the ways, all the little frauds, all the defensive armour, all the artifices and the contrivances by which abject slavery secures itself against the violence of power."

বিলেত থেকে কোম্পানির নতুন 'রাইটাররা' বাংলাদেশে আসতেন, এবং তাঁদের লক্ষ্য থাকত খুব অল্পসময়ের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য করে কিছু অর্থ উপার্জন করা। 'রাইটাররা' যা বেতন ও ভাতা পেতেন, তাতে তাঁদের ব্যবসার মূলধন যোগানো তো দূরের কথা, কোন রকমে জীবনধারণ করাই দায় হয়ে উঠত। কিন্তু স্বভাবতঃই তাঁরা সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে বিদেশে এসে কায়ক্লেশে দিনযাপন করে কেবল কোম্পানির একান্ত অনুগত সেবক হয়ে থাকতে চাইতেন না। লুকিয়ে চুরিয়ে ব্যবসা করে দু'দশটা অতিরিক্ত পয়সা তারা রোজগার করার চেষ্টা করতেন। নাগরিক জীবনের বিলাসিতা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করার জন্যও তাঁরা উন্মুখ হয়ে উঠতেন। কোম্পানির বড়সাহেবরা অবশ্য তাঁদের সকল রকমের স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করে চলার জন্যই বিলেত থেকে ঘন ঘন নির্দেশ পাঠাতেন। 'রাইটাররা' পাল্কি চড়বেন না, বাবুগিরি ও আমোদ-প্রমোদে মন দেবেন না, সভা-ক্লাব-

ট্যাভার্ন-কফিহাউস বা হোটেলে অর্থ ও সময় কোনটারই অপব্যয় করবেন না, সন্ধ্যার পর সুবোধ বালকের মতন নিজেদের আবাসে (রাইটার্স বিল্ডিং) ফিরে আসবেন এবং নিজেদের লেখাপত্রের কাজে যথাসম্ভব মনোযোগ দেবেন। এই ধরনের সব আদেশ ও নির্দেশ কোম্পানির ডিরেক্টররা প্রায়ই বাংলাদেশের রাইটারদের জন্য পাঠাতেন। কিন্তু রাইটাররা তা কদাচিৎ মেনে চলতেন। তাঁরা সাধারণত এই সব আদেশ-নির্দেশ অমান্য করে যতদূর সম্ভব বিলাসিতাও করতেন, এবং তার জন্য নানা উপায়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনেরও প্রয়োজন হত।

কিন্তু বিলাসিতার জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে তাঁরা তা কোথা থেকে পেতেন? অথবা কোম্পানির কর্তৃপক্ষের অগোচরে ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাঁরা যে দু'পয়সা রোজগার করার চেষ্টা করতেন, তার মূলধন পেতেন কোথা থেকে? বাঙালী বেনিয়ানরাই প্রয়োজনের সময় তাঁদের টাকা ধার দিতেন এবং ব্যবসার জন্যও মূলধন যোগাতেন। বেনিয়ানদের সান্নিধ্যে আসতে তাঁদের খুব কষ্ট করতে হত না, কারণ দালালদের মারফৎ বেনিয়ানরা এই সব শিকারের খোঁজ পেতেন এবং টাকার প্রলোভন দেখিয়ে সহজেই তাঁদের নিজেদের প্রভাবাধীন করতে পারতেন। বেনিয়ানদের সুবিধা হত এই যে তাঁরা সাহেবদের নাম ও তার সঙ্গে জড়িত সমস্ত মহিমার ও ক্ষমতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি হয়ে বাইরের সমাজে চলাফেরা করতে পারতেন। তাতে তাঁদের নিজেদের ব্যবসাবাণিজ্যের ও নানাবিধ স্বার্থসিদ্ধির যথেষ্ট সুবিধা হত। ইংরেজরাও যে তাঁদের বেনিয়ানদের কাছে দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়তেন, তা থেকে আর সহজে চেষ্টা করেও সারাজীবনে মুক্তি পেতেন না। অবশেষে যাঁরা ভরাডুবি হয়ে যেতেন, তাঁদের মধ্যে অনেককে নিজেদের অর্জিত বিষয়সম্পত্তি ও টাকাকড়ি সমস্ত বেনিয়ানদেরই লিখেপড়ে দান করে যেতে হত। দৃষ্টান্ত হিসেবে উইলিয়ম ল্যাম্বার্টের কথা উল্লেখ করা যায়। ল্যাম্বার্ট বক্সী ছিলেন, ঢাকার কুঠির 'চীফ'

এবং দিনাজপুরের রেভিনিউ কৌন্সিলেরও 'চীফ' ছিলেন। তিনি তাঁর উইলে লিখে যান (১৭৭৪):

> I give and bequeath unto my faithful banian Bulluram Mazumder, so faithful that words are insufficient to describe it, and to whom I am indebted for every rupee I have hitherto gained.

ল্যাম্বার্ট স্বীকার করেছেন যে জীবনে তাঁর যা অর্থলাভ হয়েছে, তার জন্য তিনি তাঁর বেনিয়ান বলরাম মজুমদারের কাছে ঋণী। বলরাম যে কত বিশ্বাসী ছিলেন, তা সাহেব বলেছেন, তাঁর পক্ষে বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

বেনিয়ানরা যে সব সময় লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে সাহেবদের টাকা ধার দিতেন তা নয়। অনেক সময় তাঁদের যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে টাকা দিতে হত। ইংরেজ রাইটার বা অন্যান্য কর্মচারীরা অনেকেই এদেশে বিশেষ কোন বিষয়সম্পত্তি না রেখেই অসময়ে মারা গেছেন এবং তার ফলেও তাঁদের বেনিয়ানদের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। যাঁরা বিষয়সম্পত্তি রেখে গেছেন, তাঁদের ওয়ারিশদের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা করতেও কম ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়নি।

আঠার শতকের কলকাতার বড় বড় বেনিয়ানদের মধ্যে গোকুল ঘোষাল, বারাণসী ঘোষ, অক্রূর দত্ত, হিদারাম ব্যানার্জী, নিমাইচরণ মল্লিক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আগেই বলেছি, খিদিরপুরের ঘোষাল-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গোকুল ঘোষাল গবর্নর ভেরেল্‌স্টের বেনিয়ান ছিলেন। তাঁর পদমর্যাদা ও ব্যবসায়ীবুদ্ধির জন্য তিনি বাণিজ্যক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন তা অতুলনীয় বলা চলে। প্রতিপত্তিশালী ইংরেজদের সঙ্গে নানাবিধ ব্যবসায়ে জড়িত থেকে তিনি অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। যাঁরা বিদেশী বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের বেনিয়ান নিযুক্ত হতেন, তাঁদের উপরেই সেই প্রতিষ্ঠানের 'নেটিব' কর্মচারী নিয়োগের ভার থাকত, এবং স্বভাবতঃই সেই

কর্মচারীদের নৈতিক দায়িত্বও তাঁদের বহন করতে হত। উইলিয়ম হিকির 'স্মৃতিকথায়' (*Memoirs of William Hickey*, Vol. IV Ch. 15.) বেনিয়ান নিমাইচরণ মল্লিকের কাহিনী থেকে তা বোঝা যায়। 'ককারেল, ট্রেল অ্যাণ্ড কোম্পানির' বেনিয়ান ছিলেন নিমাই-চরণ। কোম্পানির একজন পর্তুগীজ কর্মচারী রাউল্যাণ্ড স্কট একবার বহু টাকা তছরূপের দায়ে অভিযুক্ত হন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে সামান্য কিছু টাকা আদায় হয় এবং বাকি টাকা অনাদায়ের জন্য তাঁকে জেল দেওয়া হয়। মামলা শেষ হয়ে গেলে কোম্পানির কর্তারা বেনিয়ান নিমাই মল্লিককে টাকার জন্য দায়ী করেন, কারণ তাঁরা বলেন যে বেনিয়ান হিসেবে সমস্ত কর্মচারীর দায়িত্ব তাঁর। একথা নিমাই মল্লিক অস্বীকার করেন এবং বলেন যে স্কটের মতন কোন কর্মচারীর কাজের জন্য তিনি দায়ী নন, কেবল 'নেটিব' কর্মচারীদের জন্যই তিনি দায়ী। হিকি লিখেছেন ঃ

> After having thus secured Scott, they next called upon Nemychurn Mullick, who was their Banian, to make good the amount they had thus been robbed off by Rowland Scott, alleging that he, in the capacity of Banian, was responsible for all embezzlements committed by any of their servants. This Nemychurn Mullick denied, insisting that his personal responsibility extended only to native servants employed in the Counting House, and not to men situated as Mr. Scott was, who long before he, Nemychurn Mullick, became their Banian, had been in their unlimited confidence…

তা সত্বেও ককারেল কোম্পানি বেনিয়ান নিমাইচরণের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে মামলা করে তাঁকে যথেষ্ট হয়রাণ করেছিলেন। এইভাবে অনেক সময় বড় বড় বেনিয়ানদের নানাকারণে বিদেশী প্রভুদের উপদ্রবও

সহ্য করতে হত। অবশ্য তাঁরা যে সাধুপুরুষ ছিলেন তা নয়, সাধু হলে বেনিয়ানিও করতে পারতেন না। সেইজন্য মধ্যে মধ্যে তাঁদের প্রতি বিদেশী মালিকরা অবিচার করারও সুযোগ পেয়েছেন।

বেনিয়ানি ও স্লুপের কণ্ট্র্যাকটারি করে অক্রুর দত্তও যথেষ্ট বিত্ত ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। সেকালের বেনিয়ানদের মধ্যে বারাণসী ঘোষেরও স্থান ছিল অনেক উঁচুতে। হিদারাম ব্যানার্জী ও রঘুনাথ ব্যানার্জী দুই ভাইই বেনিয়ানি করে প্রচুর অর্থ রোজগার করেছিলেন। হিদারাম ছিলেন কলকাতার শেরিফের বেনিয়ান, এবং রঘুনাথ ছিলেন উইলিয়ম হিকির বেনিয়ান। এই দুই বেনিয়ান-ভাই সম্বন্ধে হিকি তাঁর 'স্মৃতিকথায়' যে মন্তব্য করে গেছেন, তা আদৌ প্রীতিকর নয়। হিকি লিখেছেন ঃ

> I considered both Hydeeram Bonnagee and his brother Rogonaut Bonnagee to be as errant knaves and scoundrels as ever existed, who had united their crafty abilities to cheat and plunder me in every way they could devise···

শঠ ও প্রবঞ্চক বলে হিকি সাহেব হিদারাম ও রঘুনাথের প্রতি যে কটূক্তি করেছেন তা সত্য হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যেকালে যে রকম আচার, তাই তাঁরা পালন করেছেন। শঠতা ও প্রবঞ্চনা অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের বিদেশী প্রভুদের কাছ থেকেই শিক্ষা করেছিলেন। সুতরাং এক্ষেত্রে যদি শিষ্য হয়ে তাঁরা শেষ পর্যন্ত গুরুকে হার মানিয়ে থাকেন, তা হলে তার জন্য তাঁদের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপানো যায় না।

বেনিয়ানদের এইসব কার্যকলাপ থেকে বোঝা যায় যে, অন্তত আঠার শতকের কলকাতা শহরে তাঁদের বৃত্তি বা পেশা অন্য কোন ভাগ্যবানদের তুলনায় কম অর্থকরী ছিল না। ইংরেজদের সাহচর্যে এবং স্বাধীনভাবে নিজেদের মূলধন খাটিয়ে, আধুনিক যুগের আদিপর্বে, এদেশের বাণিজ্য-

ক্ষেত্রে যাঁরা অসাধারণ কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়ে বিপুল বিত্ত ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন, বাঙালী বেনিয়ানরা তাঁদের মধ্যে প্রধান।

দেওয়ান ও বেনিয়ানরা ছাড়াও কেউ কেউ ইংরেজদের অধীনে অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ কাজকর্মের ভার পেয়ে, তার কর্তৃত্বের সুযোগ নিয়ে, নানা উপায়ে অনেক টাকা উপার্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে কুমোরটুলির মিত্র-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম মিত্রের নাম সবদিক দিয়েই স্মরণীয়। সতের শতকের শেষদিকে গোবিন্দরাম বারাকপুর-চানকের কাছাকাছি কোন গ্রাম থেকে কলকাতায় গোবিন্দপুর অঞ্চলে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। শোনা যায় কিছুদিন তিনি জব চার্নকের অধীনেও কাজ করেছিলেন। তার পর আনুমাণিক ১৭২৪ সালে তিনি কলকাতার ইংরেজ জমিদারের অধীনে 'ডেপুটি জমিদার' বা নায়েব নিযুক্ত হন। সাধারণ জমিদারদের নায়েবদের ক্ষমতার কথা যাঁরা জানেন, তাঁরা সহজেই অনুমান করতে পারবেন, ইংরেজ প্রভুত্বের আদিকালে গোবিন্দরামের কতখানি প্রতাপ-প্রতিপত্তি ছিল। ইংরেজরা এদেশে রাজা হবার আগে কলকাতা অঞ্চলের জমিদার হয়ে এসেছিলেন। দেশী জমিদারের প্রতাপই তখন মারাত্মক ছিল, বিদেশী ইংরেজ জমিদারের তো কথাই নেই। দেশী জমিদার ও প্রজা সকলেই তাঁদের ভয়ে কাঁপতেন। এহেন ইংরেজ জমিদারের নায়েব ছিলেন গোবিন্দরাম। সাহেবরা জমিদারীর কিছু জানতেন না বা বুঝতেন না। পদে পদে তাঁদের সকল ব্যাপারে নির্ভর করতে হত নায়েবের উপর। দেশের লোকের কাছে গোবিন্দরামই ছিলেন ইংরেজদের প্রধান প্রতিনিধি এবং আসল জমিদার। গোবিন্দরামের 'ছড়ি' তখন জনপ্রবাদে পরিণত হয়েছিল; বাবুগিরির নিদর্শন হিসেবে যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী রাজদণ্ডের সাক্ষী হিসেবে। জমিদারীর আয়ব্যয় সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় তদারক করার ভার ছিল তাঁর উপর। কলকাতার হাট-বাজারের বাৎসরিক বন্দোবস্ত দেওয়া (farming), রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণ ও সংস্কার করা, বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্যের শুল্ক, ট্যাক্স ইত্যাদি আদায় করা,

নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা—এইসব ছিল তাঁর প্রধান কাজ। এর মধ্যে হাট-বাজারের আয়ই ছিল জমিদারীর প্রধান আয়। নিয়ম ছিল, কলকাতার কাছারীতে সর্বসাধারণের সামনে নিলামে হাট-বাজারের বন্দোবস্ত দেওয়া। কিন্তু গোবিন্দরাম তা করতেন না বলে হলওয়েল অভিযোগ করেছেন। হলওয়েল যখন কলকাতার জমিদার ছিলেন তখন তিনি প্রেসিডেণ্ট ও গবর্নর রোজার ড্রেকের কাছে একাধিক দীর্ঘ পত্রে (১৭৫২ সালে) গোবিন্দরামের বিরুদ্ধে জাল-জুয়াচুরির বিস্তৃত তালিকা দাখিল করেন। তাতে দেখা যায়, গোবিন্দরাম কাছারীতে 'পাবলিক অক্‌শনে' হাট-বাজার বিলি না করে, সাধারণত বাড়িতে বসেই তা করতেন। তাঁর বাড়ির সামনে হাট-বাজারের দাম তিনি লটকে রেখে দিতেন এবং নিজেই দাম ঠিক করতেন। আয়ের দিক থেকে যেগুলি ভাল ভাল হাট ও বাজার, সেগুলি তিনি নিজে খুশী মতন দাম দিয়ে, অধিকাংশই বেনামীতে কিনে নিতেন, এবং তার উপর মোটা মুনাফা রেখে অন্য আর-একজনকে সেগুলি আবার বন্দোবস্ত দিতেন। হলওয়েল তাঁর অভিযোগপত্রে লিখেছেন (ফোর্ট উইলিয়ম ১৩ আগস্ট ১৭৫২):

> This man (গোবিন্দরাম) has an absolute trust and confidence reposed in him in the disposal of the Company's farms, the best of which he farms at an under rate to himself in a fictitious name, and at the same time farms them out again at an immediate gain; a fraud than which I know not a greater.

গত আটাশ বছর ধরে গোবিন্দরাম এই কৌশলে হাট-বাজারের আয় আত্মসাৎ করে আসছেন, এবং হলওয়েল দুঃখ করে বলেছেন যে, খাতাপত্রে বা হিসেবে তাঁর এই অপকৌশল ধরতে পারা মুশকিল। কারণ সবই তাঁর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বে ছিল, এবং সবই তিনি কাগজে-কলমে প্রায় ঠিক করে রেখেছেন। তবু অন্যান্য প্রমাণ থেকে, এবং খানিকটা

কাগজপত্র থেকেও তাঁর প্রতারণার এত পরিষ্কার হদিশ পাওয়া যায় যে, কোন লিখিত দলিলের দরকারই করে না। এইভাবে বেনামীতে হাট-বাজার বন্দোবস্ত নিয়ে গোবিন্দরাম কোম্পানির জমিদারীর আয়ের কয়েক লক্ষ টাকা অপহরণ করেন।

হলওয়েল আরও অভিযোগ করেছেন যে, এই 'ব্ল্যাক ডেপুটির' 'ব্ল্যাক ইনকামের' আরও অনেক পন্থা ছিল, যা ফিরিস্তি দিয়ে শেষ করা যায় না। কলকাতার কাছারীর জন্য তিনি পাইক-বরকন্দাজ, মুহুরী-সরকার প্রভৃতির বেতন আদায় করতেন কোম্পানির কাছ থেকে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই হয় তাঁর নিজের বাড়িতে, না হয় তাঁর কোন জমিদারী-মহলে বা হাট-বাজারে কাজ করত। অর্থাৎ তিনি তাঁর নিজের কর্মচারীদের বেতন, কাছারীর নামে খাতায় লিখে, কোম্পানির কাছ থেকে আদায় করতেন। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, বনজঙ্গল পরিষ্কার, ঘাট ও পুল তৈরী বাবদ তিনি কোম্পানির কাছ থেকে মধ্যে মধ্যে যে টাকা নিয়েছেন, তা বেশীর ভাগই কাজে খরচ না করে আত্মসাৎ করেছেন। এমন কি, কলকাতার কাছারী-সংস্কারের টাকাও মেরে দিতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। এ দেশের লোকেরা, বিশেষ করে জমিদারীর অধীন প্রজারা, তাদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ স্বভাবতঃই তাঁর কাছে পেশ করত, কিন্তু রীতিমত সেলামি না নিয়ে কোন অভিযোগেই তিনি কর্ণপাত করতেন না। এই সব উপায়েও যে তিনি গত আটাশ বছরে কোম্পানির কত হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন তার হিসেব নেই কোথাও।

জমিদার হলওয়েল হয়ত তাঁর 'ব্ল্যাক ডেপুটি' গোবিন্দরামের উপর কোন কারণে অত্যধিক বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন, তাই প্রতারণার অভিযোগও তাঁর দীর্ঘ হয়েছে। হয়ত তাঁর অভিযোগ সব সত্য নয়, কিছুটা অতিরঞ্জিত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত। তা ছাড়া, গোবিন্দরামের যে শঠতা ও প্রতারণার কথা তিনি বলেছেন, তা থেকে তিনি বা তাঁর স্বজাতিরা কেউই তখন মুক্ত ছিলেন না। ব্যক্তিগত উদ্যম ও উদ্‌যোগের

সঙ্গে খানিকটা শঠতা ও প্রতারণাই ছিল তখনকার দিনে কর্মক্ষেত্রে, বিশেষ করে অর্থলাভের ক্ষেত্রে, সবচেয়ে সুগম ও সুবিস্তৃত পথ। গোবিন্দরাম, তাঁর সমসাময়িক আরও দু'চার জন ভাগ্যবানদের মতন, সেই পথেই অগ্রসর হয়ে নবযুগের বাংলার প্রথম পারিবারিক ধনাভিজাত্যের ভিত্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর গৌরবের মধ্যে হয়ত খানিকটা গ্লানি ছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত কৃতিত্বের মধ্যে বিশেষ কোন খাদ ছিল না। বিদেশী ইংরেজদের যখন রাজা-বাদশাহরাও ভয় করে চলতেন, তখন সাধারণ একজন স্বল্পশিক্ষিত বাঙালী হয়ে গোবিন্দরাম তাঁদের যেভাবে আয়ত্তে রেখে কার্যোদ্ধার করেছিলেন, তাতে তাঁর ক্ষমতার তারিফ না করে পারা যায় না। নতুন যুগের বাংলার সমাজে 'ধনিক হওনের' অনেক পন্থার মধ্যে, গোবিন্দরামের পন্থা একটি, এবং অন্যতম।

দালাল ও দাদন-ব্যবসায়ী। কোম্পানির ব্যবসায়ের দালালি করে আঠার শতকে বাংলাদেশের একদল লোক প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে শেঠ বসাকরা প্রধান। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে যে-সব পণ্যদ্রব্য কিনতেন ইংলণ্ড ও ইউরোপের বাণিজ্যের জন্য, তাকে তখন 'ইনভেস্টমেণ্ট' বলা হত। এই 'ইনভেস্টমেণ্ট' যাঁরা দাদন নিয়ে কোম্পানিকে সরবরাহ করতেন, তাঁদের বলা হত 'দাদনি-মার্চেণ্ট' বা 'দাদনি-বণিক।' কোম্পানির আমলের সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রভাবশালী দালাল ও দাদনি-বণিক হলেন শেঠরা এবং তাঁদেরই জ্ঞাতি বসাকরা। শেঠরা ও বসাকরা, ইংরেজরা কলকাতায় পদার্পণ করার আগেই, সূতানুটি কলকাতা অঞ্চলে এসে (ভাগীরথীর পশ্চিমে হুগলি-সপ্তগ্রাম থেকে) বাণিজ্যের জন্য বসতি স্থাপন করেছিলেন। ১৭০৭, ১১ সেপ্টেম্বর তারিখের 'ডাইরী ও কনসাণ্টেশন বুকের' একটি প্রস্তাব থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রস্তাবে

শেঠদের বাগানের খাজনা বিঘা প্রতি আট আনা করে কমিয়ে দেওয়া হয়। তাতে বাগানের খাজনা মোট প্রায় ৫৫৲ টাকা কমে যায়। এই হিসেব থেকে বোঝা যায়, শেঠদের অন্তত ১১০ বিঘার একটি বাগান ছিল কলকাতায়। শেঠরা কলকাতার প্রাচীন বাসিন্দা বলে, এবং তাঁদের এলাকাধীন রাস্তাঘাট নিয়মিত সংস্কার করে তাঁরা ঠিক রাখবেন বলে, কোম্পানির কর্তারা তাঁদের খাজনা হ্রাস করেছিলেন। তাঁরা প্রস্তাবে বলেছিলেন যে, জনার্দন শেঠ, গোপাল শেঠ, যদু শেঠ, বানারসী শেঠ ও জয়কৃষ্ণ শেঠ "will keep in repair the highway between the Forts landmark to the northward on the back side of the town," এবং শেঠদের বাগান সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, "they being possessed of this ground which they made into gardens *before we had possession of the town,* and being the company's merchants and inhabitants of the place."

মনে হয় শেঠরা সতের শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে ভাগীরথীর পূর্বতীরে কলকাতার গ্রামাঞ্চলে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। পরে সতের শতকের শেষদিকে কলকাতায় ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি স্থায়ীভাবে স্থাপিত হলে, তাঁরা কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন, এবং তাঁদের প্রধান 'broker' বা দালাল নিযুক্ত হন। দলিলপত্রে সবচেয়ে প্রাচীন নাম পাওয়া যায়, কোম্পানির দালাল হিসেবে, জনার্দন শেঠের। আঠার শতকের প্রথম দশকেই তিনি কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান এজেন্টরূপে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন দেখা যায়। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন কোম্পানির অন্যতম মুখপাত্র। কোম্পানির ইনভেস্টমেণ্টের জন্য এদেশী বণিকদের দাদন দেবার ভার থাকত দালালের উপর। তাঁকে সন্তুষ্ট না করলে কারও পক্ষে দাদনি-বণিক হওয়া সম্ভব হত না। শেঠরা প্রধানত তাঁদের নিজেদের জাত-ব্যবসায়ীদেরই দাদন দিয়ে বাণিজ্য করার সুযোগ দিতেন।

সেইটাই স্বাভাবিক, কারণ ইংরেজরা আসলে ছিলেন বস্ত্র-ব্যবসায়ী, এবং শেঠ-বসাকরাও জাতিতে ছিলেন তন্তুবণিক। সুতরাং কোম্পানির কাপড়ের ইনভেস্টমেন্টের জন্য দাদন তাঁরা নিজেদের জাতের ব্যবসায়ীদের মধ্যেই বণ্টন করে দেবার চেষ্টা করতেন। ১৭৪৮, ২৩ মে তারিখের 'কনসাল্টেশন' থেকে তার চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায়। শেঠরা নিজেদের জাত-ব্যবসায়ীদের ছাড়া আর কাউকে দাদন দিতে সম্মত হন না ঃ

> The Sets being all present at the Board inform us that last year they dissented to the employing of Fillick Chund, Gosserain, Occore, and Otteram, they being of a different caste and consequently they could not do business with them, upon which account they refused Dadney, and having the same objection to make this year, they propose taking their shares of the Dadney if we should think proper to consent thereto. (*Consultations* May 23, 1748)

জনৈক 'ফিল্লিকচাঁদ' (ফটিকচাঁদ ?), 'গোসারেন' (গোঁসাই ?) 'ওক্কোর' (অক্রুর ?) ও 'ওত্তিরাম' (আত্মারাম ?) ব্যবসায়ের জন্য কোম্পানির কাছ থেকে দাদন পেয়েছিলেন বলে শেঠরা আপত্তি জানিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা ভিন্নজাতের লোক। এইভাবে ভিন্নজাতের লোককে দাদন দিলে শেঠরা আর কোম্পানির ইনভেস্টমেন্টের জন্য দাদন নেবেন না বলে তাঁদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের বিশেষ সামাজিক গুরুত্ব আছে। এ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য তখনও সনাতন জাতিগত সীমানার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ ছিল। কিন্তু সেই গণ্ডীও যে ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছিল, এবং অন্যান্য জাতির ও পেশার লোকেরাও যে নিজেদের প্রথাসিদ্ধ জাতিকর্ম ছেড়ে স্বাধীন বাণিজ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছিলেন, তাও ফটিকচাঁদ, গোঁসাই, অক্রুর ও আত্মারামের দৃষ্টান্ত

থেকে বোঝা যায়। তা হলেও, দালালি ও দাদনি-ব্যবসা আঠার শতকের দিকে যে মোটামুটি কলকাতার শেঠ-বসাকদেরই আয়ত্তে ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখনকার বিখ্যাত ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বৈষ্ণবদাস শেঠ, শ্যামসুন্দর শেঠ, গোপীনাথ শেঠ, রামকৃষ্ণ শেঠ, শোভারাম বসাক, লক্ষ্মীকান্ত শেঠ ও অমিচাঁদ। যে বিপুল বিত্ত তাঁরা দালালি ও বাণিজ্যের দ্বারা সঞ্চয় করেছিলেন তার কোন তুলনা হয় না।

কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলের আদি বাসিন্দা এই বাঙালী তন্তুবণিক শেঠ-বসাকরা। বাণিজ্যে ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তাঁদের সমকক্ষ তখন কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। ধনদৌলতের আভিজাত্য ও আড়ম্বরের দিক থেকেও তখন এই বাঙালী শেঠ-বসাকরা সত্যই বড়বাজারের সবচেয়ে বড় বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু আজ তাঁদের আভিজাত্য ও প্রতিষ্ঠা দুইই ম্লান হয়ে গেছে। জাত-ব্যবসা থেকেও তাঁরা বহুদূরে কোণঠাসা হয়ে গেছেন। বড়বাজারে একদা তাঁরাই যে বড় ছিলেন আজ তা অবাঙালী ব্যবসায়ীদের প্রতিপত্তি দেখে কিছুই বোঝা যায় না। আভিজাত্যের কঙ্কালের মতন দণ্ডায়মান তাঁদের জীর্ণ অট্টালিকাগুলির দিকে চেয়ে মনে হয়, এসব যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের ইতিহাস তাঁদের বর্তমান বংশধররাই জানেন না, দেশের অন্যান্য লোক তো দূরের কথা। বড়বাজারে কি কৌশলের জোরে অন্যেরা বাণিজ্যের সিংহাসন দখল করে বসলেন, এবং বাঙালী তন্তুবণিকরা সিংহাসনচ্যুত হলেন, সে-কাহিনীর উৎস আজ অনুসন্ধান করে দেখা উচিত।

এ ছাড়া স্বাধীন বাণিজ্যক্ষেত্রে মতিলাল শীল, রামদুলাল দে, মদন দত্ত, বারাণসী ঘোষ প্রভৃতির মতন কৃতী ব্যবসায়ীও তখন অনেকে ছিলেন। আর্থিক ও সামাজিক প্রাধান্য দুইই তাঁদের যথেষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে সেই প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য তাঁদের উত্তরপুরুষেরা পাননি। কেন পাননি তাও অনুসন্ধানের বিষয়।

বাস্তবিকই ভবানীচরণের ভাষায় বলা যায়, "ধার্ম্মিক ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দুষ্টনিবারক সৎপ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর" এদেশের লোকদের "অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা" করেছিলেন। সেইসব পন্থার সুযোগ গ্রহণ করতে আমাদের দেশের লোক দ্বিধা করেন নি। কেউ বেতনভুক কর্মচারী হয়ে, কেউ সর্দারী-পোদ্দারী করে, কেউ দাদনি-বণিক ও দালাল হয়ে, কেউ দেওয়ানী বেনিয়ানি করে, কেউ বা ঠিকাদারী ও স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য করে, কলকাতার নতুন শহুরে সমাজে নতুন বড়লোক হয়েছিলেন। সেকালের নবাবী আমলের বড়লোকরা নবযুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ে একেবারে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলেন বলা চলে। কোম্পানির আমলে যাঁরা নতুন বড়লোক হলেন তাঁদের একপুরুষের বড়লোক বললে ভুল হয় না। অর্থাৎ একপুরুষের মধ্যে, প্রধানত একজন ব্যক্তির উদ্যম ও চেষ্টার ফলে, নবযুগের বাংলার সমাজে নতুন ধনিকশ্রেণীর পত্তন হয়েছিল। সেই উদ্যম ও প্রচেষ্টার ধারা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় পুরুষ পর্যন্ত কোন রকমে প্রবাহিত হয়ে, হয় একেবারে থিতিয়ে গেছে, না হয় অন্য কোন খাতে চালিত হয়েছে। স্বাধীন বাণিজ্যক্ষেত্রের ব্যক্তিগত উদ্যম অতি অল্পকালের মধ্যে চাকুরিজীবীর নিশ্চিন্ত আলস্য-বিলাসে পরিণত হয়েছে। নবযুগের বাংলার সমাজের এই শোচনীয় অর্থনৈতিক পরিণতির জন্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ধারারও সুস্থ স্বাভাবিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।

কিন্তু যে বিপুল বিত্ত নবযুগের বাংলাদেশের নতুন বড়লোকরা নানা উপায়ে সঞ্চয় করেছিলেন, তা কোন্‌দিকে এবং কি কারণে অবশেষে উজাড় হয়ে গেল? সক্রিয় বাণিজ্যিক উদ্যমের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সঞ্চিত মূলধন বিপুল বেগে নিষ্ক্রিয় জমিদারী, মহাজনী ও বিচিত্র অমিতব্যয়ী ভোগবিলাসের পথে ধাবমান হল। স্বাভাবিক বাণিজ্যিক উদ্যমের পথে বিদেশী শাসক-বণিকরা অবশ্যই অনেক বাধাবিপত্তির সৃষ্টি করেছিলেন নিজেদের স্বার্থে। কিন্তু বাঙালীদের বাণিজ্যের উদ্যম কেবল

সেই কারণে উবে গেছে, একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মতিলাল বা রামদুলালের বংশধরদের ইংরেজরা নিশ্চয়ই ফরমান জারী করে বলেন নি যে, তাঁদের জমিদার বা বাড়িওয়ালা হতে হবে, টাকাপয়সা সিন্দুকে পুরে সুদখোর মহাজন হতে হবে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে, যাত্রা-থিয়েটারে বা বাইজীনাচে ও ভোজসভায় দু'হাতে অর্থের অপব্যয় করতে হবে, ধর্মকর্মে পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে, অথবা পোষা কুকুর-বাঁদরের বিয়েতে লাখ-লাখ টাকা ফুঁকে দিতে হবে, এবং স্বাধীন বাণিজ্যের উদ্যম ছেড়ে পরাধীন চাকুরির দাসত্ব গ্রহণ করতে হবে। ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থেও নতুন বড়লোকদের এই পরিণতি চাইতে পারেন না। আঠার শতকের শেষদিকেই ওয়ারেন হেস্টিংস এদেশে 'public credit'-এর অভাব প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ

> The fact is, that our public credit, by which I mean the credit of our Interest Notes, and Treasury Orders, never extended beyond the English servants of the Company, and the European inhabitants of Calcutta : and to these may be added a few, and a very few, of the old Hindoo families at the Presidency. All the other inhabitants of the Provinces are utterly ignorant of the advantage and security of our funds, and have other ways of employing their money, such as purchases of landed property, loans at an usurious and accumulating monthly interest, and mortgages, to which, though less profitable in the end, and generally insecure, they are so much attached by long usage, and the illusion of a large growing profit, that it would not be easy to wean them from these habits...(*Mr. Hastings's Review of the State of Bengal*, London, 1786,)

কোম্পানির 'ইণ্টারেস্ট নোট', 'ট্রেজারি অর্ডার' এদেশের ধনী লোকেরা কিনতে চান না বলে হেস্টিংস অভিযোগ করেছেন। কারণ

ভূসম্পত্তিতে ও সুদের কারবারে সঞ্চিত মূলধন খাটালে তাঁরা অনেক বেশী লাভবান হবেন বলে তাঁদের ধারণা। সেইজন্য কোম্পানির 'পাবলিক ক্রেডিটের' ক্ষেত্র কলকাতার ইউরোপীয়ানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলাদেশের ধনিক হিন্দু পরিবারের মধ্যে দু'চারজন মাত্র এই ক্রেডিটের সুযোগ নিতেন, বাকী সকলে বন্ধকী ও মহাজনী কারবারে এবং জমিদারী কেনাকাটায় তাঁদের মূলধন খাটাতেন। আঠার শতকের শেষদিকের মধ্যেই বাঙালী ধনিকদের এই মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ আধুনিক ধনিক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা যাঁরা, তাঁরাই তাঁদের জীবনের সঞ্চিত মূলধন এই চিরাচরিত উপায়ে বিনিয়োগ করতে আরম্ভ করেছিলেন। যে-সব অর্থনৈতিক গুণের জন্য শিল্পবাণিজ্যের যুগে সঞ্চিত টাকা সক্রিয় মূলধন হয়ে ওঠে, তার কোন গুণেই আমাদের দেশের ধনবানদের টাকা গুণী হয়ে ওঠেনি। সুদ খাটালে টাকায় টাকা বাড়ে, এবং জমিজমায় নিয়োগ করলে তার নিরাপত্তা বাড়ে, টাকা সম্বন্ধে এই সনাতন মনোভাব বাঙালী ধনিকরা নতুন যুগের সামাজিক পরিবেশে বিশেষ বদলাতে চাননি। গোড়া থেকে এই মনোভাব বদলানোর সুযোগ, ঐতিহাসিক কারণে তাঁরাই বেশী পেয়েছিলেন, এবং গোড়া থেকেই তাঁরা তা জাতীয় চরিত্রের রক্ষণশীলতার জন্য গ্রহণ করতে চাননি। অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক স্বার্থের অন্তরায়ও ছিল যথেষ্ট, কিন্তু তাঁরা সচেষ্ট ও সক্রিয় হলে তা কিছুটা হয়ত অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পারতেন।

আধুনিক যুগের সূচনা থেকে বাঙালীরা উদ্‌যোগী হয়ে সামাজিক অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, ইতিহাসে তার পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে। কিন্তু সেই অগ্রগতির ধারা যে নিরবচ্ছিন্ন ছিল না, এবং পদে-পদে বিপরীত পশ্চাদ্‌গতির ধারার আঘাতে তা যে ব্যাহত হয়েছে, উনিশ শতকের জাগরণের ইতিহাসের বিস্ময়কর উত্থান ও পতন তার প্রমাণ। সেইজন্য প্রশ্ন জাগে মনে যে, বাঙালীর রক্ষণশীলতাই আসল জাতীয় চরিত্র কি না, এবং তার প্রগতিশীলতা নকল-নবীশের সাময়িক উচ্ছ্বাস-

প্রবণতার নামান্তর কি না! একথাও মনে হয়, যে-জাতি গত দু'শ বছর ধরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সেকালের জমিদার ও সুদ্‌খোর মহাজনের মনোবৃত্তি বর্জন করতে পারেনি, সামাজিক ক্ষেত্রে তার সত্যিকার প্রগতিশীল মনোভাব থাকতে পারে কি না! দু'একজন কৃতী পুরুষের দৃষ্টান্ত দিয়ে জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁদের 'ব্যতিক্রম' বলাই হয়ত সঙ্গত। আজকের বাংলার আর্থিক সঙ্কট ও চাকুরিগত নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয় মনোভাবের জন্য এই রক্ষণশীলতা কতখানি দায়ী, তাও চিন্তার বিষয়। তা যদি হয়, তা তলে আধুনিক যুগের বাঙালী বড়লোকদের ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতির ধারা থেকেই চিন্তার খোরাক পাওয়া যাবে বেশী।

পাল্কি ও ল্যাণ্ডোর যুগ

সেকালের কলকাতা শহরে অটোমোবাইল ছিল না। কলকাতা শহরে কেন, পৃথিবীর কোন শহরেই তখন 'অটো' বা মোটরগাড়ী ছিল না। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েই দেশ-বিদেশে মানুষ ঘুরে বেড়িয়েছে। ঘোড়ার পিঠে মানুষ তার সংস্কৃতিকেও দেশ-বিদেশে বহন করে নিয়ে গেছে। বাংলাদেশের গোটা নবজাগরণের যুগটাকে 'অশ্বযুগ' বলা যায়। জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন যাঁরা, তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন শহরবাসী। কলকাতা শহরই তাঁদের জীবনের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। কিন্তু কলকাতায় তখন 'অটো'র চলাচল আরম্ভ হয়নি, এবং অটোযুগের যান্ত্রিক পরিবেশও সৃষ্টি হয়নি শহরে। নানা-রকমের অশ্বচালিত যানবাহনে তখন লোকজন কলকাতার পথে চলে বেড়াত। বিচিত্র সব নাম ছিল সেই সব যানবাহনের। ল্যাণ্ডো, ফিটন, বগি, পাল্কিগাড়ী ও আরও কত কি। তখনকার সমাজ ও মানুষের জীবনের নতুন ছন্দের সঙ্গে এই সব ঘোড়ার গাড়ীর চলার ছন্দের একটা মিলও ছিল বোঝা যায়। জীবনে ও সমাজে যেমন নবযুগে নতুন বেগ সঞ্চারিত হয়েছিল, তেমনি শহরের মানুষের চলাফেরায় সেই বেগ ফুটিয়ে তুলেছিল ঘোড়ার গাড়ী। আগেকার যুগে ঘোড়া রাজারাজড়াদের রথ টানত, যোদ্ধাদের পিঠে বহন করে নিয়ে যেত,

কিন্তু সাধারণ মানুষের চলাফেরার জন্য গাড়ী টানত না। আমাদের দেশে গরু-মহিষের গাড়ীতেই মানুষ চলে বেড়াত। যে-দেশে ঘোড়াই ছিল মানুষের প্রধান পালিত পশু, সে-দেশে সাধারণ অশ্বযান বলে কিছু ছিল না। অশ্বযানের স্বচ্ছন্দ গতির জন্য শুধু শহর-নগর নয়, বড় বড় প্রশস্ত পাকা রাজপথও প্রয়োজন ছিল। মধ্যযুগের শহরের সংকীর্ণ অলিগলিতে বেগবান যানবাহনের চলাচল সম্ভব ছিল না। আধুনিক শহরের বড় বড় পাকা পথঘাটের উপরেই তার দ্রুত বাধাবন্ধনহীন চলাচল আরম্ভ হয়েছিল। সুতরাং নবজাগরণের যুগকে নতুন শহরে অশ্বযানের যুগ বললে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বাংলার নবজাগরণের যুগকে তাই আমরা স্বচ্ছন্দে 'ঘোড়ার গাড়ীর যুগ' বলতে পারি। তাও শুধু ল্যাণ্ডো-বাগি-ফিটনের যুগ বললেই সম্পূর্ণ বলা হয় না, তাকে ছ্যাকরা-গাড়ীর যুগও বলতে হয়, অর্থাৎ হুতোমী ভাষায় বলতে হয় 'ছক্কোড়-যুগ'। তার সঙ্গে দীর্ঘদিন অবশ্য পুরাতনের উদ্বৃত্ত হিসেবে 'পাল্কিও' ছিল। রামমোহন, দ্বারকানাথ, ডিরোজিও, কৃষ্ণমোহন, তারাচাঁদ, রাধানাথ, রসিককৃষ্ণ, দক্ষিণারঞ্জন, রামগোপাল, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ সকলেই ছ্যাকরা-গাড়ী ও পাল্কিতে চড়ে চলাফেরা করেছিলেন, কিন্তু সেই চলার শক্তিতেই তাঁরা আমাদের দেশের অচল সমাজকে সচল করে তুলেছিলেন। ছ্যাকরা ও পাল্কিতে চড়ে তাঁরা যে সামাজিক সচলতা এনেছিলেন, তা আজকের দিনে স্ট্রিমলাইণ্ড অটোমোবাইলে চড়েও আমরা আনতে পারছি কি না সন্দেহ। বাংলার অচল স্থিতিশীল সমাজে তাঁরা যে একটা প্রচণ্ড বেগের আবেগ এনেছিলেন, যে 'মোবিলিটি' এনেছিলেন, আজও অনেকটা তারই 'মোমেণ্টামে' আমরা এগিয়ে চলেছি। ক্যাডিলাক-পন্টিয়াক-প্লিমাউথ-ব্যুইক-কমাণ্ডারের যুগের নধরকান্তি বাঙালীবাবুরা সেই সচলতার কথা বোধ হয় কল্পনাই করতে পারবেন না। জুড়ি বগি চৌঘুড়ি ছঘুড়ি আটঘুড়ি ফিটন ব্রাউনবেরি ক্রুহাম ল্যাণ্ডো ল্যাণ্ডোলেট ঠিকাগাড়ী কেরাঞ্চি পাল্কিগাড়ী প্রভৃতি নানারকমের ঘোড়ার গাড়ী চড়ে,

রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-যুগের সমাজকর্মীরা নবজাগরণের বাণী প্রচার করেছেন এবং সামাজিক দুর্নীতি, জড়তা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠচিত্তে আপসহীন অভিযান করেছেন। যেমন সব তেজী ও দুর্ধর্ষ ঘোড়া ছিল তখন, তেমনি ছিল সেই ঘোড়ার যুগের মানুষগুলোও তেজীয়ান। ঘোড়া ও মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যে কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য ছিল, পেট্রল-মোবিল-চালিত অটোমোবাইলের যান্ত্রিকতার সঙ্গে একালের মানুষের চরিত্রের যেমন সাদৃশ্য আছে তেমনি। তখন ছিল যেমন সব ওয়েলার ঘোড়া, আর্বী ও টাট্টু ঘোড়া, তেমনি সব ওয়েলারের মতন মানুষ, আর্বী ও টাট্টু ঘোড়ার মতন মানুষ। ঘাড় ও মাথা উঁচু করে, দৃপ্তভঙ্গীতে, আপন মেজাজে জোরকদমে তাঁরা জীবনের পথে চলতেন। রামমোহন বিদ্যাসাগরের মতন মানুষের চলার ভঙ্গী দেখে একথা কে না স্বীকার করবেন।

ওয়েলেসলি, কর্নওয়ালিসের যুগে কলকাতা শহরের রাস্তায় কেবল ঘোড়া নয়, হাতিও মন্থরগতিতে আমেরী চালে চলে বেড়াত। তা দেখে বড় বড় ল্যাণ্ডোর তেজী ঘোড়ারা হয়ত বিচলিত হত না, কিন্তু জীর্ণ ছক্কোড়ের অস্থিচর্মসার দুর্বল ঘোটকেরা ভয়ানক ঘাবড়ে যেত। ১৬ এপ্রিল ১৮০৫ 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে এরকম এক ঘাবড়ানো ঘোটকযানের দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়। খবরটি এই ঃ

> A few evenings ago, Mr. and Mrs. Hutteman, with 3 of their children, were returning home in a carriage. They met an elephant on Esplanade Row, opposite the Tank ; upon which the horses got wild and ran the carriage in the drain close to Brady's house and upset it.

শ্রী ও শ্রীমতী হুটেম্যানের ভাল ল্যাণ্ডো বা তেজী ঘোড়া ছিল বলে মনে হয় না। তা যদি থাকত, তা হলে রাজপথে হস্তি দর্শনে সে-ঘোড়া এতটা ঘাবড়ে যেত না, এবং ব্র্যাডি সাহেবের বাড়ির সামনের পচা ড্রেনের

মধ্যে গাড়ীখানাকে উল্টে ফেলে দিয়ে সাহেব-মেমদের বিপদ ঘটাত না। মধ্যযুগের বাদশাহী আমলের প্রতিনিধি হাতি; সেকালের ফিউডাল লর্ডের মতন তার চালচলন। উনিশ শতকের গোড়ায় কলকাতা শহরে তার চলাফেরা দেখে বোঝা যায় যে, নতুন শহরে বাদশাহী আমলের আমেজ তখনও পুরোপুরি কাটেনি। বাদশাহী চালে, নবাবী মেজাজ নিয়ে, নবযুগের বিদেশী দূত ইংরেজরাই তখন নতুন শহুরে সমাজে চলাফেরা করতেন। আর নতুন বাঙালী বড়লোকেরা নবাবের বংশধরদের মতন তখন জীবনযাপন করতে ভালবাসতেন। সুতরাং তখনও যে অস্তগামী নবাবী আমলের শেষ স্মৃতিচিহ্নের মতন দু'চারটে হাতি মহানগরের রাজপথে চলেফিরে বেড়াবে, তাতে অবাক হবার কি আছে?

১৮১৪-১৫ সাল থেকে রামমোহন রায় কলকাতা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এই সময় থেকে বাংলাদেশে সামাজিক নবজাগরণের আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে আরম্ভ হয় বলা চলে। ১৮১০ সালেও দেখা যায়, ২৩ মার্চ তারিখের *The Morning Post* পত্রিকায়, কলকাতার Williams and Hohler Co. নিলামের যে-সব পদার্থের তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে একটি হল, 'A beautiful female elephant measuring 7ft. 6 inch. high'. কলকাতা শহরে রামমোহনের স্থায়ী বসবাসের আগেও সাড়ে-সাত ফুট উঁচু সুন্দরী হস্তিনী শহরে নিলামে কিনতে পাওয়া যেত। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা' স্থাপন ও 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশের পরেও নতুন শহরে পুরাতন হাতি যে একেবারে দেখতে পাওয়া যেত না, তা নয়। কিন্তু হাতির উপদ্রব তার পর থেকে কলকাতা শহরে নিশ্চিত কমে আসছিল।

আঠার শতকের চতুর্থ পর্ব থেকেই কলকাতা শহরে গাড়ী-ঘোড়ার, অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়ীর চলাচল বাড়তে থাকে। তার আগে সেকালের

'স্কন্ধযান' পাল্কিই ছিল প্রধান বাহন, কারণ 'অশ্বযান' চলার মতন উপযুক্ত পথঘাট তখনও তৈরি হয়নি কলকাতায়। বিদেশ থেকে ইংরেজ কোচমেকাররা এই সময় কলকাতা শহরে আসতে আরম্ভ করেন। বড় বড় কোচ তৈরির কারখানা, আড়গড়া ও ঘোড়ার আস্তাবল কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রধানত মধ্য-কলকাতায়, ওল্ডকোর্ট হাউস থেকে ধর্মতলা-চাঁদনির মধ্যে। অধিকাংশ সাহেব কোচমেকারের কারখানা ছিল এই অঞ্চলে। পরবর্তীকালে দু'চারজন বাঙালীও এইখানে কোচ-নির্মাণের কারখানা ও ঘোড়ার আড়গড়া-আস্তাবল স্থাপন করেন। ১৭৯০ সালের 'ইস্ট ইণ্ডিয়া রেজিস্টারে' বাংলাদেশে ইয়োরোপীয় বাসিন্দাদের নামের তালিকায় এই ক'জন কোচমেকারের নাম পাওয়া যায়:

এডওয়ার্ড ক্যাণ্ডলার	: ১৭৭৬
জন বুণ্টন	: ১৭৭৫
রবার্ট গ্রেঞ্জ	: ১৭৭৯
উইলিয়ম গ্রেঞ্জ	: ১৭৮৩
রিচার্ড হেগ	: ১৭৮০
জেম্‌স ম্যাকনিকল	: ১৭৮৩
জেম্‌স স্টুয়ার্ট	: ১৭৮৩
রবার্ট স্টুয়ার্ট	: ১৭৮৪
টমাস্‌ ওয়াটসন্‌	: ১৭৮৫
জেমস ওয়াটসন	: ১৭৮১

কোচমেকাররা নানারকমের ঘোড়ার গাড়ী বিদেশ থেকে আমদানি করতেন, এদেশের কারিগরদের দিয়ে তৈরি করাতেন, সেগুলি বিক্রী করতেন এবং ভাড়া খাটাতেন। কেবল গাড়ী নয়, তার সঙ্গে ভাল ঘোড়াও রাখতেন আস্তাবলে, ঘোড়া ও গাড়ী দুয়েরই সাজসরঞ্জাম থাকত। ২ মার্চ ১৮১০ 'মর্নিং পোস্ট' পত্রিকায় জনৈক কোচমেকার ক্রিস্টোফার ডেক্সটার বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁর এই ব্যবসায়ের কথা এইভাবে শহরবাসীদের জানান:

CHRISTOPHER DEXTER

Returns his most grateful thanks to his friends and the public at large for the support he has experienced from them for the three years past—in order to enlarge his business—taken a house in Bowbazar that has got upwards of eight bighas of ground—erecting stables for 600 horses to stand at livery. Horses and carriages bought and sold on commission. Also he lets out horses and carriages, by day, month or year. Horse shoes and nails on Sale :

C. D. likewise attends on sick horses at his house or abroad.

৬০০ ঘোড়া রাখবার মতন আড়গড়া তৈরি করেছেন ডেক্সটার সাহেব, আটবিঘে জমি নিয়ে বৌবাজারে। ডেক্সটারের দক্ষতা প্রশংসনীয়। গাড়ী ও ঘোড়া কেনাবেচার তিনি দালালি করেন, ভাড়া খাটান এবং তাঁর নিজের আড়গড়ায় বা মালিকের বাড়ি গিয়ে অসুস্থ ঘোড়ার চিকিৎসাও করেন। অর্থাৎ ডেক্সটার সাহেব কেবল ঘোড়ার দালাল নন, ঘোড়ার ডাক্তারও।

ডেক্সটারের মতন আরও অনেক সাহেব কোচমেকার, ঘোড়ার দালাল ও ডাক্তার ছিলেন কলকাতায়। সবচেয়ে নামজাদা কোচমেকার ছিলেন কলকাতার স্টুয়ার্টরা। কলকাতার প্রাচীনতম ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'স্টুয়ার্ট কোম্পানি' অন্যতম। ওল্ডকোর্ট হাউসের কোণে তাঁরা কারখানা স্থাপন করেছিলেন আঠার শতকের শেষ পর্বে, এবং সেকালের ল্যাণ্ডো-পাল্কির যুগ থেকে একালের অটোমোবাইলের যুগ পর্যন্ত প্রায় অব্যাহত ধারায় তাঁরা ব্যবসা করে এসেছেন। ১৭৮৫ সালের মধ্যেই তাঁরা যে পূর্ণোদ্যমে গাড়ীঘোড়ার ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তখনকার পত্রিকার

বিজ্ঞাপন থেকে। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় ১৭৮৫ সালে স্টুয়ার্ট কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেখা যায় এই মর্মে ঃ

January 3,1785—To be sold a Handsome Europe... haise, new lined and painted with elegent medallions on the doors. Price 2000 S. R. (Sicca Rupees). Also a very handsome new Buggy and harness with a remarkable quick Trotting Horse. Price 1000 S. R.

January 31,1785—To be sold a Phaeton in perfect repain with a set of Horses perfectly broke,

১৭৮৫ সালের 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকাতেও স্টুয়ার্টদের একাধিক বিজ্ঞাপন দেখা যায়। যেমন ঃ

Thursday, March 17, 1785

For Sale at Messrs. Stewarts, Coachmakers

A new elegant Europe Gigg ; to save trouble ; price Sicca Rupees···By applying as above gentlemen in the country building Chariots, Phoetons or Buggies may be supplied with the best Europe articles for that purpose on reasonable terms.

Thursday, December 8, 1785

To be Raffled for at Messrs. Stewarts Coachmakers.

A new elegant and fashionable Europe Coach, with a set of Plated Harness for Four Horses, with Postilion Saddles, and long spare Traces. The Coach and Harness cost 600 Rupees. Thirty Subscribers at Rs. 20 each.

বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয়, তখন প্রতি বৃহস্পতিবারে স্টুয়ার্ট কোম্পানিতে 'সেল' ও 'অকশন' হত, এবং তাতে ভাল ভাল সব বিদেশী গাড়ী ঘোড়া

বিক্রি হত। বগি-ফিটন, গিগ-চ্যারিয়ট প্রভৃতির দামের বহর দেখে বোঝা যায়, শহরের অভিজাত ধনিক বাসিন্দারা ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর লোক ক্রেতা ছিলেন না। অন্যদের জন্য পাল্কি ছিল। সাধারণ মধ্যবিত্তের বাহনই ছিল তখন পাল্কি। অবশ্য তাঁরা পাল্কির মালিক ছিলেন না, কারণ পাল্কির অথবা যে-কোন ঘোড়ার গাড়ীর মালিকানার মধ্যে ব্যয়ের দিক থেকে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। পাল্কির মতন পাল্কি হলে, এবং সেরকম পরিচ্ছদধারী বেয়ারাদল থাকলে, আভিজাত্যের দিক থেকে অনেক সময় তা ল্যাণ্ডো-বগিকেও হার মানিয়ে দিত।

দু'এক রকমের নয়, হরেকরকমের ঘোড়াগাড়ী ছিল কলকাতায়। তার বিচিত্র সব নাম ছিল। সব নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, তবু যতটুকু জানা গেছে তা প্রায় কৃষ্ণের শতনামের মতন। ঘোড়ার গাড়ীর এরকম নামবৈচিত্র্যের কথা আজকের দিনে কল্পনাই করা যায় না। যেমন ঃ

জুড়ি	ল্যাণ্ডো	ব্রাউনবেরি	পাল্কিগাড়ী
চৌঘুড়ি	ল্যাণ্ডোলেট	ব্রুহ্যাম	জাউনগাড়ী
দুঘুড়ি	ফিটন	দশফক্কাব	ডাকগাড়ী
আটঘুড়ি	বগি	সারাব্যাঙ্ক	এক্কাগাড়ী

ইত্যাদি।

সবরকমের গাড়ীর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। স্টুয়ার্ট কোম্পানির নতুন কোন সম্ভ্রান্ত কোচমেকারের সেকালের কোন *Descriptive Catalogue* থাকলে হয়ত পাওয়া যেত। স্টুয়ার্টদের ক্যাটালগ নিশ্চয় ছিল, এবং এখন যদি তার কোন পুরনো 'কপি' পাওয়া যেত তা হলে সামাজিক ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু স্কলাররা সেটাকে একখানা প্রাথমিক আকরগ্রন্থ হিসেবে তথ্যসংগ্রহের কাজে ব্যবহার করতে পারতেন। দুঃখের বিষয় এখনও তা পাওয়া যায়নি, অন্তত আমি পাইনি। পুরনো কোচমেকার, ফার্নিচার প্রভৃতি ব্যবসায়ীর ক্যাটালগও যে সেকালের সামাজিক ইতিহাসের উপর কতখানি আলোক সম্পাত

করতে পারে, তা আমাদের দেশের অ্যাকাডেমিক ঐতিহাসিকরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই ইতিহাসের এই জাতীয় উপকরণ আজও আমাদের দেশের স্কলারদের কাছে উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে।

বিনা ক্যাটালগেই আমরা বর্ণনা দিচ্ছি। জুড়ি চৌঘুড়ি ছ'ঘুড়ি আটঘুড়ি দশফুকার ইত্যাদি নাম দেখেই বোঝা যায়, ঘোড়ার সংখ্যানুপাতে গাড়ীর নামকরণ করা হয়েছে। একজোড়া ঘোড়া জুতলে জুড়ি, দু'জোড়ায় চৌঘুড়ি, তিনজোড়ায় ছ'ঘুড়ি, চারজোড়ায় আটঘুড়ি, পাঁচ-জোড়ায় দশফুকার (?) ইত্যাদি। দশের বেলায় 'ফুকার' কেন, 'ঘুড়ি' নয় কেন, বোঝা যায় না। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

> 'তখন ঠিকাগাড়ী ও পাল্কির সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। তখন বড়লোকেদের অর্থাৎ ধনীদের ধনবত্তা দেখাইবার অন্যতম প্রধান উপায় ছিল—সকালে সুদৃশ্য জুড়ি অথবা চৌঘুড়ি বা ছয়ঘুড়ি আটঘুড়ি পর্যান্ত সুদৃশ্য ল্যাণ্ডোতে যুতিয়া শহরের দেশীয় পল্লীর মধ্যে নিজে হাঁকাইয়া বেড়ানো ও দুর্গন্ধ বায়ুসেবন এবং একটা সুদৃশ্য 'পাল্কিগাড়ী' বা 'আফিস ব্রাউনবেরি' গাড়ীতে চড়িয়া স্কুলে বা অফিসে যাতায়াত। বৈকালে ধনী বাবুরা আবার সুদৃশ্য ওয়েলার জুড়ি যুতিয়া ল্যাণ্ডো, ফিটন বা অন্য কোন প্রকার মাথা-খোলা গাড়ীতে গঙ্গার ধারের রাস্তায় 'হাওয়া খাইয়া', পরে বিলাতী ব্যাণ্ড বুঝুন বা নাই বুঝুন, ইডেন গার্ডেনের ধারে গাড়ী রাখিয়া তাহাতেই বাজনা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতেন.... বাবুদের দৌলতে সেকালে কত রকমেরই গাড়ী যে বিলাত হইতে আমদানী হইত, তাহার ইয়ত্তা ছিল না—ল্যাণ্ডো, ফিটন, বগি, ল্যাণ্ডোলেট, দশফুকার, ব্রাউনবেরি, ব্যারুষ ইত্যাদি। উচ্চদরের ডাক্তার বা জজ প্রভৃতি, যাঁহারা আপনাদের গাম্ভীর্য-গৌরব বাহিরে বজায় রাখিতে প্রচলিত রীতি অনুসারে বাধ্য হইতেন—ভিতরে তাঁহারা যতই কেন মদমাতাল বা হল্লাবাজ হৌন না—তাঁহারাই সাধারণতঃ ব্রুহাম গাড়ী ব্যবহার করিতেন। ব্রুহাম গাড়ীর আরোহীদিগকে দেখিলে সকলের মনে একটা মহা 'সমীহ' ভাব জাগিয়া উঠিত—মনে হইত, না জানি, আরোহী হাইকোর্টের কোন জজ বা মেডিকেল কলেজের কোন বড় ডাক্তার।

গাড়ীর চেহারার সঙ্গে যাত্রীর পদমর্যাদার সম্পর্ক ছিল, form-এর সঙ্গে content-এর যেমন সম্পর্ক থাকে তেমনি। একালেও কি নেই? অবশ্যই আছে। কালের যাত্রায় গাড়ী বদলায়, আরোহী-যাত্রী বদলায়, কিন্তু গাড়ীর সঙ্গে যাত্রীর পরস্পর-সম্পর্কের যে sociological law তা কখনও বদলায় না। অতএব গাড়ী-যাত্রীর সম্পর্ক সেকালেও যেমন ছিল, একালেও তেমনি আছে। ভাঙা বেবি-অস্টিন বা উটের মতন উঁচু ঝরঝরে ফোর্ড গাড়ী দেখলেই বোঝা যায়, ভিতরের আরোহীর অটোতে চড়ার বাসনা আছে, আর্থিক সামর্থ্য নেই। কম্যাণ্ডার বা প্রেসিডেণ্টের মতন স্ট্রীমলাইণ্ড অটো-মোবাইল দেখলে বোঝা যায়, ভিতরের আরোহীর 'লিকুইড' টাকার কোন অন্ত নেই; এবং হয় তিনি চলচ্চিত্রের কোন উজ্জ্বল তারকা, না হয় ফাট্‌কা-বাজারের কোন কীর্তিমান দালাল, অথবা লাটে-ওঠা কোন লিমিটেড কোম্পানির ম্যানেজিং-ডিরেক্টর। তাঁর মন-প্রাণ, চিত্ত-ফুসফুস, পাঁজরা-হাড়গোড় অর্থাৎ গোটা ফিজিওলজিক্যাল গড়নটাও ঠিক অটোমোবাইলের মতন চাঁছাছোলা। চরিত্রের দিক থেকেও তিনি ঠিক যেন একটি নিখুঁত পালিশ করা যন্ত্র। সমাজের মধ্যেও তিনি অবিকল তাঁর অটোমোবাইলের মতন সরীসৃপ-গতিতে নিঃশব্দে চলে বেড়ান। তাঁর চলায় যান্ত্রিক বেগ আছে যথেষ্ট, কিন্তু হৃদয়ের আবেগ নেই একটুও। একালের অটোর মতন সেকালের ল্যাণ্ডোর যুগেও যাত্রীদের বোঝা যেত গাড়ী দেখে। গাড়ীর সঙ্গে ঘোড়াটাকেও অবশ্য দেখতে হত, কারণ কেবল 'কোচ' দেখে তার ভিতরের বাবুটিকে বোঝা যেত না। ভাল ল্যাণ্ডোতে বা ব্রুহ্যামে কেউ যদি হাড়গিলে ঘোড়া যুতে রাস্তায় বেরুতেন তা হলে বুঝতে হত, বাবুর দফা রফা হয়ে গেছে, মামলা-মোকদ্দমায় হোক বা বাবুগিরিতেই হোক, তাঁর বংশের আভিজাত্যের সলতেটি পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে এসেছে। ঘোড়ার দানা জুটছে না, ভাল সহিস তো নয়ই। অথচ পিতামহ-প্রপিতামহের আমলের ব্রুহ্যামের পরিত্যক্ত কোচটি আছে।

বাবু তাই সেই পুরনো অভিজাত ব্রুহ্যামে দানাভাবে শীর্ণ হাড়গিলে ঘোড়া যুতেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন।

সুতরাং কেবল গাড়ী নয়, গাড়ীর সঙ্গে ঘোড়াও দেখতে হত। গাড়ীর সঙ্গে ঘোড়ার গোঁজামিল, অথবা ঘোড়ার সঙ্গে গাড়ীর গোঁজামিল, তখনকার লোকের কাছে নিশ্চয় দৃষ্টিকটু লাগত। সাধারণত অবশ্য ব্রুহ্যাম, বা ভাল জুড়ি-ল্যাণ্ডোতে চড়ে শহরের ধনিক অভিজাতরা চলাফেরা করতেন। মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত লোকের সাধ্য ছিল না ল্যাণ্ডো হাঁকিয়ে বেড়ানোর। আজকালকার মধ্যবিত্তের পক্ষে কোন-রকমে একটা ছোটখাট সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মোটর কিনে নিজে চালিয়ে বেড়ানো সম্ভব। সেকালের ল্যাণ্ডোর যুগে তা সম্ভব ছিল না। অবশ্য তখনকার সমাজে মধ্যবিত্তের আয়তন বা সংখ্যাও এত বিপুল ছিল না। উপরে মহাবিত্তবান এবং নিচে স্বল্পবিত্ত দরিদ্র, প্রধানত সমাজে এই দুইশ্রেণীর লোকই ছিল। ল্যাণ্ডো-কালচার স্বল্পবিত্তদের স্পর্শও করতে পারত না। একালে ভাল ভাল মোটর 'ট্যাক্সি' হিসেবে ভাড়া পাওয়া যায়। স্বল্পবিত্ত লোকও এক-আধদিন তাতে চড়ে বেড়াতে পারেন। সেকালের ল্যাণ্ডোব্রুহ্যামে বড়লোকদের একান্ত মোসাহেব না হলে কারও সাধ্য ছিল না চড়ে বেড়ানোর। কারণ ল্যাণ্ডো বা ব্রুহ্যাম ভাড়া খাটত না। কেরাঞ্চি, পাল্কিগাড়ী, ছক্কোড়, ব্রাউনবেরি ইত্যাদি ভাড়া পাওয়া যেত। সেই সব গাড়ীর ও ঘোড়ার চেহারার সঙ্গে ল্যাণ্ডো-ব্রুহ্যামের কোন তুলনাই হত না। আমাদের দেশের পাল্কিতে চার-চাকা লাগিয়ে ঘোড়া যুতে দিলে যা হয়, তাই ছিল পাল্কিগাড়ী। একঘোড়ার ও দু'ঘোড়ার, দুরকমেরই পাল্কিগাড়ী ছিল। প্রথমদিকের পাল্কিগাড়ীতে দুদিকেই দণ্ড থাকত। অর্থাৎ আসল পাল্কিটাকেই চারচাকার উপর বসানো হত। কখন তা মানুষে ঠেলত, কখন ঠেলত ঘোড়া। আবার যখন দরকার হত, চাকার উপর থেকে তুলে নিয়ে মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে পাল্কি করে নেওয়া হত। স্কন্ধযান অশ্বযানে পরিণত

হবার আগে তার এই তিনরকমের transitional রূপ হয়েছিল দেখা যায়।

প্রথমটি মানুষ-টানা চারচাকার পাল্কিগাড়ী ;
দ্বিতীয়টি ঘোড়া-টানা চারচাকার পাল্কিগাড়ী ;
তৃতীয়টি আদি-অকৃত্রিম পাল্কি।

ব্রাউনবেরি ছিল পাল্কিগাড়ীরই দ্বিতীয় সংস্করণ। জনৈক ব্রাউনলো সাহেব, পাল্কি-বেয়ারাদের ধর্মঘটের সময়, একবার নাকি অফিস যাতায়াতের সুবিধার জন্য পাল্কিতে ঘোড়া যুতে এই গাড়ী চালু করেছিলেন। সেইজন্য তার নাম হয়েছিল ব্রাউনবেরি।

কেরাঞ্চি গাড়ীর খুব প্রচলন ছিল কলকাতায়, সাধারণ লোক দল বেঁধে শেয়ারে তাতে যাতায়াত করত। বিলেতের পুরনো ভাড়াটে গাড়ীর অনুকরণে তৈরি কেরাঞ্চি দুই ঘোড়ায় টানত। তৃতীয়শ্রেণীর অপদার্থ ঘোড়াই বেশী। ১৮৪৩ সালে গ্ল্যাসগো থেকে প্রকাশিত *Sketches of Calcutta* পুস্তকে জনৈক বিদেশী প্রত্যক্ষদর্শী কলকাতার কেরাঞ্চি গাড়ী সম্বন্ধে লিখেছেন :

> There are many objects which attract our attention solely on account of their negative qualities, and the kranchie is one of them... The body of a kranchie is rather smaller than a home noddy, and it is lower and unpainted... The ponies that draw this sorry vehicle are mere skin and bone... in this narrow and much frequented street (কসাইতলা বা বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট) aspiring natives are often seen in kranchies and showing their bare breasts and arms to advantage... Four, five and six of these vehicles are frequently seen running in company.

সাহেব বলেছেন যে, 'নেগেটিভ' গুণের জন্য উল্লেখযোগ্য বস্তু হল কলকাতার কেরাঞ্চি গাড়ী। ছোট ও নিচু খাঁচার মতন দেখতে কেরাঞ্চির গায়ে কোন রঙচঙের বিশেষ চিহ্ন থাকত না। অস্থিচর্মসার ঘোড়ায় কেরাঞ্চি টানত। সাহেব উচ্চাভিলাষী নেটিবদের প্রসঙ্গে বলেছেন যে তাঁরা কেরাঞ্চিতে চড়ে, প্রায় সারা গা আলগা করে, কসাইতলার সরু রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতেন। 'aspiring natives' বলতে সাহেব কাদের কথা বলতে চেয়েছেন বোঝা যায় না। চাঁদনি বা চীনাবাজারের দেশী ব্যবসায়ীরা হয়ত এইভাবে মধ্যে মধ্যে দল বেঁধে কেরাঞ্চিতে চড়ে শহরে বেড়াতে বেরুতেন। অথবা কালীঘাটের তীর্থযাত্রীরাও সারবন্দী কেরাঞ্চিতে যেতে পারেন। কালীঘাট ছিল তখন কলকাতার অন্যতম আকর্ষণ। পুণ্যলোভাতুররা বহুদূর থেকে কলকাতার কালীঘাট তীর্থে আসতেন। চিৎপুর-কসাইতলা-চৌরঙ্গী দিয়েই দক্ষিণে কালীঘাট পর্যন্ত রাস্তা ছিল তখন। কালীঘাটের তীর্থযাত্রীদের এটি অতি প্রাচীন রাস্তা। সাহেব হয়ত সারবন্দী কেরাঞ্চি-বোঝাই তীর্থযাত্রীদের দেখেছেন। তা ছাড়া 'bare breasts and arms' তিনি কোথা থেকে দেখবেন? অবশ্য তা নাও হতে পারে। এদেশের সাধারণ লোকরা গ্রীষ্মকালে গায়ে বিশেষ জামা-জোব্বা চাপাবার প্রয়োজন বোধ করতেন না তখন। দল বেঁধে তাঁরাও কেরাঞ্চি ভাড়া করে সান্ধ্যভ্রমণে বেরুতে পারেন।

শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস (Fanny Parkes) ১৮২২ সালে একবার চৈত্রসংক্রান্তির দিনে চড়কের গাজন দেখতে কালীঘাটে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর *Wanderings of a Pillgrim etc* (১ম খণ্ড, লণ্ডন ১৮৫০) গ্রন্থে লিখেছেন :

> I drove down in the evening to Kalee Ghaut. Thousands of people were on the road, dressed in all their gayest attire, to do honour to the festival of the Churuk Pooja, the swinging by hooks... Khranchies

full of nach girls were there in all their gaily coloured dresses and ornaments, as well as a number of respectable men of good caste...

কেরাঞ্চিতে নর্তকীরা গাজনের মেলায় গিয়েছিল কালীঘাটে। সম্ভ্রান্ত বলতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের কথাই ফ্যানি বলেছেন। কেরাঞ্চিতে চড়ে তাঁরা উৎসব পার্বণের দিন ঘুরে বেড়াতেন। কেরাঞ্চিই ছিল তখন কলকাতার পপুলার গাড়ী।

উত্তরভারতের জনপ্রিয় এক্কাগাড়ী বাংলাদেশের কলকাতা শহরে বিশেষ পপুলার হতে পারেনি। এক্কা প্রসঙ্গে 'পঞ্চানন্দের' বিখ্যাত বর্ণনার কথা মনে হয়ঃ

বিঘোরে বিহারে চড়িনু এক্কা
লাগে—ধুবধাব তাই বিষম ধাক্কা।
কিবা—বাঁকা দুটি বাঁশ শোভে দুই পাশ
মাঝখানে তার সকলি ফক্কা;
দেয়—পাতালতা দিয়ে আসন গড়িয়ে
চেঁড়ে যদি পথে অমনি অক্কা।

পঞ্চানন্দের এই 'এক্কাকাব্য' পড়ে খানিকটা অনুমান করা যায়, বাংলাদেশে কেন এক্কার 'ইনফিলট্রেশন' সম্ভব হয়নি। দু'দিকে বাঁকা দু'টি বাঁশ, 'মাঝখানে তার সকলি ফক্কা' এবং 'চেঁড়ে যদি পথে অমনি অক্কা'—এরকম যে এক্কার গড়ন, তার চলন বাংলাদেশে হওয়া মুশকিল। উত্তরভারতের এক্কা-কৃষ্টির 'diffusion' তাই উনিশ শতকে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের কলকাতা শহরে সম্ভব হয়নি। অশ্বযানের মধ্যে পাল্কিগাড়ী কেরাঞ্চি ও ল্যাণ্ডো-ব্রুহ্যামই বাংলার রেনেসাঁসের যুগে আধিপত্য বিস্তার করেছে।

বগিগাড়ীর অবশ্য বেশ প্রতিপত্তি ছিল বাংলাদেশে। বগির

উপরে একটা ঢাকনা থাকত, রোদ আড়াল দেবার জন্য। স্টুয়ার্ট কোম্পানিই বগিগাড়ীকে অনেকটা জনপ্রিয় করে তোলেন। বগি বলতে উনিশ শতকে 'স্টুয়ার্ট-বগি বা বগি-স্টুয়ার্ট' বোঝাত। 'বগি' আর 'স্টুয়ার্ট' কথা দুটি প্রায় একার্থক হয়ে গিয়েছিল। 'Calcutta in 1811' কবিতায় জনৈক কবি এই স্টুয়ার্ট-বগিকে অমর করে রেখে গেছেন ঃ

Sedate they quit the ruminating chair,
And breathe abroad the evening dust and air;
As dips the Sun, of dazzling splendour shorn,
When the wide Fort resounds the evening horn,
Full many a saddened form, in jacket white,
Wings on the thronging course his airy flight,
Borne on the steed, or perched with whip and reins,
In a dear specimen of Stewart's pains.

সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্তরা বগি-ফিটন বেশী ব্যবহার করতেন। নতুন সব উকিল মোক্তার ডাক্তার, স্কুল কলেজের শিক্ষক-অধ্যাপক, মাঝারি গ্রেডের ব্যবসায়ী, এঁরা কেউ ফিটন বা বগি-স্টুয়ার্টের উপরের স্তরের চৌঘুড়ি-আটঘুড়ি-ল্যাণ্ডো-ব্রুহাম ইত্যাদির কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। এদেশী কেরানী ও অন্যান্য সাধারণ চাকুরিজীবীদের প্রধান বাহন ছিল কেরাঞ্চি ও ছকোড়। ল্যাণ্ডো-ব্রুহামে চড়তেন ধনিক দালাল-বেনিয়ান মুচ্ছুদিরা, শহরের নবাগত জমিদাররা আর সাহেবরা।

গাড়ী ও ঘোড়া দুইই অবশ্য দৈনিক ও মাসিক হারে ভাড়া পাওয়া যেত। ১৮৪০-৪১ সালে মেসার্স হাণ্টার অ্যাণ্ড কোং ও মেসার্স কুক অ্যাণ্ড কোম্পানির বিজ্ঞাপিত ভাড়ার হার ছিল এই ঃ

একজোড়া ঘোড়া	:	দৈনিক ১০৲ টাকা
ঐ	:	মাসিক ১৫০৲ টাকা
একজনের গাড়ী ও	:	দৈনিক ১৬৲ টাকা

একজোড়া ঘোড়া		
ঐ	ঃ	মাসিক ২৫০৲ টাকা
দুজনের 'চ্যারিয়ট'	ঃ	দৈনিক ২০৲ টাকা
ঐ	ঃ	মাসিক ৩০০৲ টাকা
একজনের গাড়ী	ঃ	দৈনিক ৪৲ টাকা
ঐ	ঃ	মাসিক ১২০৲ টাকা
দুজনের গাড়ী	ঃ	দৈনিক ১০৲ টাকা
ঐ	ঃ	মাসিক ১৫০৲ টাকা
বগি ও ঘোড়া	ঃ	দৈনিক ৮৲ টাকা
ঐ	ঃ	মাসিক ১৫০৲ টাকা
একটি ঘোড়া	ঃ	দৈনিক ৫৲ টাকা
ঐ	ঃ	মাসিক ১৫০ টাকা

[*The Bengal and Agra Guide and Gazetteer for 1841,* Vol I, Part II, PP. 72-73]

তদানীন্তন সুপ্রিমকোর্টের অ্যাডভোকেট জর্জ জনসন ১৮৪৩ সালে লিখেছেন যে একখানা বগিগাড়ীর দাম ছিল তখন ৮০০৲ টাকা থেকে ১১০০৲ টাকা, পাল্কিগাড়ীর দাম ছিল ৯০০৲ টাকা থেকে ১৮০০৲ টাকা, এবং ব্রিচ্‌কার দাম ছিল ২০০০৲ টাকা থেকে ৪০০০৲ টাকা। অ্যাডভোকেট সাহেব জানিয়েছেনঃ "These are the prices charged by the makers for new carriages ; but by private sale or auction, they may always be met with, as good as new, for about half that cost." পাল্কিগাড়ী সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে চারচাকার উপর বসানো পাল্কির মতন হলেও, "it is a very comfortable carriage for travelling in at night or in bad weather ; but it is too close and hot for the purpose of evening exercise."

গাড়ীর দাম সংগ্রহ করা যদিও বা কারও সাধ্যে কুলাত, ঘোড়ার দামের কথা ভাবলে তাকে গাড়ী চড়ার বাসনা বর্জন করতে হত।

বিলেত থেকে এক-একটা ঘোড়া নিয়ে আসার খরচই পড়ত প্রায় ৪০ পাউণ্ড করে। সুতরাং বিলেতী ঘোড়ার দাম ছিল অত্যধিক। আরবী স্ট্যালিয়ন, যা সাধারণত সাহেবরা চড়ে বেড়াতেন, ১০০০৲ টাকা থেকে ১৮০০৲ টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হত। জনসন লিখেছেন, ভদ্রলোকে কোনরকমে পিঠে চড়ে বেড়াতে পারে, এরকম একটি চালু ঘোড়া ৫০০৲ টাকার কমে পাওয়াই যেত না। আর খুব কম করেও একটা ঘোড়া পুষতে মাসে তখন ১৫৲ টাকা আন্দাজ খরচ হত। তা ছাড়া, ঘোড়া হলেই সহিসের দরকার হত। ঘোড়ার অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের দামও নেহাৎ অল্প ছিল না। দু'ঘোড়ার গাড়ীর একসেট লাগাম-বগলস ইত্যাদি বিলেতী চামড়ার হলে (অর্থাৎ সাহেব মুচির তৈরি হলে) ২০০৲ টাকার কমে পাওয়া যেত না। কিন্তু এদেশী মুচির হাতে চামড়ার তৈরি হলে তা ৬০৲ টাকাতেই পাওয়া যেত। জনসন এদেশী জিনিসই ব্যবহার করতেন। তিনি লিখেছেন, "I always had the latter ; they look quite as well as those made by English saddlers" জনসন ব্যবহার করলেও এদেশী অভিজাত জনার্দনরা নিশ্চয় বিলেতী 'হার্নেস' ব্যবহার করতেন, দেশী মুচির চামড়ার লাগামে তাঁদের মন উঠত না। সুতরাং সাহেব-নবাবদের কথা বাদ দিলেও, এদেশী বাবুদের ঘোড়ার চেয়ে চাবুকের খরচ পড়ত বেশী, এবং খান দুই ঘোড়ার গাড়ী রাখতে তাঁরা যে কি পরিমাণ অর্থ অপব্যয় করতেন তা কল্পনা করা যায় না। সাধারণ মানুষ এই ব্যয়ের কথা কল্পনাই করতে পারত না, ঘোড়া ও গাড়ী দুই-ই তাদের কাছে নিছক বিলাসিতা বলে মনে হত। তা ছাড়া, আগে যে ঘোড়া ও গাড়ীর দৈহিক ও মাসিক ভাড়ার হারের কথা উল্লেখ করেছি তা দেখেই বোঝা যায়, ল্যাণ্ডো-বগি-কালচার তো বহুদূরের কথা, সামান্য কেরাঞ্চি-ছক্কোড়-কালচারও কলকাতা শহরে বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্তশ্রেণীর বেশী দূর স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। অতএব নবযুগের নতুন মহানগরে পাল্কি কালচারেরই দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রতিপত্তি ছিল।

মানুষের স্কন্ধযান পাল্কি প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শন। তার উদ্‌বর্তন আধুনিক যুগেও সম্ভব হয়েছিল নতুন অশ্ব-যানের ব্যয়-বাহুল্যের জন্য। উনিশ শতকের তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত তো বটেই, তার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত পাল্কির প্রতিপত্তি কমেনি। বাংলার নবজাগরণ আন্দোলন যখন তরঙ্গশীর্ষে পৌঁছেচে, তখনও কলকাতার রাজপথে পাল্কি-বেয়ারাদের পথচলার ধ্বনি শোনা গেছে। যখন থেকে ঘোড়াটানা ট্রামগাড়ী চলতে আরম্ভ করেছে কলকাতায়, তখন থেকে সাধারণ মানুষের পাল্কিনির্ভরতা কমতে আরম্ভ করেছে। তার আগে একজোড়া পা ছিল সাধারণ মানুষের চলার পথে প্রধান সম্বল, অথবা ওড়িয়া বেয়ারাদের পদনির্ভর পাল্কি। কিন্তু প্রশ্ন হল, বাংলাদেশের 'কাহার' 'ডোম' ও অন্যান্য জাতের লোক যারা পাল্কি বইত, তারা কেউ গ্রাম ছেড়ে নতুন শহরে সাগ্রহে তেমন এল না কেন? বাংলার নতুন শহরে পাল্কিবেয়ারা হল ওড়িয়ারা। বাঙালী পাল্কিবেয়ারারা কোথায় গেল? বোঝা যায়, তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসেনি। নতুন শহর-নগরের যানবাহন দীর্ঘকাল পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত হয়নি। আজই বা গ্রামের কতদূর পর্যন্ত প্রচলিত হয়েছে? উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তো হয়ইনি, দ্বিতীয়ার্ধেও রেলপথে ট্রেন চলাচলের পর, ট্রেন ছাড়া আর কোন আধুনিক যান গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করেনি। কিন্তু রেলগাড়ী গেলেও, তাতে গ্রাম্যজীবনের ভিতরের চলাচলের চাহিদা মেটেনি। সেকালের গ্রাম্যসমাজের অচলতা ও বিচ্ছিন্নতা রেলগাড়ী দূর করে দিয়েছিল বটে, কিন্তু তার ভিতরের যুগসঞ্চিত জড়তার লৌহপ্রাচীর ধূলিসাৎ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। নতুন শহুরে সমাজে যে গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়েছিল, তার শতাংশের একাংশও গ্রাম্যসমাজে দীর্ঘকাল পর্যন্ত হয়নি। নতুন অশ্বযানের পথ তৈরি হয়নি গ্রামে। সনাতন পায়ে-হাঁটা পথে মানুষ চলত, এবং মানুষের কাঁধে ডুলি ও পাল্কি চলত। ব্রিটিশ আমলেও এই অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। সুতরাং গ্রাম্যসমাজে নানাজাতের ও নানাশ্রেণীর লোক ইংরেজ আমলে

তাদের বংশগত পেশা থেকে উৎখাত হলেও, বাংলার পাল্কিবেয়ারারা বেকার হয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে বাধ্য হয়নি। ওড়িয়াবেয়ারারা হয়ত আর্থিক কারণেই নতুন কলকাতা শহরে আসতে প্রলুব্ধ হয়েছিল, কিন্তু বাঙালী বেয়ারারা হয়নি। নতুন শহর অথবা অর্থলোভ গ্রাম্য পরিবেশ থেকে তাদের ছিনিয়ে আনতে পারেনি। দরিদ্র ও পরিশ্রমী ওড়িয়ারা অভাবের তাড়নায় ও উপার্জনের লোভে সহজেই তাদের গ্রাম ছেড়ে বাংলার নতুন মহানগরে দলে দলে চলে এসেছিল।

নতুন কলকাতায় পুরাতন পাল্কির বাহক ছিল ওড়িয়ারা। ১৮৪০-৪১ সালে পাল্কি ও তার বেয়ারাদের ভাড়া ও মজুরির হার ছিল এই ঃ

পাল্কিভাড়ার হার

সারাদিনের জন্য, ১৪ ঘণ্টা	ঃ	চার আনা
আধাদিনের জন্য, ১ ঘণ্টা থেকে ৫ ঘণ্টা	ঃ	দুই আনা

বেয়ারাদের মজুরি

সারাদিনের জন্য, ১৪ ঘণ্টা	ঃ	চার আনা
আধাদিনের জন্য	ঃ	দুই আনা
একঘণ্টা বা আরও অল্প সময়ের জন্য	ঃ	এক আনা

পাল্কি ও পাল্কিবেয়ারাদের সঙ্গে ঘোড়াগাড়ী ও ঘোড়ার ভাড়া-মজুরির হারের তুলনা করলে একটা আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করা যায়। নতুন অর্থসর্বস্ব শহরে অর্থের মর্যাদা মানুষের চেয়ে বড় তো হয়ে উঠলই, মানুষের মেহনতের আর্থিক মূল্য ঘোড়ার চেয়েও কমে গেল। ১৮৪০-৪১ সালে সারাদিনের জন্য একটি ঘোড়া ভাড়া করতে গেলে ৫৲ টাকা মজুরি দিতে হত। ঘোড়ার কাজ ছিল প্রভুকে পিঠে চড়িয়ে ঘুরে বেড়ানো। ঘোড়ার সারাদিনের মেহনতের মজুরি যখন ৫৲ টাকা ছিল, তখন একজন পাল্কিবেয়ারার সারাদিনের মেহনতের মজুরি ছিল চার আনা। অর্থাৎ মানুষের মেহনতের মজুরির হারের চেয়ে ঘোড়ার

মেহনতের মজুরির হার ছিল বিশগুণ বেশী। অথচ পাল্কিবেয়ারারাও, ঘোড়ার মতন মানুষকে পিঠে না বইলেও, কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেত। উভয়ের মেহনতের মধ্যে গুণগত, এমন কি বাইরের রূপগতও, কোন পার্থক্য ছিল না। সুতরাং তাদের মেহনতের মূল্যের এত তফাৎ হওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু নতুন শহরে মানুষের আত্মমর্যাদা যেমন বাড়ছিল, তেমনি একশ্রেণীর মেহনতসর্বস্ব মানুষ পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে নেমে যাচ্ছিল।

যানবাহনের দিক থেকে সাধারণ মানুষের একমাত্র সহায় ও সম্বল ছিল সনাতন পাল্কি। পাল্কির চেয়ে বগি কেরাঞ্চি, এমন কি ছ্যাকরার ভাড়ার হারও ছিল অনেক বেশী। তাই থাকাই স্বাভাবিক, কারণ ঘোড়ার মেহনতের দাম মানুষের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। আজও স্ট্রীমলাইণ্ড অটোমোবাইলের যুগে বড় বড় শহরে তো মানুষে টানা রিক্সা চলে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নেও তো জন্তু ও যন্ত্রের চেয়ে মানুষের মেহনতের মূল্য বাড়ল না! সুতরাং উনিশ শতকে পাল্কি ও তার বাহকদের ভাড়ার হার বগি ও তার ঘোড়ার চেয়ে যে অনেক কম হবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

পাল্কি ও তার বাহকদের এই ট্র্যাজিডি সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে বাংলার নবজাগরণের যুগে অগ্রগতির প্রতীক ছিল ল্যাণ্ডো-ব্রুহ্যাম-বগি, এমন কি, কেরাঞ্চি ও ছক্কোড়ও। ল্যাণ্ডো-বগির কদম-চালে নবজাগরণের জাগ্রত সমাজচেতনার অগ্রগতির বেগ প্রতিফলিত হত। কেবল ল্যাণ্ডো নয়, তার বলিষ্ঠ তেজী ঘোড়াগুলোও ছিল নবযুগের মানুষের চরিত্রের প্রতীক। কিন্তু তার সঙ্গে কলকাতায় পাল্কিরও প্রাধান্য ছিল যথেষ্ট। পাল্কির এই প্রাধান্য দেখে বোঝা যায়, বাংলাদেশে নবজাগরণের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। সামন্ত যুগের সংস্কৃতিকে বেশ সমারোহেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা হয়েছিল। চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। বিদেশী সাহেব কোচমেকাররা পর্যন্ত এদেশী পাল্কি নির্মাণে মনোযোগ দিয়েছিলেন।

পাল্কি বেচে তাঁরা ল্যাণ্ডো-বগির চেয়ে বেশী ছাড়া কম অর্থ রোজগার করেননি। মনে হয় পাল্কি বেচেই তাঁরা সবচেয়ে বেশী পয়সা পেয়েছিলেন। বিখ্যাত ইয়োরোপীয় চিত্রকররা কলকাতা শহরে এসে, কোচমেকারদের কারখানায় পাল্কি-চিত্রণের কাজ করে, প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। উইলিয়ম বেইলি (যাঁর আঁকা প্রাচীন কলকাতার চিত্রাবলী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে আছে) ১৭৯৫ সালে তাঁর একজন শিল্পীবন্ধুকে লেখেন :

"সলভিন্স নামে একজন ফ্লেমিশ শিল্পী ব্রুশেলস থেকে বছর চারেক আগে কলকাতা শহরে এসেছেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। কোচমেকার স্টুয়ার্টদের কারখানায় তিনি পাল্কি চিত্রিত করেই অর্থ পেয়েছেন বেশী। অবশ্য সেসব সাধারণ পাল্কি নয়, রাজারাজড়াদের পাল্কি। তার মধ্যে ছ'টি আমি জানি লর্ড কর্নওয়ালিস মহীশূর-রাজের জন্য তৈরি করেছিলেন, ছ'সাত হাজার টাকা করে দাম হবে। সলভিন্স সেই পাল্কি চিত্রিত করেছিলেন, সোনার রঙের উপর অন্য একটি রঙ দিয়ে। তাতে তাঁর সুনাম হয়েছিল খুব। এইসব রাজকীয় পাল্কির অদ্ভুত কারিগরি দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। যেখানে যে-ধাতু দিয়ে তৈরি, তার উপর রূপো দিয়ে বাঁধানো, কোথাও বা নীরেট রূপো দিয়েই সবটা তৈরি। ভিতরে ভেলভেটের লাইনিং দেওয়া, তার উপর সোনারূপোর কাজ করা ঝালর লাগানো। তাঞ্জোরের মহারাজকুমারদের জন্য সম্প্রতি স্টুয়ার্টরা দুটি একরকমের পাল্কি তৈরি করেছেন, প্রত্যেকটির দাম দশ হাজার টাকা হবে। এগুলিকে 'মহনা' বা 'মিয়ানা' পাল্কি বলা হয়। পাল্কির ভিতরে বিছানা-বালিশ সবই থাকে, শুয়ে শুয়ে যাওয়া যায়।"

মিয়ানা পাল্কি বাংলারই বৈশিষ্ট্য ছিল। কলকাতার বিদেশী কোচমেকাররা ভারতের রাজামহারাজাদের জন্য এই পাল্কি তৈরি করে পাঠাতেন। লম্বায় ও চওড়ায় বেশ বড় পাল্কি, ভিতরে আরোহীরা

হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে-বসে, যেভাবে খুশি যেতে পারতেন বিলাসিতার দিক থেকে মিয়ানা পাল্কির কোন জুড়ি ছিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের কথা। নবযুগের ল্যাণ্ডো-বগির সঙ্গে মধ্যযুগের রাজকীয় পাল্কি তখনও কলকাতার রাস্তায় পাল্লা দিয়ে চলেছে। শহরের পথে-ঘাটে ঘোড়াকে ভয় দেখিয়ে দু'চারটে হাতিও তখন চলে বেড়িয়েছে। সত্যকার নবজাগরণের স্থচনা হয়নি তখনও। উনিশ শতক থেকে ক্রমে রাজকীয় পাল্কির প্রভাব কমেছে এবং ল্যাণ্ডো-বগির প্রতিপত্তি বেড়েছে। ধনিক-বণিক যুগের অগ্রগতির ধ্বনি ল্যাণ্ডো ও ওয়েলারের চলার ছন্দে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ জনসমাজে মধ্যযুগের প্রভাব যে বিশেষ কমেনি, ল্যাণ্ডো-বগির পাশে ওড়িয়া বেয়ারাদের পাল্কি দেখে তা বোঝা যেত।

তবু একটা পুরনো যুগ যে অস্ত যাচ্ছে এবং নতুন যুগের জন্ম হচ্ছে কলকাতা শহরে, উদ্ধত অশ্বারোহীর ও অশ্বযানের পদধ্বনিতে তা বোঝা যাচ্ছিল। নবনির্মিত বড় বড় লম্বা-চওড়া রাজপথের মধ্য দিয়ে কলকাতা শহরের আধুনিক যুগোপযোগী রূপ ফুটে উঠছিল। মধ্যযুগের নগরের সঙ্কীর্ণ অলিগলির বাঁকে মধ্যে মধ্যে তবু অশ্বারোহী অভিজাতদের সঙ্গে সাধারণ দীনদরিদ্র প্রজাদের হঠাৎ দেখা-সাক্ষাৎ হত, এবং তাঁরা তাদের পথ ছেড়ে দেবার জন্য হয়ত দু'দণ্ড অশ্বপৃষ্ঠে অপেক্ষাও করতেন। কিন্তু নবযুগের নতুন শহরে স্থদীর্ঘ প্রশস্ত রাজপথ তৈরি হল যখন, তখন ধনী-দরিদ্রের মানবিক বিভেদ-বিচ্ছেদও সেই অনুপাতে প্রশস্ত হয়ে গেল। সেইজন্য বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী মামফোর্ড (Lewis Mumford) বলেছেন:

> Now, with the development of the wide avenue, the dissociation of the upper and the lower classes achieves form in the City itself. The rich drive, the poor walk.

They roll along the axis of the grand avenue: the poor are off-centre, in the gutter... [*The Culture of Cities*, P. *97*]

কলকাতা শহরেও ধনী-দরিদ্রের এই ব্যবধান ক্রমেই বাড়তে লাগল। সতের শতকে প্যারিস ও লণ্ডন শহরে স্টেজকোচ চাপা পড়ে যত লোকের মৃত্যু হয়েছিল, পরবর্তীকালে রেলগাড়ীর যুগেও বোধ হয় তা হয়নি। আঠার ও উনিশ শতকের কলকাতা শহরেও ঠিক তাই হয়েছিল। নবযুগের নতুন সামাজিক গতি ও চলার ছন্দের সঙ্গে সাধারণ মানুষ ঠিক তাল রেখে চলতে পারছিল না। মামফোর্ড বলেছেন: "If the fowls no longer cackled at dawn, the restless stomp of a highbred horse might be heard at night from rear windows: the man on horseback had taken possession of the city."

উনিশ শতকের কলকাতা শহরেও মোরগের ডাকে ভোরবেলা মানুষের আর ঘুম ভাঙছিল না। গ্রাম ভেঙে যখন নতুন শহর গড়ে উঠছিল, এবং গ্রামের মানুষ শহর থেকে দূরে বহুদূরে সরে যাচ্ছিল, তখন তাদের সঙ্গে ভোরের মুরগীর ডাকও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। টম্‌টম্ ও ল্যাণ্ডো-বগির চাকার ঘর্ঘর শব্দে এবং তেজোদ্দীপ্ত অশ্বের পদধ্বনিতে নতুন শহরে নতুন ভোর হচ্ছিল, এবং নতুন করে জেগে উঠছিল মানুষ। শহর নতুন, ভোর নতুন, মানুষও নতুন। ভোরের ঘুমভাঙা মানুষ বুঝতে পারছিল, 'the man on horseback had taken possession of the city'—নতুন যুগের অশ্বারোহীরাই শহরটাকে দখল করেছে, এবং নতুন শহরের উপর দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে দুরন্ত বেগে তারা এগিয়ে চলেছে।

ক্রীতদাস ও কুলি-মজুর

প্রাচীন হিন্দুযুগ থেকে আমাদের সমাজে দাসপ্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমানযুগে এই প্রথা আরও ব্যাপকভাবে আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়। মুসলমান শাসকদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র দাসবংশ কিছুদিন এদেশে রাজত্ব করেছিলেন। নানা উপায়ে তখন একজন মানুষকে দাসে পরিণত করা হত। যুদ্ধক্ষেত্রে যারা বন্দী হত তাদের দাসত্ব গ্রহণ করতে তো হতই, অনেক সময় ঋণের দায়ে, অথবা দারিদ্র্যের তাড়নায় অনেককে বাধ্য হয়ে দাসত্ব করতে হত। এই দাস বা গোলামরা ছিল কতকটা ভোগ্য পণ্যদ্রব্যের মতন, বাইরে বাজারে তাদের কেনা-বেচা চলত, বিবাহের যৌতুকে ও রাজা-বাদশাহদের উপঢৌকনের সঙ্গে গোলামও দান করা হত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে এসে এই দাসপ্রথাকে সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠিত প্রথারূপে দেখতে পান। প্রথাটির সঙ্গে তাঁরা নিজেরাও যে অপরিচিত ছিলেন তা নয়, কারণ তাঁদের নিজেদের দেশে ইংলণ্ডেও দাস-প্রথা রীতিমত প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর দিগ্বিজয়ী বণিক ইংরেজরা আফ্রিকার কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের গোলামরূপে দেশ-বিদেশে চালান দিয়েছেন, এবং মুনাফার জন্য গোলামিপ্রথাকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং আমাদের দেশের প্রচলিত গোলামিপ্রথাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা না করে, তাঁরা দাসব্যবসার মুনাফার

স্বার্থে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, খানিকটা তা চলিত রাখার চেষ্টা করেছিলেন বলা চলে। আঠার শতক ও উনিশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশ তাই দাসব্যবসার (Slave trade) একটি বড় ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। কলকাতা শহরও ইংরেজদের অধীনে আসার পর গোলাম কেনা-বেচার একটি বড় ঘাঁটিতে পরিণত হয়। নতুন শহর কলকাতার গোলামির যুগের এই অন্ধকার স্মৃতি নবযুগের নতুন মানুষের কাছে আজ নিশ্চয় ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন বলে মনে হবে।

কোম্পানির আমলে গোলামের ব্যবসার মুনাফা বেশ লোভনীয় ছিল। ইংরেজদের আগে পর্তুগীজরা গোলামের ব্যবসায়ে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চল থেকে কলকাতার কাছে বজ্‌বজ্‌ আখড়া পর্যন্ত অনেক জায়গায় নদীর ধারে ধারে, পর্তুগীজ ও তাঁদের দোসর মগ বোম্বেটেরা গোলাম কেনাবেচার বাজার স্থাপন করেছিল। এই মগ ও পর্তুগীজদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ইংরেজরাও দাসব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। মুনাফার মোহে অনেক রুচিবান শিক্ষিত ইংরেজেরও মানবতাবোধ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ওয়ারেন হেস্টিংসের মতন শাসকও আইন করেছিলেন যে ডাকাতদের ফাঁসি দেওয়া হবে তাদের নিজেদের গ্রামে এবং তার পরিবারের লোকজন রাষ্ট্রের দাস হয়ে থাকবে, গবর্নমেণ্ট যখন যে-ভাবে খুশী লোকের সুবিধার জন্য তাদের ব্যবহার করতে পারবেন—"the family of the criminal shall become the slaves of the State, and shall be disposed of for the general convenience and benefit of the people according to the discretion of the Government'. এ ছাড়া আরও নিয়ম করা হয়েছিল যে দণ্ডিত অপরাধীদের অনর্থক জেলখানায় বন্দী করে না রেখে, অন্যান্য জায়গায় যেখানে কোম্পানির ব্যবসায়ের ঘাঁটি আছে, সেখানে গোলাম হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া অনেক ভাল, অথবা তাদের বিক্রি করে দিলেও ক্ষতি নেই—"persons

convicted of crime, instead of being incarcerated, should be sold for slaves or transported, as such, to the Company's establishment at Fort Marlborough in Sumatra." অতএব গোলামিপ্রথার প্রতি বণিকদের নয় শুধু, ইংরেজ শাসকদেরও যে কিরকম নিষ্ঠুর মনোভাব ছিল, তা হেস্টিংসের আমলের এইসব কানুন দেখলেই বোঝা যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গোলামিপ্রথাকে কায়েম করারই চেষ্টা করেছিলেন, এবং কোর্ট-হাউসে জনপ্রতি চারটাকা চারআনা 'ডিউটি' দিয়ে গোলামদের রেজিস্ট্রী করাবারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

৩০ ডিসেম্বর, ১৭৬৩ কোম্পানির ডিরেক্টররা একখানি চিঠিতে লেখেন ঃ "পশ্চিম উপকূলে আমাদের যে-সব উপনিবেশ আছে, সেখান থেকে কিভাবে তাড়াতাড়ি গোলাম চালান দেবার ব্যবস্থা করা যায়, সে সম্বন্ধে আমরা গভীরভাবে চিন্তা করছি। Fort William ও Success নামে দুখানি ৩৫০-টনের জাহাজ শীঘ্রই আমরা এর জন্য পাঠাব। জাহাজ দু'খানি এখান থেকে সোজা ম্যাডাগাস্কার যাবে, এবং সেখান থেকে যতগুলি সম্ভব গোলাম বোঝাই করে নিয়ে ফোর্ট মার্লবুরোর দিকে রওয়ানা হবে। সেখানে ১৫ পাউণ্ড (প্রায় ২০০৲ টাকা) করে এক-একটি গোলাম বিক্রি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতগুলি গোলাম যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছবে তখন তাদের খাওয়া-পরারও কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। সে সম্বন্ধে আপনারা অবহিত হবেন, এবং সময়মত সেখানে জিনিসপত্র পাঠাবেন।"

বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে তাঁরা পরবর্তী একখানি চিঠিতে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা লেখেন ঃ "জাহাজ দু'খানিতে ২৬টি করে কামান থাকবে, এবং ক্যাপ্টেন ও অফিসারদের নিয়ে ৭০ জন করে ইয়োরোপীয় নাবিক জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নেবেন। তাঁদের খাওয়াদাওয়া ও অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করবেন জাহাজের মালিকরা। ম্যাডাগাস্কারে গোলাম কিনে জাহাজ বোঝাই করার সম্পূর্ণ ভার থাকবে তাঁদের উপর।

গোলামের মধ্যে তিনভাগের দু'ভাগ হবে পুরুষ, বয়স ১৫ থেকে ৪০ বছর, এবং একভাগ হবে মেয়ে, বয়স ১৫ থেকে ২৫ বছর। তার থেকে কম বয়সের, অর্থাৎ ১০ থেকে ১৫ বছরের হলে, সংখ্যাগণনায় দু'জনকে একজন হিসেবে ধরা হয়। আমাদের ঘাঁটিতে গোলামদের পৌঁছে দেবার পর আমরা প্রত্যেক গোলামের জন্য জাহাজের মালিকদের ১৫ পাউণ্ড করে দেব (*Courts Letter to Bengal*, February 22, 1764)।"

গোলামের ব্যবসা ক্রমে কলকাতা শহরেও বিস্তারলাভ করে, এবং আফ্রিকার গোলাম কলকাতার বন্দরে ও হাট-বাজারে দলে দলে আমদানি হতে থাকে। ক্যালকাটা গেজেট ও অন্যান্য সমসাময়িক পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে কলকাতার এই গোলামদের কথা অনেকটা জানা যায়। বিজ্ঞাপনগুলি আঠার শতকের শেষপর্বের পত্রিকা থেকে গৃহীত। নমুনা এই ঃ

Wanted—Two Coffrees who can play very well on the French Horn and are otherwise handy and useful about a house, relative to the business of a consumer, or that of a cook ; they must not be fond of liquor. Any person or persons having such to dispose of, will be treated with by applying to the printer.

"দুজন কাফ্রি চাই, যারা ফরাসী শিঙ্গা খুব ভালভাবে বাজাতে জানে, এবং ঘরের কাজকর্মেও বেশ দক্ষ। তাদের মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে চলবে না। যদি কারও সন্ধানে এরকম দু'টি কাফ্রি ছেলে থাকে বিক্রির জন্য, তাহলে তিনি এই বিজ্ঞাপনের প্রিণ্টারকে জানাতে পারেন।"

Wanted—a Coffree slave boy ; any person desirous of disposing of such a boy and can warrant him faithful and honest servant will please to apply to the printer."

To be sold—Two French Horn men, who dress hair and shave, and wait at table.

> To be sold—A fine Coffree boy that understands the business of a butler, *Kitmutgar,* and cooking. Price four hundred *Sicca* Rupees. Any gentleman wanting such a servant, may see him, and be informed of further particulars by applying to the printer.

এই ধরনের প্রচুর বিজ্ঞাপন তখনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত। এদেশের সাহেব-নবাবরা তাঁদের ব্যক্তিগত কাজকর্ম ও সেবাশুশ্রূষার জন্য গোলামদের গৃহভৃত্যরূপে নিযুক্ত করতেন। এক-একজন সাহেবের বাড়ি ৫০-৬০ জন থেকে ১০০-১৫০ জন পর্যন্ত ভৃত্য নিযুক্ত থাকত। কেবল এদেশী লোকদের ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত করে তাঁরা কূল পেতেন না। তাছাড়া গোলামদের যেভাবে খাটানো যেত, স্বাধীন ভৃত্যদের স্বভাবতঃই সেভাবে খাটানো সম্ভব হত না। গোলামদের উপর তাঁরা অমানুষিক অত্যাচার করতে পারতেন, যা ভৃত্যদের উপর কিছুতেই করা চলত না। সেইজন্য তাঁরা কলকাতার বাজার থেকে গোলাম কিনে ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত করতেন। কাফ্রি গোলামরা শুধু সাধারণ ভৃত্যের কাজই যে করত তা নয়। তাদের ট্রেনিং দিয়ে সাহেবরা ভাল বাবুর্চি ও খিদমৎগার তৈরি করতেন। শুধু তাই নয়, তারা 'হেয়ার ড্রেসিং', নানারকম বাদ্যবাজনা ইত্যাদিও শিখত। প্রভুর সেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করাই ছিল গোলামের জীবনের একমাত্র কর্ম। কর্মের বিনিময়ে তার প্রাপ্য কিছুই ছিল না, কেবল মনিবের একটু দয়া ও করুণা মধ্যে মধ্যে পেলেই সে কৃতার্থ বোধ করত। ছুটি, অবসর, স্বাধীনতা—এসবের উপর তার কোন মানবিক অধিকার স্বীকৃত হত না। জীবনে কেবল একদিনই তার ছুটি ও অবসর মিলত, মৃত্যুর দিন, এবং সেই মৃত্যুও যে-কোনদিন মনিবের নির্মম প্রহারে ও বেত্রাঘাতে এসে উপস্থিত হত।

গোলামের জীবনে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান বলে কিছু ছিল না। প্রভুর গৃহে প্রত্যেকটি দিন তার বিভীষিকার মধ্যে কাটত। মধ্যে মধ্যে

প্রভুর অত্যাচার যখন সীমা লংঘন করে যেত, তখন নিরুপায় হয়ে আশ্রয় ত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকত না। প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ করার অধিকার সমাজে সাধারণ মানুষেরই তখন ভাল করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অতএব গোলামরা সেই অধিকারের কথা কল্পনাই করতে পারত না। সমস্ত অত্যাচার, যত অমানুষিকই হোক, মুখ বুজে তাদের সহ্য করতে হত। যখন তা সহ্য করা একেবারেই সম্ভব হত না, কেবল তখনই তারা প্রভুর আশ্রয় ত্যাগ করে চলে যেত। কিন্তু চলে গিয়েও তারা রেহাই পেত না, কারণ তারা যে গোলাম! সমাজের কোথাও তাদের আশ্রয় ছিল না মুক্ত মানুষ হিসেবে। পলাতক গোলামদের মনিবরা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করতেন। এই বিজ্ঞাপনের কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি ঃ

> *Strayed*—From the house of Mr. Robert Duncan in the China Bazar, on Thursday last, a Coffree boy, about 22 years old, named Inday, whoever brings back the same shall receive the reward one gold mohur.

"পলাতক—চীনাবাজারের মিঃ রবার্ট ডানকানের বাড়ী থেকে ইন্দে নামে ২২ বছরের একটি কাফ্রি ছেলে গত বৃহস্পতিবার পলাতক হয়েছে। কেউ যদি ছেলেটিকে ফিরিয়ে দিতে পারেন তাহলে তাকে একটি সোনার মোহর পুরস্কার দেওয়া হবে।"

> *Slave boys run away.*—On the fifteenth of October last two slave boys,...named Sam and Tom, about eleven years of age, and exactly of a size, ran away, with a great quantity of plate etc., etc. This is to request, if they offer their service to any gentlemen, they will be so kind as to examine their arms, keep them confined and inform the owner. A reward of one hundred sicca rupees will be given to any black man, to apprehend and deliver them up.

"পলাতক দু'টি ক্রীতদাস ঃ গত ১৫ অক্টোবর শ্যাম ও টম নামে দু'টি ১১ বছর বয়সের দাস বালক, প্রায় একরকম দেখতে, বাড়ি থেকে অনেক প্লেট ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে পালিয়ে গেছে। যদি কোন ভদ্রলোকের কাছে তারা চাকরি করতে যায়, তাহলে তিনি তাদের আটকে রেখে যেন মালিককে খবর দেন। তাদের খোঁজখবর দিলে অথবা ধরে দিতে পারলে, মাসিক ১০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।"

On Monday last a slave boy about fourteen years old, ···had on when he eloped the dress of a Kistmutgar··· it is expected that he has stolen many things. Whoever will give information, so that he may be apprehended, to Mr. Purkis, at No. 51, Cossitollah, shall be handsomely rewarded, if required. Whoever harbours the said slave-boy after this notice, will be prosecuted according to law.

"গত সোমবার ১৪ বছরের একটি দাস বালক, খিদমতগারের পোষাক পরে, অনেক জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। ৫১ নং কসাইতলায়, মিঃ পার্কিসকে এই ছেলেটি সম্বন্ধে যিনি খবর দেবেন, তাকে তিনি ভালভাবে পুরস্কৃত করবেন।"

Missing, since the night of the 2nd instant, a slave boy, named Din Darah, of about fifteen···is marked on the back and arms with the scars of a number of small burns ; had an iron ring on one leg, which, though he may have taken off, the chaffing must be discernible ; his gait is slow ; if confused, has an impediment in his speech. He is a stranger in this part of the country, and, from his having no money, must soon offer for service. Any person who will deliver him at No. 1, Larkin's Lane, shall receive a reward of fifty Sicca

Rupees. Should he offer for employ, any gentleman who will send him as above directed will confer a particular obligation on his Master, who will, if he returns voluntarily, forgive his offence.

Any information that can be given respecting him will be thankfully received.

"গত ২ (জুলাই ১৭৯২) তারিখ থেকে, দীন-দারা নামে ১৫ বছরের একটি দাস ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। তার পিঠে ও হাতে অনেকগুলি আগুনে পোড়ার দাগ আছে, পায়ে আছে একটা লোহার বেড়ি। যদি বেড়িটা সে খুলেও ফেলে দেয়, তাহলেও তার পায়ে একটা গোলাকার কালো দাগ থাকবে। চলাফেরায় খুব ঢিলে, কিন্তু তাতেও যদি তাকে না চেনা যায়, তাহলে তার তোৎলা কথা থেকে নিশ্চয়ই তাকে চেনা যাবে। এ অঞ্চলে সে একেবারে অপরিচিত। তার কাছে টাকাকড়ি কিছু নেই, সুতরাং শীঘ্রই তাকে চাকরি খুঁজতে হবে। এই সময় যদি কোন ব্যক্তি তাকে ধরতে পারেন, এবং ১নং লার্কিন্স লেনে মালিকের কাছে তাকে পৌঁছে দেন, তাহলে তিনি ৫০৲ টাকা পুরস্কার পাবেন।"

সংবাদপত্রের এই বিজ্ঞাপনগুলি অধিকাংশই ১৭৮০ থেকে ১৮০০ সালের 'ক্যালকাটা গেজেট' থেকে সংকলিত। বিজ্ঞাপন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে কলকাতার মতন শহরেও গোলামরা মনিবদের বাড়ি থেকে পালিয়ে রেহাই পেত না। সত্যিকার গোলামের অবস্থা যে কি ছিল, তা শেষের বিজ্ঞাপনটির মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মাস্টারদের অত্যাচারের চিহ্ন তাদের সর্বাঙ্গে খোদাই করা থাকত। কাটাকুটির চিহ্ন ছাড়া আগুনের ছ্যাঁকা দেওয়ার চিহ্নও গোলামদের হাতে পিঠে প্রচুর পরিমাণে থাকত। সভ্যতার এই কলঙ্কের চিহ্ন সারাজীবন বহন করতে হত গোলামদের। পায়ে থাকত লোহার বেড়ি, এবং তা খুলে ফেলে দিয়েও তার দাগ নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হত না।

গোলামদের এই সব বিবরণ থেকে হয়ত অনেকের মনে হতে পারে যে কেবল আফ্রিকা, মালয় প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আমাদের দেশে ক্রীতদাস আমদানি করা হত, এদেশের লোককে গোলাম করা হত না। কিন্তু এ ধারণা ভুল। আগে বলেছি, আমাদের দেশে দাসত্বপ্রথা দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত ছিল, এবং কোনকালেই সমাজ থেকে তা একেবারে লুপ্ত হয়নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে দেখা যায়, অবস্থাবৈগুণ্যে এই প্রথা আরও একটু বেশী করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। দেশের মধ্যে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, তার ফলে মানুষ বিক্রি করা প্রায় স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দারিদ্র্যের চাপে মানুষ নিজের ছেলেমেয়ে, এমন কি স্ত্রী পর্যন্ত, ধনিকদের কাছে বিক্রি করে দিত গোলামির জন্য। তখনকার সংবাদপত্রে আমাদের নিজেদের দেশের এই মানুষ বিক্রির খবর যথেষ্ট পাওয়া যায়। কয়েকটি সংবাদ প্রাচীন 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি ঃ

> ১৮ জুন, ১৮২৫। কন্যা বিক্রয় কএক দিবস হইল মোং বর্দ্ধমান হইতে এক বৈষ্ণবী আপন দ্বাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা সমভিব্যাহারে মোং কলিকাতায় বাবু রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধের দান উপলক্ষে আসিতেছিল তাহাতে মোং ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া অবগত হইল যে শ্রাদ্ধ হইয়া দান সকলকে দিয়া বিদায় করিয়াছেন এজন্য ঐ বৈষ্ণবী ধন লোভে শ্রীযুত রাজা কিষণচাঁদ রায় বাহাদুরের নিকট যাইয়া ঐ কন্যাকে ১৫০ দেড় শত টাকায় আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া দেশে প্রস্থান করিয়াছে ইতি।

সংবাদটি অনেকদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রাদ্ধের দান উপলক্ষেও দেশের দরিদ্র লোকেরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের দান করতে কুণ্ঠিত হত না। রামদুলাল সরকার (দে) কলকাতার সুবিখ্যাত সাতুবাবু-লাটুবাবুর পিতা এবং আঠার শতকের শেষার্ধের কলকাতার বিখ্যাত বাঙালী ধনকুবের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বর্ধমানের এক দরিদ্র বৈষ্ণবী তার সুন্দরী কন্যাকে দান করতে আসছিল। কারণ রামদুলাল কেবল ধনপতি ছিলেন না, বৈষ্ণবকুলচূড়ামণিও ছিলেন।

সুতরাং তাঁর শ্রাদ্ধে দান হিসেবে কিছু উৎসর্গ করতে পারলে সাধারণ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের পক্ষে কৃতার্থ বোধ করা স্বাভাবিক। পুণ্যলোভাতুরা বৈষ্ণবী তাই তার সামান্য দান হিসেবে নিয়ে আসছিল কন্যাটিকে। বর্ধমান থেকে কলকাতা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ সে হেঁটেই আসছিল মনে হয়। তাই যথাসময়ে কলকাতায় পৌঁছনো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফরাসডাঙ্গায় (চন্দননগর) পৌঁছে সে শুনল যে রামদুলালের শ্রাদ্ধে দানধ্যানের পর্ব শেষ হয়ে গেছে। তখন বৈষ্ণবীর মনে পুণ্যলোভের বদলে অর্থলোভ দেখা দিল, এবং সে নিঃসংকোচে নগদ ১৫০৲ টাকায় কন্যাটিকে রাজা কিষণচাঁদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে বাড়ি চলে গেল। অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথার সঙ্গে গোলামিপ্রথা মিশ্রিত হলে যে কি কদর্য রূপ ধারণ করতে পারে, বর্ধমানের বৈষ্ণবীর এই কন্যাবিক্রি তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

১১ অক্টোবর ১৮৩৮। ভার্য্যা বিক্রয়।—শ্রীআনন্দচন্দ্র নন্দীর প্রমুখাৎ আমরা অবগত হইলাম যে জিলা বৰ্দ্ধমানের মধ্যে এক ব্যক্তি কলু অনেক দিবসাবধি বাস করিত সংপ্রতি বর্ত্তমান বৎসরে তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া মনে ২ মন্ত্রণা করিয়া আপন স্ত্রীকে বিক্রয় করিবার কারণ তত্রস্থ কোন স্থানে লইয়া গেল তাহাতে তত্রস্থ এক যুবা ব্যক্তি আসিয়া কএক টাকাতে তাহাকে ক্রয় করিল এ স্ত্রী দর্শনে বড় কুরূপা নহে এবং তাহার বয়ঃক্রম অনুমান বিংশতি বৎসর হইবেক যাহা হউক সেই কলুপো কএক টাকা পাইয়া ভার্য্যা দিয়া অনায়াসে গৃহে প্রস্থান করিল।

১১ জানুয়ারি ১৮৪০। আমরা শুনিলাম যে কলিকাতার এক জন জমীদার বারাণসী হইতে স্বগৃহে আগমন কালীন ভাগলপুরের বাজারে ৪০ টাকা মূল্যে এক গোলাম ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। এবং তিনি কহিলেন সে তদ্দিবসে সেই বাজারে দাসদাসী প্রায় ২০।২৫ জন বিক্রয় হইয়াছিল।

৮ আগষ্ট ১৮৩৫। গোলাম ক্রয় বিক্রয়করণের দণ্ড।—কলিকাতার মধ্যে প্রায় অনেক লোক আছেন গোলাম ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকেন অতএব তাঁহারা গত ১৩ জুলাই তারিখে বোম্বাইতে ঐ ব্যাপার নিমিত্ত যে মোকদ্দমা হয় তাহার... বিবরণ পাঠ করিয়া নিতান্ত সাবধান থাকিবেন যে ঐ অপরাধেতে কি পর্য্যন্ত দণ্ড না হয়। ইহার পূর্ব্বে গোলাম ক্রয় বিক্রয় করণেতে প্রায় অপরাধ ছিল না যে ছিল সে কিঞ্চিন্মাত্র। কিন্তু সংপ্রতি ঐ ব্যবসায় বিশেষতঃ ইঙ্গলণ্ড দেশে ও ভারতবর্ষের গবর্নমেণ্টের দ্বারা অতিশক্তাশক্তিরূপে নিষেধিত হইয়াছে। গোলামের স্থান উত্তরামেরিকা। এইক্ষণে যে কোন দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের পতাকা উড্ডীয়মানা সেই দেশে কদাচ গোলাম থাকিতে পারে না।

দেশীয় সংবাদপত্রের এই বিবরণগুলি থেকে সহজেই বোঝা যায়, আমাদের দেশে অন্তত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে, সমাজে গোলামিপ্রথার অত্যধিক প্রচলন হয়েছিল, এবং দারিদ্র্যই ছিল তার অন্যতম কারণ। আমাদের প্রাচীন গ্রামাসমাজের যে অর্থ-নৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছিল, কোম্পানির আমলের বাণিজ্য ও শাসননীতির ফলে তা দ্রুত ভাঙতে আরম্ভ করে। গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর ও গোষ্ঠীর লোক তাদের বংশগত বৃত্তি থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতে থাকে। গোলামিপ্রথা আবার এই সময় মাথা তুলে দাঁড়ায়, এবং তার ব্যাপক প্রসারও হতে থাকে। বিদেশী ইউরোপীয়রা গোলাম-ব্যবসায়ের মুনাফার লোভে এই প্রথা প্রসারে সাহায্য করেন। কেবল আফ্রিকা, মালয় প্রভৃতি দেশের গোলাম কেনাবেচা করে তাঁরা যে মুনাফা করেছেন তা নয়, বাংলাদেশ থেকেও অনেক গোলাম কিনে তাঁরা বিদেশে চালান দিয়েছেন।

১৭৮৫ সালে স্যার উইলিয়ম জোন্স কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলার রায় প্রসঙ্গে দাসত্বপ্রথা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

I am assured from evidence which, though not all judicially taken, has the strongest hold on my belief, that the condition of slaves within our jurisdiction is, beyond imagination, deplorable ; and that cruelties are daily practised on them, chiefly on those of the tenderest age and the weaker sex, which, if it would not give me pain to repeat and you to hear, yet for the honour of human nature I should forbear to particularize. If I except the English from this censure, it is not through partial affection to my own countrymen, but because my information relates chiefly to people of other nations, who likewise call themselves Christians. Hardly a man or a woman exists in a corner of this populous town, who hath not at least one slave child either purchased at a trifling price, or saved perhaps from a death that might have been fortunate, for a life that seldom fails of being miserable. Many of you, I presume, have seen *large boats filled with such children, coming down the river for open sale at Calcutta.* Nor can you be ignorant that most of them were stolen from their parents, or bought, perhaps, for a measure of rice in a time of scarcity.

উইলিয়ম জোন্সের এই উক্তির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী বলে এখানে তা অনেকটা উদ্ধৃত করা হল। তার উক্তির মর্ম এই : "আমাদের এখানে গোলামদের দুরবস্থার কথা আমি কিছু কিছু জানি, এবং তা এত মর্মান্তিক যে বলতে সংকোচ হয়। গোলামদের উপর প্রতিদিন এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হয়, বিশেষ করে বালক ও স্ত্রীলোকদের উপর, যে মানুষের মর্যাদার দিক থেকে আমি তার কোন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে রাজি নই। আমি এখানে ইংরেজদের কথা উল্লেখ করব না,

কারণ স্বজাতির প্রতি আমার যে দুর্বলতা আছে তা নয় ; আমি যতদূর জানতে পেরেছি, অন্যান্যরা যাঁরা নিজেদের খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দেন তাঁরাই গোলামদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেন বেশী। এই বিরাট জনবহুল কলকাতা শহরে এমন একজনও পুরুষ বা স্ত্রীলোক নেই, যাঁর অন্তত একটি গোলাম ছেলে বা মেয়ে নেই। তিনি খুব সামান্য মূল্যেই গোলামটি কিনেছেন, এবং খোঁজ করলে দেখা যাবে, হয়ত অন্নাভাবের কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য এই যাবজ্জীবন দুঃখের বোঝা গোলামটি অনিচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে। আপনারা অনেকেই জানেন নিশ্চয়ই, যে নদীর উপর দিয়ে নৌকা-বোঝাই গোলাম এখানে নিয়ে আসা হয় কলকাতার বাজারে বিক্রি করার জন্য। আপনারা এও জানেন যে এইসব গোলাম ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই তাদের বাপ-মা'র কাছ থেকে চুরি করে আনা হয়, অথবা দুর্ভিক্ষের সময় তাদের গোলামির জন্য বেচে দেওয়া হয়।"

আঠার শতকের শেষদিকে কলকাতা শহর যে বাংলাদেশের মধ্যে গোলাম কেনাবেচার সবচেয়ে বড় বাজারে পরিণত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাইরে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করে ইংরেজরাও গোলামির ব্যবসায়ে রীতিমত প্রলুব্ধ হয়েছিলেন, এবং তাঁদের মৌলিক মানবতাবোধটুকু পর্যন্ত মুনাফার বেদীমূলে উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হননি। আঠার শতকের শেষদিক থেকেই ইংলণ্ডে এই গোলাম-ব্যবসায়ের বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠতে থাকে। কোম্পানির ডিরেক্টররাও সে সম্বন্ধে অবহিত হন, এবং বাইরের বিভিন্ন উপনিবেশে তা বন্ধ করার চেষ্টা করতে থাকেন। বাংলাদেশ থেকে বাইরে গোলাম চালান দেওয়া বন্ধ করার জন্য তাঁরা ১৭৯৩ সালে এই মর্মে একটি ঘোষণা জারী করেন ঃ

PROCLAMATION

Whereas the Hon'ble Court of Directors for the affairs of the East India Company, in consequence of informa-

tion received by them from the Governor and Council at St. Helena, stating that sundry persons, natives of Bengal and other parts of India, had been unlawfully and unjustly sold as slaves at that Island, did direct an advertisement to be published in this Settlement for the discovery of such persons as had been guilty of the unlawful and inhuman conduct aforesaid, which advertisement was published accordingly on or about the 9th day of September, in the year 1793, by and under the orders of the Governor General in Council···in future all persons, in whose service natives shall embark from Bengal for England, will be required to give good and sufficient security against such natives being sold, or given away as slaves ·

এই ঘোষণা থেকে বোঝা যায়, ইংরেজরা এদেশের কাজকর্ম সেরে স্বদেশে ফিরে যাবার সময় দু'চারজন 'ব্ল্যাক নেটিব' সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। হোয়াইটদের বিচিত্র দেশ দেখাবার লোভ দেখিয়ে হয়ত ব্ল্যাকদের তাঁরা নিয়ে যেতেন, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য থাকত গোলাম হিসেবে ব্যবসায়ীদের কাছে তাদের বিক্রি করে দেওয়া। সেইজন্যই কোম্পানির ডিরেক্টররা তাঁদের ঘোষণায় জানিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের কোন লোককে কোন ইংরেজ যদি সঙ্গে করে ইংলণ্ডে নিয়ে আসেন, তাহলে তিনি যে তাকে গোলাম হিসেবে বিক্রি করবেন না, এই মর্মে একটি মুচলেখা দিতে হবে।

কলকাতার কাছে চন্দননগরে ফরাসীরাও যে গোলামের ব্যবসায়ে রীতিমত মেতে উঠেছিলেন, তা 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকার একটি বিবরণ থেকে বোঝা যায়। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৭৮৯, 'ক্যালকাটা গেজেট' লেখেন:

We understand Monsieur Montigny, Governor of Chandernagore, has lately issued a proclamation prohi-

biting all persons within the jurisdiction of the French Government from purchasing or transporting any of tha natives of these Provinces as slaves, and in order more effectually to prevent this infamous practice, a reward of forty Rupees is offered to any person who shall give information of the offender, besides the sum of ten Rupees to be given to each slave who shall be released in consequence. Both sums to be paid by the offender.

The Master Attendant of Chandernagore is also directed to see that no native be embarked without an order signed by the Governor, and all Captains of vessels trading to the port of Chandernagore are strictly prohibited from receiving any natives on board.

উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ইংলণ্ডে উইলবারফোর্স (Wilberforce) ও অন্যান্য সমাজ-সংস্কারকদের প্রবল আন্দোলনের ফলে গোলামিপ্রথার বিরুদ্ধে মানুষের বিবেকবুদ্ধি ক্রমে জাগ্রত হতে থাকে। ১৮০৭ সালে গোলাম-ব্যবসা (Slave Trade) বেআইনী ঘোষিত হয়। কিন্তু তার পরেও, সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে গোলামিপ্রথা একেবারে লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, সংস্কারকর্মীরা আন্দোলন থেকে বিরত হননি। ১৮৩৩ সালে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক দেশে, গোলামিপ্রথা বেআইনী ঘোষিত হয়। ঐ বছরেই উইলবারফোর্স মারা যান। ট্রেভেলিয়ান লিখেছেন: "Thus was Wilberforce rewarded for his complete honesty of purpose."

আরও প্রায় দশ বছর পরে ১৮৪৩ সালে গোলামিপ্রথা ভারতবর্ষে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকা এই আইন পাশ হবার পর উৎসাহিত হয়ে লেখেন:

আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্চম আইন দ্বারা ভারতবর্ষের দাসক্রয়ের রীতি রহিত হইল এবং এই ব্যবস্থা এতদ্দেশস্থ বহুতর দাসত্বকরিদিগের পক্ষে শুভদায়ক প্রযুক্ত আমরা অতি সম্মানপূর্ব্বক গ্রাহ্য করিলাম। ওএষ্ট ইণ্ডিয়ার গোলামদিগের উপর যেরূপ ভয়ানক অত্যাচার হয় এতদ্দেশীয় দাসগণের উপর যদিও তাদৃশ হয় না তথাচ ইহারা দাসত্ব জন্য মন্দ হইতে মুক্ত নহে, ফলতঃ আমরা দাসদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা ব্যবহার না করিলেও দাসত্বের স্বাভাবিক গুণে তাহাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া তাহারা সামান্য দ্রব্য পদার্থবৎ গণ্য হয় এবং মনুষ্য জাতি হইলে যে সকল বিষয়ে অধিকার হয় তাহা হইতেও চ্যুত হয়। হিন্দু এবং মুসলমান রাজার দ্বারা দাসত্বের রীতি স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহা ভয়ানক প্রকৃতিতেই হউক অথবা কোমল প্রকৃতিতে হউক এতৎকাল পর্য্যন্ত ছিল কিন্তু এক্ষণে ইংলণ্ডীয় শাসনকর্ত্তাদিগের দ্বারা লুপ্ত হওয়াতে ভারতবর্ষের ইতিহাস মধ্যে তাঁহাদিগের মহতী কীর্ত্তি থাকিলেও বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদেরও ইহাদ্বারা বিশেষ সুখ্যাতি হইল। যে সকল মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে ইংলণ্ডীয় লোকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন এবং পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় পুনঃ২ আন্দোলন করিয়াছেন এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের হানি হয়। মেষ্টর ডবলিউ এডেম, ব্রিটিস এণ্ড ফারেন এণ্টিশ্লেবারির রিপোর্টার ও অন্যান্য সংবাদপত্র সম্পাদকেরা এতদ্বিষয়ে অনেক যত্ন করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তিরা এই অহিতজনক দাসত্ব ব্যবহারের মন্দতা ও অনিষ্টতা দর্শাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিরাকাঙ্ক্ষ পরিশ্রম আমরা যাবৎ যথার্থ বিচার ও দয়ার উপকার জ্ঞান থাকিবেক তাবৎ স্মরণ করিব।

কিন্তু যত্তবধি দাসত্ব মোচনের এই আইন গোলামেরদের উত্তমরূপে বোধগম্য না হইবেক তদবধি তাহারা এই ব্যবস্থার উপকার ভোগ করিতে পারিবেক না; এক্ষণে সকল দাসরক্ষকেরা গোলামদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন এবং তাহাদিগের দ্বারা পূর্ব্ববৎ অন্যায় কর্ম্ম করিয়া লইয়া তাহার ফলভোগ করিবেন, অতএব আমাদের প্রার্থনা এই যে উক্ত আইন যাহাতে ফলদায়ক হয় সাবধানপূর্ব্বক তাহার উপায় সৃষ্ট হউক যেন

গোলামদিগের অনভিজ্ঞতায় বা তাহাদের স্বামিদিগের অন্যায় দ্বারা ইহার কর্ম্ম নষ্ট হয় না, আর সকল প্রদেশে ইহা উত্তমরূপে প্রকাশিত হউক এবং যাহারা ইহার উল্লঙ্ঘন করিবেন তাহাদিগের প্রতি যথোচিত দণ্ডাজ্ঞা হউক। (বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ১ মে ১৮৪৩)।

স্পেক্টেটর যে আশঙ্কা করেছিলেন তা অনেকটা ঠিক। দাসত্ববিরোধী আইন পাশ হবার পরেও অনেকদিন ধরে শাসকদের আইনচক্ষুর অন্তরালে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। লুকিয়েচুরিয়ে দেশের লোক গোলাম রাখতেন ; এবং কেনাবেচাও করতেন। অনেক জায়গায় জমিদারীপ্রথার সঙ্গে গোলামিপ্রথা প্রচ্ছন্নভাবে জড়িত ছিল বলে তা লোপ পেতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। তবে কলকাতা শহরে উনিশ শতকের মাঝামাঝির পর থেকে, গোলাম রাখার ও বেচাকেনার পর্ব নিশ্চিতভাবে শেষ হয়ে গিয়েছিল মনে হয়।

কুলি-মজুর। আমরা যে-সময়ের কথা বলছি তখন ঠিক মজুরশ্রেণীর বিকাশ হয়নি। কারণ কলকারখানা তখনও তেমন গড়ে ওঠেনি। তবু বিদেশ থেকে দু'একটি করে কল তখনই আসতে আরম্ভ করেছিল, এবং কল হিসেবে তা নিতান্তই আদিকালের কল হলেও, হাতের বদলে কলের সাহায্যে আমাদের দেশে সেই সময়েই সর্বপ্রথম পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন আরম্ভ হয়েছিল। অর্থাৎ 'ম্যানুফ্যাকচারের' বদলে 'মেসিনোফ্যাকচারের' যুগের অভ্যুদয় হচ্ছিল তখন। হাতের জিনিসের বদলে কলের জিনিসের যুগ আসছিল। কলের এই প্রথম ঐতিহাসিক আবির্ভাবের কথা তখনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল এইভাবে ঃ

১১ মার্চ ১৮২৬। তণ্ডুল সম্পাদক নূতন যন্ত্র। অর্থাৎ ধানভানা কল।—১৫ ফেব্রুআরি বুধবার এগ্রিকলটিউর সোসৈয়িটি অর্থাৎ কৃষিবিদ্যাবিষয়ক সমাজের এক সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় ডেবিড স্কাট সাহেব কর্তৃক প্রেরিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত ব্রহ্মদেশে ব্যবহৃত তণ্ডুলনিষ্পাদক

একপ্রকার যন্ত্র অর্থাৎ যাঁতাকল সকলে দর্শন করিলেন ঐ যন্ত্রে প্রতিদিন কেবল দুই জন লোকে ১০ দশ মোন তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে পারে তাহার একজন কল নাড়ে ইহাতে পরস্পর শ্রান্তিযুক্ত হইলে ঐ কর্ম্মের পরিবর্ত্তন করে এতদ্দেশে ঢেঁকি যন্ত্রে তিন জন বিনা অর্দ্ধমোনের অধিক তণ্ডুল হওয়া দুষ্কর আর তাহারা পরিশ্রান্ত হইলেই ঢেঁকি বন্ধ হয়।

৮ আগস্ট ১৮২৯। কলিকাতার গঙ্গাতীরস্থ কল।—যে কল কএক মাসাবধি কলিকাতার গঙ্গাতীরের রাস্তার উপর প্রস্তুত হইতেছিল তাহা সংপ্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কলিকাতাস্থ লোকদিগকে সুজি যোগাইয়া দিতে আরম্ভ করা গিয়াছে। এই কলের দ্বারা গোম পেষা যাইবে ও ধান ভানা যাইবে ও মর্দ্দনের দ্বারা তৈলাদি প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল কার্য্যে ত্রিশ অশ্বের বল ধারি বাষ্পের দুইটা যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। এতদ্দেশীয় অনেক লোক এই আশ্চর্য্য বিষয় দর্শনার্থে যাইতেছেন এবং আমরা আপনাদের সকল মিত্রকে এই পরামর্শ দি যে তাঁহারা এই অদ্ভুত যন্ত্র বাষ্পের দ্বারা ২৭ ঘণ্টার মধ্যে দুই হাজার মোন গোম পিষিতে পারে তৎস্থানে গমন করিয়া তাহা দর্শন করেন

নতুন কল এসেছে কলকাতা শহরে, 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় সেই সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে। একটি কাষ্ঠনির্মিত চালের কল, আর-একটি সুজি-ময়দা-তেলের কল। চালের কলে দু'জন লোক প্রতিদিন দশ মণ চাল তৈরি করতে পারে, কিন্তু ঢেঁকিতে তিনজন লোকের পক্ষে আধমণ চাল করাই কঠিন হয়ে ওঠে। লোকে ভাবে, কলের কি আশ্চর্য মাহাত্ম্য! বাহাদুরি আছে ইংরেজের কলের। "একজন কল নাড়ে," "আর-একজন চাল দেখে", এবং তাতেই সারাদিনে কল থেকে দশ মণ চাল বেরিয়ে আসে। গঙ্গাতীরে আরও একটি কল এসেছে, তার ক্ষমতা আরও বিস্ময়কর। কলকাতার লোক সেই কলের তৈরি সুজি খেতে আরম্ভ করেছে। কেবল সুজি নয়, সেই কলে গম পেষা হয়, ধানভানা হয়, এবং সরিষা মর্দন করে তৈলও নিষ্কাশন করা হয়। হবারই কথা, কারণ তিরিশ অশ্ববলের (horse power) দু'টি

গোলামদিগের অনভিজ্ঞতায় বা তাহাদের স্বামিদিগের অন্যায় দ্বারা ইহার কর্ম্ম নষ্ট হয় না, আর সকল প্রদেশে ইহা উত্তমরূপে প্রকাশিত হউক এবং যাহারা ইহার উল্লঙ্ঘন করিবেন তাহাদিগের প্রতি যথোচিত দণ্ডাজ্ঞা হউক। (বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ১ মে ১৮৪৩)।

স্পেক্টেটর যে আশঙ্কা করেছিলেন তা অনেকটা ঠিক। দাসত্ববিরোধী আইন পাশ হবার পরেও অনেকদিন ধরে শাসকদের আইনচক্ষুর অন্তরালে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। লুকিয়েচুরিয়ে দেশের লোক গোলাম রাখতেন; এবং কেনাবেচাও করতেন। অনেক জায়গায় জমিদারীপ্রথার সঙ্গে গোলামিপ্রথা প্রচ্ছন্নভাবে জড়িত ছিল বলে তা লোপ পেতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। তবে কলকাতা শহরে উনিশ শতকের মাঝামাঝির পর থেকে, গোলাম রাখার ও বেচাকেনার পর্ব নিশ্চিতভাবে শেষ হয়ে গিয়েছিল মনে হয়।

কুলি-মজুর। আমরা যে-সময়ের কথা বলছি তখন ঠিক মজুরশ্রেণীর বিকাশ হয়নি। কারণ কলকারখানা তখনও তেমন গড়ে ওঠেনি। তবু বিদেশ থেকে দু'একটি করে কল তখনই আসতে আরম্ভ করেছিল, এবং কল হিসেবে তা নিতান্তই আদিকালের কল হলেও, হাতের বদলে কলের সাহায্যে আমাদের দেশে সেই সময়েই সর্বপ্রথম পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন আরম্ভ হয়েছিল। অর্থাৎ 'ম্যানুফ্যাকচারের' বদলে 'মেসিনোফ্যাকচারের' যুগের অভ্যুদয় হচ্ছিল তখন। হাতের জিনিসের বদলে কলের জিনিসের যুগ আসছিল। কলের এই প্রথম ঐতিহাসিক আবির্ভাবের কথা তখনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল এইভাবে ঃ

১১ মার্চ ১৮২৬। তণ্ডুল সম্পাদক নূতন যন্ত্র। অর্থাৎ ধানভানা কল।—১৫ ফেব্রুআরি বুধবার এগ্রিকলটিউর সোসৈয়িটি অর্থাৎ কৃষি বিদ্যাবিষয়ক সমাজের এক সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় ডেবিড স্কাট সাহেব কর্তৃক প্রেরিত কাষ্ঠ নির্ম্মিত ব্রহ্মদেশে ব্যবহৃত তণ্ডুলনিষ্পাদক

একপ্রকার যন্ত্র অর্থাৎ যাঁতাকল সকলে দর্শন করিলেন ঐ যন্ত্রে প্রতিদিন কেবল দুই জন লোকে ১০ দশ মোন তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে পারে তাহার একজন কল নাড়ে ইহাতে পরস্পর শ্রান্তিযুক্ত হইলে ঐ কর্ম্মের পরিবর্ত্তন করে এতদ্দেশে ঢেঁকি যন্ত্রে তিন জন বিনা অর্দ্ধমোনের অধিক তণ্ডুল হওয়া দুষ্কর আর তাহারা পরিশ্রান্ত হইলেই ঢেঁকি বন্ধ হয়।

৮ আগস্ট ১৮২৯। কলিকাতার গঙ্গাতীরস্থ কল।—যে কল কএক মাসাবধি কলিকাতার গঙ্গাতীরের রাস্তার উপর প্রস্তুত হইতেছিল তাহা সংপ্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কলিকাতাস্থ লোকদিগকে সুজি যোগাইয়া দিতে আরম্ভ করা গিয়াছে। এই কলের দ্বারা গোম পেষা যাইবে ও ধান ভানা যাইবে ও মর্দ্দনের দ্বারা তৈলাদি প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল কার্য্যে ত্রিশ অশ্বের বল ধারি বাষ্পের দুইটা যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। এতদ্দেশীয় অনেক লোক এই আশ্চয্য বিষয় দর্শনার্থে যাইতেছেন এবং আমরা আপনারদের সকল মিত্রকে এই পরামর্শ দি যে তাঁহারা এই অদ্ভুত যন্ত্র বাষ্পের দ্বারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই হাজার মোন গোম পিষিতে পারে তৎস্থানে গমন করিয়া তাহা দর্শন করেন।

নতুন কল এসেছে কলকাতা শহরে. 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় সেই সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে। একটি কাষ্ঠনির্মিত চালের কল, আর-একটি সুজি-ময়দা-তেলের কল। চালের কলে দু'জন লোক প্রতিদিন দশ মণ চাল তৈরি করতে পারে, কিন্তু ঢেঁকিতে তিনজন লোকের পক্ষে আধমণ চাল করাই কঠিন হয়ে ওঠে। লোকে ভাবে, কলের কি আশ্চর্য মাহাত্ম্য! বাহাদুরি আছে ইংরেজের কলের। "একজন কল লাড়ে," "আর-একজন চাল দেখে", এবং তাতেই সারাদিনে কল থেকে দশ মণ চাল বেরিয়ে আসে। গঙ্গাতীরে আরও একটি কল এসেছে, তার ক্ষমতা আরও বিস্ময়কর। কলকাতার লোক সেই কলের তৈরি সুজি খেতে আরম্ভ করেছে। কেবল সুজি নয়, সেই কলে গম পেষা হয়, ধানভানা হয়, এবং সরিষা মর্দন করে তৈলও নিষ্কাশন করা হয়। হবারই কথা, কারণ তিরিশ অশ্ববলের (horse power) দু'টি

বাষ্পীয় যন্ত্র কলটিকে চালায়। "এতদ্দেশীয় অনেক লোক এই আশ্চর্য্য বিষয় দর্শনার্থে যাইতেছেন।" যাবারই কথা, কারণ কলের এমন অপূর্ব মাহাত্ম্য এদেশের লোক দেবদেবীদেরও প্রকাশ করতে দেখেননি। তাই দেবীদর্শনের মতন তারা দলে দলে গঙ্গাতীরে কলদর্শন করতে যাচ্ছিল।

১৮ আশ্বিন, ১২৬০ 'সংবাদ প্রভাকর' সংবাদ দিচ্ছেন যে বহুবাজারের বিখ্যাত ধনিক রাজেন্দ্র দত্তের হৌসে আমেরিকা থেকে ছয়টি "অত্যাশ্চর্য্য নূতন কল" এসেছে। তাতে অল্প সময়ের মধ্যে "জামা, চাপকান, ইজার, পেণ্টলুন" প্রভৃতি নানারকমের পোষাক ও "গনিচটের" থলে পর্যন্ত সেলাই হয়ে থাকে। অতএব প্রভাকর বলছেন, "ঐ কলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে মনুষ্যের কত উপকার হইবেক তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য"— এবং "ঐ যন্ত্র দর্শনার্থ অনেকেই গমন করিতেছেন, আমারদিগের কোন কোন বন্ধু তদ্দ্বারা কাপড় সেলাই করিয়া লইয়া সেলাই দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়াছেন।"

কিন্তু শুধু কি কৌতূহলী দর্শকের ভিড় হচ্ছিল কল দেখতে? কলে যারা কাজ করছিল তারা কারা? কাষ্ঠনির্মিত ধানভানা কলে, তিরিশ অশ্ববলের ময়দার কলে ও তেলের কলে, আমেরিকার সেলাইকলে, এদেশের লোক যারা সেদিন কাজ করতে গিয়েছিল, তাদের মেহনত বেচে জীবিকা অর্জনের জন্য, তারাই হল আমাদের দেশের আধুনিক শ্রমশিল্পযুগের প্রথম 'মজুর'। একটা পূর্ণাঙ্গ সামাজিক শ্রেণীরূপে তাদের বিকাশ তখনও কলকাতা শহরে ও তার আশপাশে হয়নি। তা না হলেও, এদেশের দরিদ্র গ্রামবাসীদের নাগরিক মজুরশ্রেণীতে রূপায়ণ তখন থেকেই যে আরম্ভ হয়েছিল, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। বৈদেশিক পরাধীনতার জন্য যন্ত্রশিল্পের বিকাশ আমাদের দেশে যথানিয়মে হয়নি বলে, গ্রামাঞ্চলের বংশবৃত্তি থেকে উৎখাত যাযাবররা এবং অন্যান্য নিঃস্ব ও দরিদ্রশ্রেণীর লোকেরা নতুন শহরের নতুন মজুরশ্রেণীতে পরিণত হতে পারেনি। তাদের সে ঐতিহাসিক পরিণতির পথে বিদেশী শাসকরা অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন অনেক। তার ফলে তারা শহর ও

শহরতলীতে এসে ভিড় করেছে বটে, কিন্তু নতুন নতুন কলকারখানার মজুর হিসেবে নয়, তার চেয়েও অধম ও অসহায় কুলি হিসেবে। তাই দেখা যায়, নতুন শহর কলকাতায় নতুন যুগে যে নাগরিক প্রলেটারিয়েট গড়ে উঠেছিল, অন্তত উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত, তারা কারখানার মজুরশ্রেণী নয়, স্থান থেকে স্থানান্তরে সদাভাসমান দিনমজুর কুলিশ্রেণী।

পুরনো সরকারী দলিলপত্র ও অন্যান্য বিবরণ থেকে সেদিনের কুলিদের অবস্থার কথা বিশদভাবে জানা যায়। উনিশ শতকের তিরিশ-চল্লিশে অ্যাডভোকেট জনসন কলকাতার কুলিদের সম্বন্ধে লিখেছেন :

> Hundreds of them are waiting in the streets to be hired ; and though, like all Hindoos, they make a most Babel-like noise over their work, and require four to carry that which one English porter would think nothing of, yet they are careful carriers, and generally trust-worthy. I had all my furniture removed to another house, three miles distant, by one hundred *coolies*, for whose services I paid twenty-five rupees.

জনসন সাহেব একশ কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে বাড়ি বদল করেছিলেন। তিন মাইল দূর পর্যন্ত মাল বয়ে নিয়ে গিয়ে তারা চার আনা করে মজুরি পেয়েছিল। সুতরাং শত শত কুলি যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে, এবং লোক দেখলে বোঝা বইবার জন্য হল্লা করে, তা হলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কলকাতা শহরে কলকারখানা গড়ে উঠতে দেরী হলেও, ঘরবাড়ি ও পথঘাট নির্মাণের কাজ আঠার শতকের গোড়া থেকেই আরম্ভ হয়েছিল, এবং ক্রমেই দিন দিন তা বেড়েছিল ছাড়া কমেনি। নতুন শহর কলকাতার বাইরের এই বিরাট দৈহিক নির্মাণকার্যে সেদিন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয়েছিল হাজার হাজার মেহনতী কুলির। কলকাতার নতুন নতুন রাস্তা ও ঘরবাড়ি নিয়ে যে বিরাট প্রাসাদপুরী গড়ে উঠতে

আরম্ভ করেছিল, তাতে ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য মিস্ত্রীদের দান থাকলেও, দরিদ্র কুলিদের সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। প্রাসাদপুরী কলকাতার কঙ্কাল কুলিদের মেহনতেই গড়ে উঠেছিল বলা চলে।

কোম্পানির নতুন ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লা নির্মাণের হিসেবপত্র ও বিবরণ থেকে আঠার শতকের দ্বিতীয় দশকে কুলিদের অবস্থা কি ছিল তা জানা যায়। ১৭৯৭, ১৩ জুন তারিখের কৌন্সিলের প্রসিডিংসে কুলিদের নিয়োগ-পদ্ধতি ও মজুরি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, কেল্লার কুলিদের মজুরি দেওয়া নিয়ে প্রায়ই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। তার কারণ, কুলিদের মজুরি দেওয়া হয় কড়িতে এবং তাও তাদের হাতে সোজাসুজি দেওয়া হয় না, সর্দারদের মারফৎ দেওয়া হয়। সর্দাররা ও বেনিয়ারা কুলিদের মজুরির একাংশ নিজেদের কমিশন হিসেবে আত্মসাৎ করে। কুলিদের কাছে খোঁজ করে দেখা গেছে যে, তাদের প্রতিদিনের মজুরি থেকে ১৫।২০ কড়ি করে কেটে তাদের নেওয়া হয়। সর্দার বা বেনিয়াদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে যে এটা দেশের রীতি ও ন্যায্য প্রাপ্য—

> ···The Bunnyas and head-men have the conveniency of stopping a small number out of each man's share, which they call custom, and the coolies have complained to me that 15 or 20 cowries per day have been deducted in this manner : but these and a great many other had methods might be broke which at present is called custom, the Company would then be better served and the coolies satisfied, they would then continue in the works, learn any method that would be desired, and we should not have fresh coolies to teach every day. (*Proceedings*, June 13, 1757.)

কোম্পানির কাজকর্ম্মে কুলিদের এমনিতেই খুব বেশী মজুরি দেওয়া

হত না, বাইরের মজুরির তুলনায় কিছু কম মজুরিতেই তাদের কোম্পানির কাজকর্ম করতে হত। কতকটা সরকারী কাজের মতন তার বিশেষ আকর্ষণ কুলিদের কাছেও ছিল। কিন্তু সেই কম মজুরি থেকেও যখন সর্দার ও বেনিয়ারা কিছুটা ভাগ বসাত, তখন কাজ ছেড়ে দিয়ে তাদের স্থানান্তরে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকত না। শুধু কেল্লা নির্মাণের কাজেই কুলিদের এরকম বারবার চলে যেতে হয়েছে, এবং কোম্পানির কাজে তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে অনেক। অথচ কেল্লা নির্মাণের জরুরী প্রয়োজনীয়তাও ছিল তখন যথেষ্ট। তাই কোম্পানির কর্তারা শেষ পর্যন্ত আদেশ জারী করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে কলকাতার কোন নাগরিক তাঁর ব্যক্তিগত কাজের জন্য কুলি বা মিস্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন না। কৌন্সিলের যে বৈঠকে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন তার বিবরণ এই ঃ

> The Committee of Works send in a letter to the Board informing us of the difficulty they find in getting laborers and artificers for the fortifications, and desiring the Board will take some method to get them people to carry on the works. Ordered, their letter be entered and that they advertise no artificers shall be employed by the private inhabitants after the first day of February. As to laborers, the Board imagine with proper encouragement a sufficient number may be procured after the harvest of paddy is over. (*Proceedings*, January 3, 1758.)

দীর্ঘদিন ধরে কোম্পানির কর্তারা এই কুলি সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। ১৭৬০, ১০ মার্চ তারিখের সভার বিবরণে তাই দেখা যায়, তাঁরা কালেক্টারকে আদেশ দিচ্ছেন, কেল্লার কাজের জন্য ৮০০০ কুলি জোর করে সংগ্রহ করতে। তাঁদের প্রস্তাবটি এই ঃ

The works being much retarded for want of coolies, and the farmers not complying with their agreement—Ordered the Collector to send peons into the pergunnahs and to bring up by force 8,000, if to be procured.

এই প্রস্তাব থেকে বোঝা যায়, কলকাতার কালেক্টররা মধ্যে মধ্যে পেয়াদা পাঠিয়ে গ্রামাঞ্চল থেকে লোকজনদের জোর করে শহরে ধরে নিয়ে আসতেন কুলির কাজ করার জন্য। সাধারণত অবশ্য কোম্পানির কাজের জন্যই তাদের উপর জুলুম করা হত। নগর নির্মাণের আদিপর্বে এইভাবে জোরজুলুম করেই গ্রামের দরিদ্র কৃষি-জীবীদের, মনে হয়, কলকাতা শহরে কুলিশ্রেণীতে পরিণত করা হয়েছে। তখন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল থেকেও যে অনেক নিঃস্ব কৃষককে কলকাতায় কুলির কাজের জন্য ইংরেজ জমিদাররা জোর করে আমদানি করেছিলেন, তা অনুমান করা অসংগত নয়। কেবল বিহারের গ্রামাঞ্চল থেকেই কুলিরা নতুন শহর কলকাতায় আসেনি। পরে বাংলার কৃষকেরা বাংলার গ্রামে ফিরে গিয়ে হয়ত ক্ষেতমজুরি করাকে অনেক বেশী বাঞ্ছনীয় মনে করেছে, নগরের নিষ্ঠুর কুলিমজুরির চেয়ে। বিহারীদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে কলকাতা শহরের রাস্তাঘাটের ও ঘর-বাড়ির উন্নয়নকর্ম দ্রুতগতিতে আরম্ভ হয়। প্রধানত 'লটারি কমিটির' (Lottery Committee) উদ্‌যোগেই কলকাতা শহরের এই উন্নয়ন-পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা হয়। লটারি কমিটির অপ্রকাশিত হাতে-লেখা বিবরণীর মধ্যে কলকাতার কুলিদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কুলিদের মেহনতের মজুরি কি হারে দেওয়া হত সে-সম্বন্ধে অনেক তথ্য কমিটির রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়। ১৮২০, ২০ জুলাই তারিখের রিপোর্টে

দেখা যায়, কমিটির কর্তারা গবর্নমেণ্টকে কলকাতার 'ডিঙ্গাভাঙ্গা' খাল বুজিয়ে ফেলার জন্য যে কুলিখরচ হবে, তার একটি হিসেব দাখিল করছেন। বর্তমান ওয়েলিংটন স্কয়ারের (সুবোধ মল্লিক স্কয়ার) উত্তরদিক দিয়ে, বিদ্যাধরী নদী থেকে গঙ্গা পর্যন্ত পুব থেকে পশ্চিমে বহমান একটি বড় খাল ছিল, তারই নাম 'ডিঙ্গাভাঙ্গা খাল।' হয়ত কোন ডিঙ্গা একদা এই খালে ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাই সাধারণ লোক তার নামকরণ করেছিল 'ডিঙ্গাভাঙ্গা'। পরে এই খাল বুজিয়ে যে রাস্তা করা হয় তারই নাম 'ক্রীক রো' ('ক্রীক' কথার অর্থ নালা বা খাল)।

কমিটি খাল ভর্তি করার হিসেবে বলেন যে চারমাসের জন্য ২০০ কুলি লাগবে। এই ২০০ কুলির মাসিক মজুরি ৭৫০ টাকা, অতএব চারমাসে কুলিমজুরি বাবদ খরচ হবে ৩০০০৲ টাকা। প্রত্যেক কুলির মাসিক মজুরি হয় তাহলে তিন টাকা বার আনা, এবং দৈনিক মজুরি হয় দুই আনা মাত্র। কুলিদের এই মজুরির কথা রিপোর্টের আরও অনেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮২০, ৭ সেপ্টেম্বর তারিখের রিপোর্টে ধর্মতলার উত্তরদিক ইটবাঁধানোর জন্য যে কুলিখরচ হয়েছিল তার হিসেব এই:

জুন ১৮২০ : ১৩০০ কুলি : মাসিক ৩৸০ হারে
জুলাই ১৮২০ : ১৫৬০ কুলি : মাসিক ৩৸০ হারে
আগস্ট ১৮২০ : ১৫৮১ কুলি : মাসিক ৩৸০ হারে

উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত কুলিদের এই মজুরির হারের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। অনেক দিন পর্যন্ত দু'আনা করেই তাদের দৈনিক মজুরি ধার্য ছিল।

কুলিদের তখন একটি বড় কাজ ছিল, পাকা রাস্তার জন্য খোয়া ভাঙা। এখনও অবশ্য সব কাজের জন্যই তাদের খোয়া ভাঙতে হয়, কিন্তু উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও অন্যান্য গ্রামের মেঠোপথগুলি যখন ইটখোয়ার পাকা রাস্তায় রূপান্তরিত

হয়ে নাগরিক মূর্তি ধারণ করছিল, তখন খোয়াভাঙার কাজটা এক বিরাট মহাযজ্ঞের মতন ব্যাপার ছিল বলা চলে। কুলিমজুর দিয়ে তখন খোয়াভাঙানোর কাজটাই নগরকর্তাদের কাছে সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয় ছিল। লটারি কমিটির রিপোর্টে কলকাতার রাস্তার একটি সুন্দর বিবরণ আছে। ১৮২০, ২ মে তারিখে কমিটির কাছে প্রেরিত একটি স্মারকলিপিতে রাস্তার খোয়াখরচ কমাবার জন্য প্রস্তাব করে বলা হয়েছে—"for the introduction of a more Economical mode of making *koah* for the repairs of the Roads of Calcutta and its vicinity." স্মারকলিপিতে নগরকর্তারা ১০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন "for an approved machine for making *koah*," এবং একথাও বলেছেন যে—

> ...at present all Koah for the repairs of Roads in the Town is made by breaking up Bricks into small pieces, the manual labour which is very great and the expense of the article proportionately heavy.
>
> The Koah is made from Bricks formed in moulds after the English fashion which also adds to the expense. I imagine it would be equally well, if the better, made from Bricks used by the natives, which for their thinness are more easily burnt, and consequently more durable than those made in the English made.

স্মারকলিপিতে একটি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। কলকাতা শহরের রাস্তার জন্য তখন যে ইঁট থেকে খোয়া তৈরি করা হত, তা ইংরেজী ধাঁচের ও ছাঁচের তৈরি। সেগুলি বেশী পুরু বলে তা ভাঙতে কুলিখরচও হত বেশী। কিন্তু আমাদের দেশে যে ইঁট তৈরি হত, তা পাতলা ও হালকা বলে ভাঙতে কষ্ট হত না, এবং পোড়াতেও বেশী

সময় লাগত না। লিপিতে তাই এদেশী ইঁট ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৮১৪-১৬ সালে গবর্নমেণ্টের কাছে প্রেরিত লটারি কমিটির রিপোর্টে দেখা যায়, প্রত্যেক বছরে তখন কলকাতার রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য প্রায় ১২০ লক্ষ ইঁট খরচ হত, তার মধ্যে তিনভাগের দু'ভাগ ইঁট লাগত খোয়ার জন্য। খোয়াভাঙার খরচেরও একটা হিসেব পাওয়া যায় রিপোর্টের মধ্যে। ৩৬০০ ইঁট ভাঙতে কুলিদের ২৲ টাকা করে দেওয়া হত। এই হারে একলক্ষ ইঁট ভাঙতে লাগত ৫৫৷৴০, এবং ৮০ লক্ষ ইঁট ভাঙতে লাগত ৪৪৪৫৲ টাকা। এদেশী ইঁট ব্যবহার করলে এই খরচ অনেক কমানো যেতে পারে বলে নগরকর্তারা সুপারিশ করেছেন। কুলিদের হাড়ভাঙা খাটুনির জন্য তাঁরা যে বেদনা বোধ করেছিলেন তা নয়, তাদের মজুরি বাবদ বেশী খরচ হচ্ছিল বলে ইংরেজী-ছাঁচের ইঁটে খোয়া ভাঙানোতে তাঁদের আপত্তি ছিল।

কলকাতার ক্রীতদাস ও কুলিমজুরদের কথা এইখানেই আমরা শেষ করছি। যারা জল টানে ও কাঠ কাটে, সভ্যতার ইতিহাসে তাদের কথা সামান্য কালো কালির অক্ষরেও লেখা থাকে না। কলকাতার অবশ্য কোন ইতিহাস নেই, তবে ইতিহাসের নামে যে-সব ইতিকথা আছে তাতেও কোথাও এদের কথা বিশেষ লেখা নেই। স্তূপাকার সরকারী নথিপত্রের মধ্যে ইতঃস্তত যে-সব বিবরণ ছড়িয়ে আছে, তাই জোড়া দিয়ে একটি চিত্র রচনা করা হয়েছে এখানে। চিত্রটি স্বভাবতঃই নিখুঁত ও অখণ্ড হয়নি। না হলেও ক্ষতি নেই এইজন্য যে, যাদের কথা এখানে বলা হয়েছে তাদের জীবনেও কোথাও অখণ্ডতা নেই। অথচ এই ক্রীতদাস ও কুলিমজুররাই কলকাতা শহরে আমাদের প্রথম নাগরিক জীবনের বনিয়াদ গড়ে তুলেছিল—বন কেটে, জল টেনে, আরামের খোরাক যুগিয়ে, খোয়া ও পাথর ভেঙে ভেঙে।

নতুন শহরে পুরাতন ভৃত্য

'ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর' বলতে একনিমেষে যাদের চেহারা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তাদের আর আজকের কলকাতা শহরে বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ তারা হল সেকালের 'নতুন শহর' কলকাতার 'পুরাতন ভৃত্য।' কলকাতায় আজ এমন কোন মধ্যবিত্ত পরিবার আছেন কিনা সন্দেহ, যাঁরা গৃহভৃত্যের দৈনন্দিন সমস্যায় জর্জরিত নন। উচ্চবিত্ত পরিবারেও সমস্যাটি প্রায় একরকমের। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত, সকল শ্রেণীর শহুরে ভদ্রলোকের একঘেয়ে অভিযোগ হল—ভৃত্যদের প্রভুভক্তি দ্রুত কমে যাচ্ছে, ক্রমে তারা স্বাধীনচেতা, দুর্বিনীত ও উদ্ধতস্বভাব হয়ে উঠছে। উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকেরা কতকটা বংশানুক্রমে ভৃত্যনির্ভর আয়েসী জীবন যাপন করে এসেছেন, এবং তাঁদের সামাজিক 'Paraphernalia of Gentility'-র প্রধান উপকরণের যোগান দিয়েছে ভৃত্যরা। আজকে তাঁদের সেই ভদ্রতার সাজ-সরঞ্জামের এতবড় একটি উপকরণ প্রায় বাতিল হয়ে যেতে বসেছে বলে, তাঁরা ভৃত্যদের উপর তিতবিরক্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁদের আয়েস নয় শুধু, বাইরের কেতাদুরস্ততা পর্যন্ত বজায় রাখা আজ কঠিন হয়ে উঠেছে। 'বেত' সম্বন্ধে তো বটেই, 'বেতন' সম্বন্ধেও ভৃত্যরা আজ

সচেতন হয়েছে। আজ যদি বাবুরা কেউ তাঁদের ভৃত্যকে বলেন, 'পাজি, বেরো তুই আজি দূর করে দিনু তোরে', তাহলে তিনি নিশ্চয়ই একথা বলার আর সুযোগ পাবেন না যে, 'পরদিন উঠে দেখি, হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি'—এবং

প্রসন্ন মুখ, নাহি কোন দুখ, অতি অকাতরচিত্ত—
ছাড়ালে না ছাড়ে, কি করিব তারে, মোর পুরাতন ভৃত্য।

ছাড়াবার অনেক আগেই ভৃত্যরা আজকাল ছেড়ে চলে যায়, এবং 'প্রসন্নমুখ', 'অকাতরচিত্ত' ভৃত্য আজকাল নির্ভেজাল গব্যঘৃতের চেয়েও অনেক বেশী দুর্লভ্য। কালের যাত্রায়, পরিবর্তনের স্রোতে সেই সব সেকালের ভৃত্য সমাজের নদীর উপর দিয়ে বন্যার বেগে ভেসে চলে গেছে। ভদ্রলোকের ভদ্রতার মুখের দিকে চেয়ে সমাজের গতি থিতিয়ে থাকেনি, থাকেও না কখনও। আজকের ভৃত্যবিলাপ তাই বৃথা। বৃথা বলেই সেকালের নতুন শহরের পুরাতন ভৃত্যদের কথা আজ অনেকটা কাল্পনিক কাহিনী বলে মনে হয়। সাহেব-নবাবদের মতন সেকালের নতুন শহরের নতুন সমাজে পুরাতন ভৃত্যদের উদ্ভব হয়েছিল। অন্যান্য সামাজিক জনশ্রেণীর মতন আজ তাদেরও ঐতিহাসিক প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সামাজিক শ্রেণী হিসেবে আজও তারা একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ইংলণ্ডেও চাকুরিজীবীদের মধ্যে ভৃত্যদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী। এই সময় ইংলণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে, এবং তার ফলে ভৃত্যশ্রেণীর চাহিদা ও সরবরাহ দুইই বেড়ে যায়। শিল্পবাণিজ্যের বিস্তারের ফলে সমাজে নতুন মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বিকাশ হতে থাকে, অখ্যাত-অজ্ঞাতরা অর্থলাভের স্বাধীন সুযোগ পেয়ে নতুন সামাজিক মর্যাদা লাভ করতে থাকেন, এবং

নতুন নতুন ধনিক, সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবারের উৎপত্তি হতে থাকে। শিল্পযুগের নতুন সঙ্গতিপন্ন বণিকশ্রেণী, আভিজাত্যের ক্ষেত্রে, সেকালের ফিউডাল লর্ড-ডিউকদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। তার জন্য সামাজিক বিলাসিতার সমস্ত উপকরণের চাহিদাও বেড়ে যায়। এইসব উপকরণের মধ্যে ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র ও পোষাকপরিচ্ছদের মতন চাকরবাকরও অপরিহার্য ছিল। এইসব নতুন ধনিক ও মধ্যবিত্ত পরিবারের বিলাসবাসনা চরিতার্থের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ইংলণ্ডে ভৃত্যশ্রেণীর চাহিদা ও সরবরাহ বাড়তে আরম্ভ করে। নতুন ও পুরাতন অভিজাতশ্রেণীর চাহিদা প্রায় সমান হয়ে ওঠে। নতুন হঠাৎ-বড়লোকেরা বাইরের জাঁকজমকের জন্য যেমন লালায়িত হয়ে ওঠেন, তেমনি পুরাতন বনেদী অভিজাতরা নতুন মধ্যবিত্তের চ্যালেঞ্জে নিজেদের বিলীয়মান সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য অতিমাত্রায় কাতর হয়ে ওঠেন। সামর্থ্যের অতীত হলেও, তাঁদের দিক থেকে ভৃত্যপোষণ অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। উদীয়মান ও অস্তমান অভিজাত-শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে, শিল্পযুগের সন্ধিক্ষণে ইংলণ্ডে ভৃত্যশ্রেণীর চাহিদা অসম্ভব বেড়ে যায়। জীন হেখ্‌ট (J. Jean Hecht) *The Domestic Servant Class in Eighteenth Century England* গ্রন্থে এই বিষয়টি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।*

মধ্যযুগের লর্ডদের তুলনায় নবযুগের ধনিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভৃত্যের বিলাসিতা অবশ্য অনেক কমে গিয়েছিল। পূর্বের লর্ডদের পরিবারে শতাধিক ভৃত্যপোষণ স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। পনের শতকের মাঝামাঝি ওয়ারিকের আর্ল ৬০০ জন ভৃত্য নিয়ে পার্লামেণ্টে যাতায়াত করতেন। তার চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র জীব একজন ডেপুটি

* J. Jean Hecht: *The Domestic Servant Class in Eighteenth Century England* (London 1856)—এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'The Demand and Supply of Servants' (১—৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

স্টুয়ার্ড যেতেন ২৯০ জন ভৃত্য নিয়ে। পরবর্তীকালে এত বিশাল ভৃত্যের বহর ক্রমে কমতে থাকে। ষোল শতকে লর্ড-পরিবারের ভৃত্যসংখ্যা গড়পড়তায় শতখানেকে দাঁড়ায়। সতের শতকে আরও খানিকটা কমে যায়। আঠার শতকে দেখা যায়, পরিবারপ্রতি ভৃত্যসংখ্যা প্রায় ৪০—৫০ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পূর্বের যৌথ-পরিবারের বিপুল আয়তনও তখন অনেকটা শীর্ণ হয়ে এসেছে। এই পারিবারিক আয়তন হ্রাসের সঙ্গে তুলনা করলে ৪০—৫০ জন ভৃত্য যথেষ্ট বেশী বলতে হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ১০ থেকে ১৫।২০ জন ভৃত্য প্রতিপালিত হত। জীন হেখ্‌ট বহু পরিবারের দৃষ্টান্ত দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন।

নতুন শহুরে সমাজে ভৃত্যের সংখ্যাবৃদ্ধির আরও একটা পরোক্ষ কারণ ছিল। সেই কারণটি হল, ব্যক্তির নামগোত্রহীনতা (Anonymity)। গ্রাম্যসমাজের স্বল্পপরিসরে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল, এবং কুলগত ও পারিবারিক পরিচয় ছিল মানুষের কাছে প্রধান। শহুরে সমাজে ব্যক্তি মাত্রেই অজ্ঞাতকুলশীল হয়ে উঠল, এবং সামাজিক মর্যাদার মানদণ্ডও গেল বদলে। কুলগৌরবের বদলে জীবনযাত্রার বাহ্য সমারোহটাই বড় হয়ে উঠল। এই বাহ্য সমারোহের ইন্ধন যোগাতে হল ভৃত্যশ্রেণীকে। যার যত বেশী ভৃত্য পালনের ক্ষমতা, তার তত বেশী সামাজিক মর্যাদা। নতুন শহরের নতুন সমাজের মর্যাদার প্রতিযোগিতায় ভৃত্যদেরই আত্মোৎসর্গ করতে হল সবার আগে। দলে দলে শহরে এসে তারা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করতে লাগল।

সমাজের যেসব স্তর থেকে ভৃত্যদের আমদানি হত শহরে, তার মধ্যে চাষী ক্ষেতমজুর ও কারিগরদের স্তরই প্রধান। মেহনত গ্রামেও করতে হত, শহরেও করতে হত, কিন্তু নতুন শহরের মেহনতের মধ্যে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ভেসে উঠল ভৃত্যশ্রেণীর চোখের সামনে। গ্রামের মাঠে ঘাটে যে মেহনত করে বেঁচে থাকতে হয়, সে-মেহনত যেমন একঘেয়ে তেমনি ভবিষ্যৎহীন। অতএব—"No man that

can live the idle and luxurious life of a…Servant in town will live on plain food and work hard for the farmer in the country"—(জীন হেখ্‌ট উদ্ধৃত)। মেহনত করেই যাদের খেতে হবে তাদের কাছে একটানা ছন্দের গ্রাম্য-জীবনের চেয়ে স্বভাবতঃই নতুন শহরে সমাজ-জীবনের ছন্দবৈচিত্র্য অনেক বেশী লোভনীয় হয়ে উঠল। এই বৈচিত্র্য ছাড়াও আরও একটি বড় আকর্ষণ হল 'নগদ টাকা'। মেহনত যাচাই করার, এবং দর কষাকষি করে তার বিনিময়-মূল্য বৃদ্ধি করার স্বুবর্ণ সুযোগ দেখা দিল নতুন শহরে। মেহনতের নগদ মূল্য হিসেবে টাকার টানেও অনেকে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ধাবমান হল। একে একধরনের cash-rush বলা যেতে পারে। নবযুগের শহরে টাকাটাই হল ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ও সামাজিক মর্যাদার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক, গ্রাম্যসমাজে তা নয়। সেইজন্য জীন হেখ্‌ট বলেছেন: "To the daughters of tradesman as well as to the sons of cottagers, then, service had an appeal because it meant the possibility of substantial pecuniary rewards and the possibility of social elevation."

আঠার শতকে বাংলাদেশেও কতকটা অনুরূপ সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। শিল্পবাণিজ্যের বিকাশের দিক থেকে না হলেও, অন্যান্য দিক থেকে লণ্ডনের সঙ্গে কলকাতার সামাজিক অবস্থার খানিকটা সাদৃশ্য ছিল বললে ভুল হয় না। বিদেশী ইংরেজদের প্রয়োজনে গড়েওঠা কলকাতা শহরের আকর্ষণ বরং ওদেশের চেয়ে এদেশের গ্রাম্যলোকের কাছে অনেক বেশী ছিল। সতের শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংরেজরা এখানে কুঠি স্থাপন করে ব্যবসাবাণিজ্য আরম্ভ করেছিলেন, এবং তার প্রায় একশ বছর পরে পলাশীর যুদ্ধে তাঁদের জয় হয়েছিল। তার মধ্যে কলকাতার সূতানুটি গোবিন্দপুর ও তার পরিপার্শ্বে জমিদারী করে, এবং দেশের সর্বত্র কোম্পানীর তরফ থেকে ও ব্যক্তিগতভাবে, বৈধ

ও অবৈধ উপায়ে বাণিজ্য করে, ইংরেজরা এদেশের গ্রাম্যসমাজের অর্থনৈতিক গড়নকে ভাঙতে আরম্ভ করেছিলেন। গ্রামের চাষী ও কারিগরেরা নানাদিক থেকে অসহায় ও বিপন্নবোধ করছিল। অনেক ক্ষেত্রে তারা কুলবৃত্তি থেকে উৎখাত হয়ে নতুন বৃত্তির সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছিল জীবনধারণের জন্য। এই অবস্থায় নতুন শহর কলকাতায় জীবিকা ও বৃত্তির সন্ধানে যাত্রা করা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া নতুন শহরের আলাদা আকর্ষণ তো ছিলই। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের এই বিভ্রান্ত ও উৎখাত চাষী কারিগরেরাই নতুন শহরে এসে ভৃত্যশ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। ইংরেজ আমলের বর্ধিষ্ণু রাজধানীতে তারা এসেছে জীবিকার জন্য, এবং একঘেয়ে জীবনের একটু বৈচিত্র্য ও স্বাচ্ছন্দের প্রত্যাশায়।

নতুন কলকাতা শহরে একটা নতুন সমাজের কাঠামও তখন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। সতের শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকেই শেঠ-বসাকরা ও অন্যান্য বণিক কারিগরেরা ভাগীরথীর পশ্চিমদিক থেকে পুবদিকের নতুন শহরে বসবাস ও বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেছিলেন। বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম থেকে বড়বাজার পর্যন্ত গঙ্গার ধারে ধারে, ইংরেজের কুঠির কাছাকাছি তাদের বসতি ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বর্তমান ফোর্ট উইলিয়মের কাছে পূর্বে যে গোবিন্দপুর গ্রাম ছিল, আঠার শতকের প্রথম পর্বের দিকে কলকাতার বনেদী পরিবারের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকে সেখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে বিদেশীদের অধীনে চাকরিবাকরি ও ব্যবসাবাণিজ্য করে প্রচুর ধনোপার্জনও করেছিলেন। সুতানুটি কলিকাতা গোবিন্দপুর গ্রামসমষ্টিও তখন ধীরে ধীরে নগরের রূপধারণ করছিল। আঠার শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে এই উদীয়মান নগরে একটা নতুন সমাজও গড়ে উঠেছিল। কেবল বিদেশীদের সমাজ নয়, এদেশেরও জনসমাজ। এই নতুন শহরে দেশীয় সমাজের রূপ তখন খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে না উঠলেও, এইটুকু বোঝা যাচ্ছিল যে নতুন ধনবানেরাই নবযুগের সমাজে প্রাধান্যলাভ

করছেন। আঠার শতকের দ্বিতীয়ভাগে সমাজের রূপ আরও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। ইংরেজ আমলের নতুন বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দি গোমস্তা দালাল ও দেওয়ানেরা নতুন শহরে নতুন বাঙালীসমাজে তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অর্থাৎ বিদেশী অভিজাতদের পাশাপাশি কলকাতায় তখন নতুন বাঙালী অভিজাতশ্রেণীও গড়ে উঠেছে, এবং দেশী ও বিদেশী দুই শ্রেণীর অভিজাতদের সামাজিক মর্যাদার প্রতিযোগিতায় শহরে ভৃত্যশ্রেণীর চাহিদাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের লোক শহরে আসতে আরম্ভ করেছে প্রধানত চাকরির লোভে, এবং কিছুটা শহরের টানে। চাকরির মধ্যে কলকাতা শহরে তখন নিছক চাকরের চাকরিরই সুযোগ হয়েছে সবচেয়ে বেশী। সাহেবরা নানাকাজের জন্য গণ্ডায় গণ্ডায় চাকর রাখতে আরম্ভ করেছেন, এবং তাঁদের দেখাদেখি এদেশী নতুন-বড়লোকরাও ভৃত্যপোষণের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ভৃত্যদের এক নতুন স্বর্ণযুগের অভ্যুদয় হয়েছে এই কলকাতা শহরে।

রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকান্ত পুরাতন সামন্তযুগের ভৃত্য। বাংলা ১৩০১ সনে, ইংরেজী ১৮৯৪ সালে রবীন্দ্রনাথ 'পুরাতন ভৃত্য' রচনা করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষে রচনা হলেও এই কাব্যের উৎস হয়ত তাঁর বাল্যস্মৃতি অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগের স্মৃতি এবং ঠাকুর-পরিবারের স্মৃতি। কলকাতা শহরের ধনিক অভিজাত পরিবারের মধ্যে ঠাকুর পরিবার নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। নতুন শহরে নতুন অভিজাত পরিবারেও যে দীর্ঘকাল পুরাতন ভৃত্যদের গোত্রান্তর হয়নি তা কৃষ্ণকান্তের কাহিনী পাঠ করলেই বোঝা যায়। তার কারণ আমাদের দেশের নতুন শহুরে সমাজেও যে অভিজাতশ্রেণীর বিকাশ হয়েছিল; তাঁরা অনেকক্ষেত্রে সামন্তযুগের মনোভাব একেবারে বর্জন করতে পারেন নি। বিশেষ করে, পারিবারিক জীবনের আচার-ব্যবহারে ও রীতিনীতিতে তাঁরা সেকালের সামন্তশ্রেণীকেই অনুসরণ করে চলতেন। ব্যক্তিগত

ভোগবিলাসের ব্যাপারে সেকালের সঙ্গে একালের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। পার্থক্য ঘটবার মতন বাস্তব অবস্থারও সৃষ্টি হয়নি। দেশে শ্রমশিল্পের বিস্তারের পথ যখন রুদ্ধ হয়ে গেল, তখন নতুন বড়লোকরা তাঁদের সঞ্চিত বিপুল অর্থ নবাবী চালে ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের জন্য অপব্যয় করতে লাগলেন। সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না বলে ভৃত্যশ্রেণীরও স্বাধীন শ্রমজীবী হওয়ার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়ে গেল। নতুন শহরে এসে প্রাণধারণের জন্য যারা ভৃত্যের বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হল, তারা শেষ পর্যন্ত সেকালের পুরাতন ভৃত্যেই পর্যবসিত হল, নতুন স্বাধীন মেহনত-জীবীশ্রেণীতে রূপান্তরিত হতে পারল না। 'অতি প্রশান্ত' কৃষ্ণকান্ত তার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

সুলতানী ও বাদশাহী আমলে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজকর্মের জন্য অনেক বেশী সংখ্যায় ভৃত্য নিযুক্ত হত। ডঃ আসরফ বলেছেন, "the amount of labour expended in the performance of personal services is an outstanding economic fact of the period," দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বলেছেনঃ "To illustrate from the life of the highest officials, we will give the example of the Muster-master of Sultan Balban who employed 50 to 60 Domestics for the service of betel-leaves alone—" (K. M. Ashraf : *Life and Conditions of the People of Hindustan*, 1200-1550 A. D.) কেবল পানসাজার জন্য ৫০।৬০ জন ভৃত্য নিয়োগের কথা সাহেব-নবাব অথবা নতুন দেশী-নবাবদের আমলে ভাবা যেত না। আঠার উনিশ শতকে নতুন দেশী-বিদেশী অভিজাতশ্রেণীর গণ্ডী ও সামাজিক স্তর অনেক বেশী প্রসারিত হয়েছিল। কলকাতার নতুন শহুরে সমাজে এই দুই হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা দেশী ও বিদেশী অভিজাতশ্রেণীর পদমর্যাদার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভৃত্যদের চাহিদা বেড়েছিল যথেষ্ট, কিন্তু ব্যক্তি-

প্রতি ও পরিবার-প্রতি তার সংখ্যা নবাবী ও সুলতানী আমলের তুলনায় নিশ্চয় অনেক কমে গিয়েছিল। কোন একটি বিশেষ ব্যক্তিগত কাজের জন্য কেউই আর পরে ৫০।৬০ জন ভৃত্য নিয়োগের কথা নিশ্চয় কল্পনা করতে পারতেন না।

আঠার শতকের ইংলণ্ডের মতন আঠার-উনিশ শতকের বাংলাদেশে সেকালের পড়ন্ত ও একালের উঠন্ত অভিজাতদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার রেষারেষির প্রশ্নও দেখা দিয়েছিল মনে হয়। ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রে যে-সব বনেদী পরিবারের অবস্থা পড়ে গিয়েছিল এবং যাঁরা নতুন ধনাভিজাত্যের উচ্চস্তরে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের উভয়ের মধ্যে বাইরের মর্যাদারক্ষার প্রতিযোগিতার মনোভাব দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। তার উপর নতুন শহুরে সমাজের কেবল ধনগত মর্যাদার প্রাধান্যের জন্য, জীবনযাত্রার বাহ্য আড়ম্বরটাই প্রত্যেকের কাছে অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেকালের গ্রাম্যসমাজে বংশগত মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ব্যক্তিগত পরিচয় ধনমুখাপেক্ষী ছিল না। শহুরে সমাজে ব্যক্তির কুলগত মর্যাদা ক্রমে লোপ পেয়ে গেল, এবং জনবহুল সমাজে ব্যক্তির কাছে ব্যক্তি হয়ে উঠল অজ্ঞাতকুলশীল। শহরের এই অজ্ঞাতকুলশীলের জনসমাজে বাইরের ধনদৌলতের আড়ম্বরটাই ব্যক্তির ও পরিবারের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হয়ে দাঁড়াল। এই বাহ্য আড়ম্বরের অন্যতম উপকরণ হল ভৃত্যশ্রেণী। যাঁর পরিবারে যত বেশী ভৃত্য, তাঁর তত বেশী সামাজিক মর্যাদা। বনেদীদের সঙ্গে অর্বাচীনদের আভিজাত্যের সংঘাতও প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠল। দুই দিকের মর্যাদার টানাটানিতে ভৃত্যদের চাহিদা ও সরবরাহ ক্রমেই শহুরে সমাজে বাড়তে লাগল।

কলকাতার শহুরে সমাজে এই দুই দিক ছাড়াও আরও একটি তৃতীয় দিক ছিল। অর্থাৎ দুই শ্রেণীর এদেশী অভিজাত ছাড়াও, আর একটি তৃতীয় অভিজাতশ্রেণী ছিলেন। তাঁরা হলেন বিদেশী সাহেব, কোম্পানির আমলের ইংরেজ ব্যবসায়ী, কর্মচারী ও আমলাগোষ্ঠী। বাদশাহী আমলের আমীর-অমাত্যদের মতন এদেশে তাঁরা সামাজিক

জীবন যাপন করতেন, এবং উচ্ছৃঙ্খল বিলাসিতায় কেউ কেউ সেকালের খেয়ালী নবাবদেরও হার মানাতেন। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের ভোগবিলাসের প্রধান সহায় ও সম্বল ছিল এদেশের ভৃত্যশ্রেণী। এদেশী হঠাৎ-বড়লোকদের কাছে এই বিদেশীদের জীবনযাত্রাই 'মডেল' ছিল। তাঁরা পদে পদে সর্বক্ষেত্রে বিদেশীদের অনুকরণ করে চলতেন। বিদেশীদের হাবভাব আচার-ব্যবহার পর্যন্ত হুবহু অনুকরণ করতে তাঁরা দ্বিধা করতেন না। বিদেশীদের খানসামা খিদমৎগার বেয়ারা চাপরাশি ইত্যাদি ভৃত্যদের মতন তাঁরাও নিজেদের কাজকর্মের জন্য ভৃত্য নিয়োগ করতেন। বিদেশীদের মতন খানাপিনা ভোজসভা ও উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সেখানে নিজেদের ভৃত্যবহরের 'ডিমনস্ট্রেশন' দিতেন, এবং সেটাকে তাঁদের নতুন ধনলব্ধ সামাজিক সম্ভ্রম ও মর্যাদারক্ষার অন্যতম উপায় বলে মনে করতেন। শোভাবাজারের রাজা, পাইকপাড়ার রাজা, ভূকৈলাসের (খিদিরপুরের) রাজা, ঠাকুর পরিবার, অথবা কলকাতার অন্যান্য বাঙালী দেওয়ান বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দি, অথবা মুনসী ও ব্যবসায়ীদের নতুন অভিজাত পরিবারের ভৃত্যগোষ্ঠীর সঠিক সংখ্যা বা বিবরণ আলাদাভাবে কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। তা না থাকলেও এই দেশী অভিজাতশ্রেণীর সামাজিক জীবনযাত্রার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে অনুমান করা যায় যে বিদেশী অভিজাতদের সঙ্গে, অন্তত উপকরণ-বাহুল্যের দিক থেকে, তাঁদের জীবনের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। বিদেশীদের মতন এদেশী বড়লোকদেরও বেশ বড় একটি ভৃত্যগোষ্ঠী পোষণ করতে হত। সাহেবদের মতন তাঁরাও ভৃত্যপোষণ তাঁদের সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করতেন।

নবযুগের এই শহুরে সমাজে ভৃত্য পোষণের বিলাসিতারও একটা 'হিসেব' ও 'সীমা' ছিল। সুলতানী ও নবাবী আমলের মতন তা 'বেহিসেবী' ছিল না। তার কারণ প্রভুদের সঙ্গে নবযুগের নতুন ভৃত্যদের

সামাজিক সম্পর্কের রূপান্তর ঘটল। সেকালের প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মধ্যে টাকার চুক্তিবন্ধনটা প্রধান ছিল না। বাদশাহী আমলেও অবশ্য ভৃত্যরা 'তঙ্কায়' বেতন পেত। কিন্তু তা পেলেও, সেবাকর্মের বিনিময়ে মনিবের পিতৃতুল্য অভিভাবকতা তাদের প্রাপ্য ছিল। চুক্তির বদলে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কে পারস্পরিক নৈতিক বন্ধনই তখন দৃঢ় ছিল বেশী। ভৃত্যগিরির মধ্যে সামাজিক বাধ্যতার মনোভাবটা ছিল প্রবল। আধুনিক যুগে কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন চুক্তিবন্ধনই প্রভু-ভৃত্যের ও মালিক-কর্মচারীর সম্পর্কের ভিত্তি হল, এবং এই বন্ধনের সূত্র হল 'টাকা'। একালের এই নতুন অর্থনৈতিক সামাজিক বন্ধনকে কার্ল মার্কস্ 'cash-nexus' বলেছেন। টাকার সূত্রে আবদ্ধ চুক্তির বন্ধন নতুন সমাজে যখন প্রধান হয়ে উঠল, তখন স্বভাবতঃই যুগধর্মের প্রভাবে অভিজাতশ্রেণীর ভৃত্যবিলাসও বেশ খানিকটা সংযত হল। যদৃচ্ছা ভৃত্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও পোষণ আর সম্ভব হল না। নতুন ইংরেজ প্রভুরাও খানিকটা এই আত্মসংযম দেখাতে বাধ্য হলেন। এদেশী হঠাৎ-বড়লোকরাও পুরোপুরি সেকালের ওমরাহ হতে পারলেন না। তার উপর, একালের ভৃত্যদের সেকালের কেনাগোলামীর মনোভাবও ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল। তারা বুঝতে পারল যে 'মেহনত' বেচেই নতুন সমাজে তাদের জীবিকা অর্জন করতে হবে। এই মেহনতই তাদের মূলধন, যেমন প্রভুদের ও মালিকদের মূলধন টাকা। টাকার মূলধন নিয়োগ করার যেমন স্বাধীনতা আছে মালিকদের, তেমনি কর্মক্ষেত্রে মেহনতের মূলধন নিয়োগ করারও তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। মেহনতের বিনিময়-মূল্যও তারা বাজারে যাচাই করে গ্রহণ করতে পারবে। নতুন শহুরে সমাজে ভৃত্যদের এই স্বাধীনতা, এবং প্রভু-ভৃত্যের সামাজিক সম্পর্কের এই রূপান্তরের ফলে ভৃত্যদের তথাকথিত ঔদ্ধত্য বিদ্রোহ ও প্রভুবদলের ঘটনা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত ভৃত্যেরও অভাব ছিল না, এবং নতুন ইংরেজ প্রভুরা ও অভিজাত বাঙালী মনিবরা প্রভুভক্তির জন্য ভৃত্যদের নানাভাবে পুরস্কৃতও

করেছেন। কিন্তু তা হলেও, নতুন শহরের নতুন ভৃত্যদের, ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রের টানে, শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকান্তের মতন 'অতি প্রশান্ত' পুরাতন ভৃত্যে পরিণত হতে অনেক সময় লেগেছে।

ইংরেজদের স্মৃতিকথা ও ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে সেকালের ভৃত্যশ্রেণীর আচার-ব্যবহার, বেতন, দস্তুরি ইত্যাদির নানারকম চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়। মিসেস ফে (Mrs. Fay) ১৭৮০ সালে তাঁর চিঠি-পত্রের মধ্যে ভৃত্য প্রসঙ্গে লিখেছেন: "আমার খানসামা মাত্র দেড় পাঁইট কাস্টার্ডের জন্য এক গ্যালন মাইলো ও তেরটা ডিম খরচ হয়েছে বলেছিল—'This was so barefaced a cheat, that I refused to allow it, on which he gave me warning.' আমি আর একজন খানসামা বহাল করলাম, এবং তাকে গোড়াতেই জানিয়ে দিলাম যে বাজারের জিনিসপত্তরের দাম আমি জানি, অতএব কেনাকাটার ব্যাপারে কোনরকম প্রতারণা আমি সহ্য করব না। আমার কথায় সে আদৌ দমল না, কেবল দ্বিগুণ বেতনের দাবী জানাল। অবশেষে আমি আমার পুরনো খানসামাকেই আবার কাজে বহাল করলাম। দেখলাম আগেকার চেয়ে এবারে তার চুরির বহর কিছুটা কমেছে। আগে প্রত্যেক লোকের জন্য সে ১২ আউন্স করে মাখন কিনত, অর্থাৎ কেনার হিসেব দিত; এখন ৪ আউন্স করে কেনার হিসেব দেয়।"। মিসেস ফে তাঁর চিঠিতে কেবল খানসামার কথা বলেছেন, কিন্তু কলকাতা শহরে ইংরেজরা আরও অনেক বেশী ভৃত্য নিয়োগ করতেন ব্যক্তিগত কাজের জন্য। এমা রবার্টসের 'হিন্দুস্থান' ও জনসনের 'স্ট্রেঞ্জার ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে তার চমৎকার বিবরণ আছে।*

* Emma Roberts ; *Scenes and Characterstics of Hindostan with Sketches of Anglo-Indian Society* : 3 vols. (London). George W. Johnson ("Advocate, Supreme Court, Calcutta 1835) *The straiger in India, or three years in Calcutta.* ; 2 vols. London (1843).

শ্রীমতী এমা লিখেছেন: "An establishment in the Bengal Presidency is composed of various descriptions of Moosulman and Hindoo servants, all of whom have their respective offices." খানসামারাই ছিল ভৃত্যদের মধ্যে প্রধান এবং সাধারণত তারা মুসলমানই হত। ভাল একটি খানসামা পেলে গৃহকর্তা পরম সুখে ও নিশ্চিন্তে বাস করতে পারতেন, কারণ এমা বলেছেন, "He (খানসামা) acts in the capacity of majordomo, purveyor, and confectioner, superintending the cooking department, making the jellies and jams and attending to all the more delicate and elaborate details of the *cuisine*." অন্যান্য ভৃত্যরা স্বভাবতঃই খানসামার হুকুম মেনে চলে, এবং অন্যান্য ভৃত্যদের কাজকর্মের দায়িত্ব তার উপর ছেড়ে দিয়ে গৃহকর্তা একরকম নিশ্চিন্তই থাকেন। খাবার টেবিলে মনিবের চেয়ারের ঠিক পেছনেই দাঁড়াবার অধিকার থাকত একমাত্র খানসামার। খানসামার সঙ্গে পাশে দাঁড়িয়ে থাকত খিদমৎগাররা। পরিবারের প্রত্যেক লোকের জন্য একজন করে খিদমৎগার থাকত। মর্যাদার দিক থেকেও খানসামার পরেই ছিল তাদের স্থান। তারা সবরকমের কাজকর্মই করত, খানসামার নির্দেশে রান্নাবান্না পর্যন্ত। কাজ হিসেবে তাদের মধ্যে মধ্যে আলাদা নামেও ডাকা হত। যেমন যারা মদ ও পানীয় তদারক করত তাদের 'আবদার' বলা হত, যারা হুঁকোতামাকের যোগান দিত তাদের বলা হত 'হুকোবরদার'। সাহেবের খানাটেবিলে খানসামা, আবদার ও হুঁকোবরদাররা, সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ পরে চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকত। একজন বা দুজন 'পাচক' ও দু-একজন 'মশালচি' হলেই খানাটেবিলের ভৃত্যবহর সম্পূর্ণ হত। এইসব চাকরি মুসলমানদেরই একচেটে ছিল, কারণ হিন্দুরা সাহেবদের রান্নাঘর বা খানাটেবিলের

সংশ্লিষ্ট কোন কাজ করতে চাইত না। 'সর্দার-বেয়ারা' থাকত একজন হিন্দু। তার উপর ঘরের তেল, বাতি, আসবাবপত্তর, বিছানা ইত্যাদি ঠিকঠাক করার ভার থাকত। এই সর্দার-বেয়ারার অধীনে, পরিবারের লোকসংখ্যা অনুপাতে থাকত কয়েকজন সাধারণ ভৃত্য ও বেয়ারা। পাল্কিবেয়ারার প্রয়োজন হলে ৮ জন থেকে ১২ জন পর্যন্ত ভৃত্য থাকত। এছাড়া 'মেথর-মেথরাণী' যারা থাকত তারাও নীচুজাতের হিন্দু। গৃহকর্ত্রীর পরিচারিকা থাকত 'আয়া।' দরজি থাকত সেলাইয়ের কাজের জন্য, 'ধোপা' থাকত কাপড়চোপড় ধোয়ার জন্য, 'ভিস্তি' থাকত জল বইবার জন্য। কয়েকজন 'চাপরাসি' থাকত বাইরের ছুটোছুটির কাজ করার জন্য—"They are usually, if Hindoo, high-caste men, Brahmins being frequently candidates for this office, and in the upper provinces of Hindoostan are seldom seen without swords by their sides"—অর্থাৎ দ্বারোয়ান ও চাপরাসির কাজ করত বেশিরভাগ উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণরা। 'হরকরা' নামে একদল ভৃত্য থাকত, যাদের একমাত্র কাজ ছিল সাহেবের বৈঠকখানা ঘরের পিছনের একটি কুঠরিতে চুপ করে বসে থাকা, এবং 'কৈ হ্যায়' বলে সাহেব চেঁচিয়ে উঠলে 'হুজুর' বলে সেলাম দিয়ে সাহেবের কাছে এসে দাঁড়ানো

ভৃত্যবহরের এইখানেই শেষ হল না। এমা লিখেছেন, "The outdoor Servants are almost innumerable." সাহেবের প্রত্যেক ঘোড়ার জন্য 'সহিস' ও 'ঘাস কাটার লোক' লাগত, বগি-ফিটন-ল্যাণ্ডোর জন্য 'কোচওয়ান' ও 'বেয়ারা' লাগত, বাগানের জন্য 'মালী' লাগত, ছাগল-ভেড়ার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'ভেড়িওয়ালা' লাগত, হাসমুরগীর লোক লাগত, এবং শ্রীমতী এমার ভাষায় "extra water-carriers, and other extras, ad infinitum." এরকম অসংখ্য ভৃত্য সাহেবের বাইরের কাজকর্মে নিযুক্ত থাকত।

ভৃত্যদের বেতন ৩৲ টাকা থেকে ১০৲ টাকা ছিল বলে এমা উল্লেখ করেছেন।

শ্রীমতী এমা রবার্টসের বিবরণ মনোরম হলেও, জনসনের মতন অনুসন্ধানী নয়। জনসন ছিলেন কলকাতার সুপ্রীমকোর্টের অ্যাডভোকেট। তিনি লিখেছেন যে ভৃত্যদের মধ্যে সবার আগে প্রয়োজন একজন খানসামা, 'who combines in one person the English Louse-Steward, butler and house-keeper.' খানসামার বেতন মাসে ১২৲ টাকা থেকে ২০৲ টাকা। খানসামার উপরই অন্যান্য ভৃত্য নিয়োগের ভার দেওয়া উচিত, কেবল প্রত্যেকের বেতন তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া দরকার। ভৃত্যদের বেতন সম্বন্ধে জনসন বলেছেন যে একবার তা ঠিক হয়ে গেলে সহজে তা বাড়ানো উচিত নয়। খানসামার কাছ থেকে ভাল কাজ আদায় করতে হলে, জনসনের মতে, তাকে একত্রে ১০০৲ টাকা করে খরচের জন্য দিয়ে প্রতি সপ্তাহে হিসেব নেওয়া উচিত। বাজার-দরের সঙ্গে হিসেব মিলাতে হলে ডুমতলা লেনের রবার্টসন কোম্পানি প্রতি সপ্তাহে যে 'Domestie Retail Price Current' প্রকাশ করেন, তাই দেখে মেলান দরকার। ভৃত্যদের বেতন ইচ্ছে করলে খানসামার হাত দিয়েও দেওয়া যায়, কিন্তু জনসন বলেছেন তা না দিতে পারলেই ভাল হয়। গৃহকর্তার বা গৃহকর্ত্রীর উচিত নিজের হাতে ভৃত্যদের বেতন দেওয়া, কারণ খানসামার উপর বেতন বণ্টনের ভার থাকলে সে সকলের কাছ থেকে 'দস্তুরি' আদায় করে। এটা তার ন্যায্য প্রাপ্য, কারণ "It is Dustooree, that is, this country's custom." পাচককে (Cook) জনসন 'generally a very excellent artist' বলেছেন।

খানসামা ছাড়া অন্যান্য ভৃত্যদের সম্বন্ধে জনসন যা বলেছেন তা এমার বিবরণের সঙ্গে মিলে যায়। খিদমৎগারদের বেতন মাসে ৬।৭৲ টাকা। পরিবারের প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির জন্য একজন করে খিদমৎগার দরকার। বাইরে বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে গেলেও প্রত্যেকের

একজন করে খিদমৎগার সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়, এবং সে তার মনিবের চেয়ারের পেছনে সব সময় দাঁড়িয়ে থাকে। পিওন বা চাপরাসিরা হল 'family messenger', এবং সাধারণত তারা খুব বিশ্বাসী ও পরিশ্রমী। জনসন বলেছেন: "He is often sent to a distance of several days' journey, with letters or small pareels and is never known to prove unfaithful, or to cause unnecessary delays". লোকজনের ঠিকানা ও বাড়িঘর যেন তাদের নখদর্পণে মনে হয়।

পুরুষ ভৃত্য যত সহজে পাওয়া যায়, মেয়ে চাকরানী তা পাওয়া যায় না। শ্রীমতী এমা বলেছেন যে একজন ভাল খানসামা খোঁজ করলে পাওয়া যায়, কিন্তু একজন ভাল আয়া খুঁজে পাওয়া শক্ত। এদেশের দরিদ্র স্ত্রীলোকরাও, মর্যাদাহানির ভয়ে, অন্য লোকের বাড়িতে চাকরি করতে চায় না বলে এমা অভিযোগ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে মুসলমানই হোক বা হিন্দুই হোক, সাধারণত খুব নীচ জাতের স্ত্রীলোকরা ছাড়া কেউ আয়ার কাজ করতে চায় না। আয়া পাওয়া গেলেও তাকে গৃহকর্ত্রীর পরিচর্যার কাজকর্ম শিখিয়ে নিতে অনেক সময় লাগে।

এমা রবার্টস ও জনসনের এই বিবরণ থেকে আমরা পারিবারিক ভৃত্যদের একটি তালিকা তৈরি করতে পারি। তালিকাটি এই:

ঘরের জন্য

খানসামা	১	চাপরাসি	১
খিদমৎগার আবদার হুকোবরদার	৩	দ্বারোয়ান	১
		দরজি	১
		ধোপা	১
সাধারণ ভৃত্য (বয়)	২	ভিস্তি	১
পাচক	১	আয়া	১
মশালচি	১	মেথর-মেথরানী	২
সর্দার-বেয়ারা	১		
হরকরা (পিওন)	১		১৮ জন

বাইরের জন্য

পাল্কিবেয়ারা	৪	মুর্গীওয়ালা	১
কোচওয়ান	১	মালি	১
সহিস	২		
ভেড়িওয়ালা	১		১০ জন

পরিবারের আয়তন অনুযায়ী ভৃত্যসংখ্যা কমত-বাড়ত। খুব ছোট পরিবারেও ঘরে-বাইরের কাজের জন্য যে কয়েকজন ভৃত্য লাগতে পারে তারই হিসেব দেওয়া হয়েছে এখানে। তাতেই দেখা যায়, ঘরের কাজের জন্য ১৮ জন এবং বাইরের কাজের জন্য অন্তত ১০ জন, মোট ২৮ জন ভৃত্য লাগত। একটু বড় পরিবার হলে অন্তত এর দেড়গুণ, অর্থাৎ ৪২ জন ভৃত্য লাগার কথা। একেবারে উচ্চতম অভিজাত পরিবারে, ইংরেজ ও বাঙালী দুইই, এই হিসেবে মনে হয় গড়ে প্রায় ৫০।৬০ জন ভৃত্য পোষণের প্রয়োজন হত। কলকাতা শহরের নতুন ধনিক বাঙালী রাজা-মহারাজাদের পরিবারে (যেমন শোভাবাজারের দেব-পরিবার, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার, পাইকপাড়ার রাজ-পরিবার, অন্যান্য দেওয়ান বেনিয়ানদের পরিবার) তার চেয়েও বেশী, প্রায় একশতের কাছাকাছি, ভৃত্য পালিত হত বলে অনুমান করা যেতে পারে। অভিজাত বাঙালী পরিবারের বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তা ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশী বেহিসেবী ছিল। এদেশী চরিত্রের অসংযমের সঙ্গে বিদেশী জীবনযাত্রার অনুকরণেচ্ছা, তাঁদের দিক থেকে ভৃত্যের চাহিদা যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছিল। এদেশী রীতি অনুযায়ী একদল ভৃত্য, এবং বিদেশী কায়দা অনুযায়ী আর-একদল ভৃত্য, এই দুইদল ভৃত্য পোষণ করতে গিয়ে তাঁদের ভৃত্যসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেত। দেশী-বিদেশী দুরকমের আভিজাত্যের তাগিদ মেটাতে এদেশের নতুন শহুরে অভিজাতরা প্রচুর অর্থ এই রকম ভৃত্যপালনে অপব্যয় করতেন। তাঁদের ভৃত্যের বহর দেখে মনে হত যেন তাঁরা মধ্যযুগের সুলতানদের বংশধর।

এমা ও জনসনের বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ভৃত্যদের

মধ্যে পদমর্যাদারও (rank) একটা প্রশ্ন ছিল। কাজকর্ম ও তার দায়িত্বভেদে ভৃত্যদের মধ্যেও মর্যাদার যথেষ্ট তারতম্য ছিল। পাগড়ি কোমরবন্ধ ইত্যাদি পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে তো বটেই, প্রভুর খানা-টেবিলের কাছে প্রত্যেকের দাঁড়াবার নির্দিষ্ট স্থান থেকেও এই মর্যাদার পার্থক্যের ইঙ্গিত পাওয়া যেত। খানসামার মর্যাদা ছিল সবচেয়ে বেশী, মনিবের চেয়ারের ঠিক পেছনেই ছিল তার দাঁড়াবার স্থান। অন্যান্য ভৃত্যদের মধ্যে দরজি পাচক সরদার-বেয়ারা প্রভৃতির একটা 'স্বতন্ত্র' স্ট্যাটাস ছিল। অন্যান্য সকলের মর্যাদার দিক দিয়ে স্থান ছিল নীচু দিকে স্তরবিন্যস্ত। ভৃত্যদের এই মর্যাদার সমস্যা ইংলণ্ডের সমাজেও ছিল একসময়। ভৃত্যদের একটি পুরনো 'হ্যাণ্ডবুকে' দেখা যায়, উচ্চস্তরের ভৃত্যদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে নিম্নস্তরের ভৃত্যদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য। 'হ্যাণ্ডবুকের' লেখক বলেছেন: "Never treat those with contempt whose station in the house may happen to be inferior to yours, considering they are placed there by the will of Providence" (Anthony Heasel; *The Servant's Book of Knowledge*, 1773). খানসামাদের মর্যাদা ও ক্ষমতা অধিক ছিল বলে তারা অন্যান্য ভৃত্যদের উপর অত্যাচার করার সুযোগ পেত। সেইজন্য ভৃত্যরা কেবল প্রভুর সেবা করেই নিশ্চিন্ত থাকত না, খুদে খানসামা-প্রভুকেও তাদের সব সময় খুশী রাখতে হত। খুশী রাখার অন্যতম উপায় ছিল নিয়মিত দস্তুরি দেওয়া।

ভৃত্যের মর্যাদা নির্ভর করত প্রভুর সামাজিক মর্যাদার উপর। জীন হেখ্‌ট তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের 'The Servant Hierarchy' অধ্যায়ে বলেছেন; "A still more important factor was the social position of the employer; for a certain amount of prestige was imparted to the servant, who not only identified himself with him but was

also closely identified with him by others." প্রভুর সামাজিক মর্যাদা উন্নত হলে ভৃত্যেরও মর্যাদার ভার বৃদ্ধি পেত। নতুন শহুরে সমাজে শোভাবাজারের রাজবাড়ির ভৃত্যের মর্যাদা, অথবা ঠাকুর-বাড়ির ভৃত্যের মর্যাদা, আর বেনিয়ান হিদারাম ব্যানার্জির বা অক্রুর দত্তের বাড়ির ভৃত্যের মর্যাদা একস্তরের ছিল না। প্রভুর মর্যাদার খানিকটা ভাগ ভৃত্যও ভোগ করত। আজও আমাদের সমাজে প্রভু-ভৃত্যের পরস্পরের মর্যাদার এই সম্পর্ক অটুট রয়েছে। এমন কি, আধুনিক সমাজে বড় বড় 'ইনস্টিটিউশন' যেখানে 'এমপ্লয়ার,' সেখানেও দেখা যায়, ইনস্টিটিউশনের মর্যাদাবোধ কর্মচারীদের মধ্যে বেশ প্রতিফলিত। র‍্যালি ব্রাদার্সের কেরানী আর কোন দেশী সওদাগরি অফিসের কেরানীর কর্ম-মর্যাদা বা সামাজিক মর্যাদা কোনটাই এক নয়। সরকারী চাকুরে ও বেসরকারী চাকুরের পার্থক্য কেবল যে বাড়িওয়ালার কাছেই আছে তা নয়, সমাজের সাধারণ লোকের কাছেও বেশ আছে। বিবাহের পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনেও তা বোঝা যায়। প্রভু-ভৃত্যের মর্যাদার সম্পর্ক সম্বন্ধে ভৃত্যদের পকেটবুকের উপদেশ আজও সামাজিক সত্য হয়ে রয়েছে। সেই উপদেশটি হল এই ; "You will be known by your master's rank and fortune" (*Servants Pocket-Book* 1761)। ভৃত্যদের এই প্রভুকেন্দ্রিক মর্যাদাবোধের প্রতি কটাক্ষ করে জেম্‌স টাউনলে (James Townbey) তাঁর *High Life Below Stairs* (London 1759) গ্রন্থে এক ডিউকের ভৃত্যের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন ঃ

> What Wretches are ordinary servants that go on in the same vulgar Track eve'ry Day. Eating, working and sleeping !—But we, who have the Honour to serve the Nobility, are of another species. We are above the common Forms, have servants to wait upon us, and are as lazy and luxurious as our masters.

কলকাতা শহরের অভিজাত পরিবারের খামসামা ও সর্দার-বেয়ারারা আরও গর্বের সঙ্গে এই কথা বলতে পারত। ডিউকের ভৃত্যের তুলনায় তাদের মর্যাদা ও গর্ববোধ কোনদিক থেকেই কম ছিল না। বড়লোকের খানসামাদের সামাজিক প্রতাপ ও 'প্রেস্টিজ' যে কতদূর পর্যন্ত ছিল, তা কলকাতা শহরের রাস্তার নামে তাদের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা থেকে বোঝা যায়।

নতুন শহুরে সমাজের নতুন ভৃত্যদের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক সেকালের দাসদাসীদের মতন ছিল না। নিজেদের মেহনতের নগদ বিনিময়মূল্য সম্বন্ধে তারা অধিকতর সজাগ ছিল, এবং তা স্বাধীনভাবে উচ্চহারে যেখানে ইচ্ছা বিক্রি করতে তারা কুণ্ঠিত হত না। 'যত পায় বেত, না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে'—পুরাতন ভৃত্য কৃষ্ণকান্তের এই মনোভাব পরবর্তীকালের পরিণতি, এবং পশ্চাদ্‌গতিও। আসলে বেত ও বেতন সম্বন্ধে তাদের চেতনা ছিল যথেষ্ট। আজ থেকে দু'শ বছর আগে যখন তারা নতুন শহরে জীবিকার সন্ধানে আসতে আরম্ভ করেছিল, তখন থেকেই তাদের নতুন মনিবদের অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তারা বেতন বা মেহনতের মূল্য অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছিল। ১৭৫৯ থেকে ১৭৮৫ সালের মধ্যে কতটা তাদের বেতন-বৃদ্ধি হয়েছিল, তা এই হিসেব দেখলেই বোঝা যায়ঃ

	১৭৫৯ সাল	১৭৮৫ সাল
খানসামা	৫৲	১০৲।২৫৲ টাকা
প্রধান পাচক	৫৲	১৫৲।৩০৲ টাকা
কোচওয়ান	৫৲	১০৲।২০৲ টাকা
জমাদার	৪৲	৮৲।১৫৲ টাকা
খিদমৎগার	৩৲	৬৲।৮৲ টাকা
সর্দার-বেয়ারা	৩৲	৬৲।১০৲ টাকা
হরকরা	২৷৷০	৪৲।৬৲ টাকা
বেয়ারা	১৷৷০	৪৲ টাকা

১৭৫৯ সাল				১৭৮৫ সাল
ধোপা	:	৩৲	:	১৫৲।২০৲ টাকা
সহিস	:	২৲	:	৫৲।৮৲ টাকা
মশালচি	:	২৲	:	৪৲ টাকা
পরামাণিক	:	১৲	:	২৲।৪৲ টাকা
হেয়ারড্রেসার	:	১॥০	:	৬৲।১৬৲ টাকা

[W. H. Carey : *The Good Old Days of Honorable John Company*, Calcutta 1907, Vol, II. Chapter 6.]
আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, পঁচিশ বছরের মধ্যে, ভৃত্যশ্রেণীর পক্ষে এই বেতনবৃদ্ধি করা সহজ ব্যাপার ছিল না। আজকের মতন কোন সংঘবদ্ধ ধর্মঘট বা আন্দোলন হয়ত তারা তখন করেনি, কিন্তু তা না করলেও নতুন দাবীদাওয়া সম্বন্ধে তাদের শ্রেণীগত চেতনা তখনই বেশ সজাগ হয়েছিল বলে মনে হয়। ১৭৫৯, ২১মে কলকাতার ইংরেজ জমিদার তাঁর পারিষদবর্গের একটি সভা ডাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, শহরের ভৃত্যদের বেতনবৃদ্ধির জুলুম নিবারণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জন জেফানিয়া হলওয়েল (J. Z. Holwell), রিচার্ড বেশার (Richard Becher) ও উইলিয়ম ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড (W. Frankland)। শহরের ভৃত্যদের বেতন নিয়ন্ত্রণের জন্য এই সভা ডাকা হয়েছিল, এবং সভায় গৃহীত প্রস্তাবের মুখবন্ধে ভৃত্যদের সম্বন্ধে যা অভিযোগ করা হয়েছিল তা এই ঃ

Taking into consideration the united complaints of the inhabitants with respect not only to the insolence but exorbitant wages exacted by the menial servants of the settlement for sometime past, and having duly weighed and considered the premises, we are of opinion that their complaints are too justly founded and loudly call for redress... the root of these evils lie in our

servants being admitted into the body of sepoys, or received on the works of the new fortifications... (Rev. J. Long: *Selections from Unpublishe Records etc.* Calcutta 1869, No. 418)

কলকাতার অধিবাসীরা (নিশ্চয়ই অবস্থাপন্ন) নতুন ইংরেজ জমিদারদের কাছে আবেদন করেছিলেন, ভৃত্যদের জুলুম থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য। জমিদাররা তাঁদের দাবী যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় হল, বেতন নির্দিষ্ট করে দিয়েও তাঁরা বলেছেন যে সিপাহীর কাজে অথবা নতুন কেল্লা নির্মাণের কাজে এই ভৃত্যশ্রেণীর লোকদের নিযুক্ত হবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বলে তাদের ঔদ্ধত্য এত বেড়ে গিয়েছে এবং বেতনও তারা খুশি মতন দাবী করছে। সিপাহীর ও মজুরের কাজের সুযোগ তাদের বন্ধ করে না দিলে, "all attempts to redress their insolence and exaction will be rendered fruitless"—বলে জমিদাররা মন্তব্য করেছেন।

ইংরেজ জমিদাররা যা বলেছেন তার গুরুত্ব আছে। মেহনতী মানুষের সামনে নতুন সমাজে এই প্রথম নানাবিধ 'alternative employment'-এর সুযোগ খুলে গেল। যে-কোন কাজকর্ম তারা স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারে এবং যাচাই করে তার জন্য ন্যায্য মজুরিও কিছুটা আদায় করতে পারে। এই সুযোগই তখন ভৃত্যদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ ছিল, যে-সুযোগের কথা তাদের আগেকার কালের দাসদাসীরা কল্পনাও করতে পারত না। নতুন শহরের নতুন সমাজের ভৃত্যরা ইচ্ছা করলে তখন সিপাহী হতে পারত, কুলিমজুর হতে পারত, এবং আজকের মতন কলকারখানার প্রতিষ্ঠা হলে শ্রমিকও হতে পারত। কিন্তু বৈদেশিক শাসনাধীনে দেশীয় শিল্পায়নের সুযোগ তখন আসেনি বলে, শ্রমিকশ্রেণীতে পরিণত হবার প্রশস্ত পথ তারা খোলা পায়নি। তাই ধীরে ধীরে নতুন শহরে নতুন ভৃত্যরা কৃষ্ণকান্তের মতন পুরাতন ভৃত্য হয়ে পুনর্মূষিক হয়েছে।

ভৃত্যশ্রেণীর সামনে থেকে বিকল্প কাজকর্মের সম্ভাবনা ক্রমে যত লোপ পেয়েছে, ততই তাদের অসহায় প্রভুনির্ভরতা বেড়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে তাদের জীবনের কোন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই, এবং ইচ্ছা মতন বিভিন্ন রকমের কাজকর্মেও নিযুক্ত হবার কোন সুযোগ নেই। এই অবস্থায় যত তাদের প্রভুনির্ভরতা বেড়েছে, তত তাদের বেতনের ও অন্যান্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দাবীদাওয়ার আওয়াজও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। একালের ভৃত্যরা সেকালের ভৃত্যদের মতন ব্যক্তিগত দাসত্বকেই অদৃষ্টের লিখন বলে মেনে নিয়েছে। তাদের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়েনি, বেতনও বাড়েনি, বরং দুইই অনেকটা কমে গিয়েছিল দেখা যায়। কমে যাবারই কথা, কারণ ইংরেজ ও বাঙালী প্রভুদের আভিজাত্যের জৌলুষ পুরুষানুক্রমে যেমন ম্লান হয়ে এসেছে, তেমনি ভৃত্যদেরও অসহায় প্রভুনির্ভরতা বেড়েছে। সংকট দেখা দিয়েছে দুদিক থেকেই। প্রভুর সংকট এবং ভৃত্যের সংকট। আঠার-শতকী প্রভুদের উনিশ-শতকী বংশধরদের পক্ষে অধিক ভৃত্যপোষণের আর ক্ষমতা ছিল না। তাঁদের আভিজাত্যের উৎস সঞ্চিত টাকাকড়ির ভাণ্ডার তখন প্রায় শূন্য হয়ে গেছে, তার জীর্ণ খোলসটি ছাড়া আর কিছু নেই। ভৃত্যদেরও কর্মান্তরের বা কর্মোন্নতির আর কোন আশা নেই। এই দুই সংকটের চাপে শহরের নতুন ভৃত্যরা কয়েক পুরুষের মধ্যে সেকালের পুরাতন ভৃত্যে পরিণত হয়েছে, যেমন শহরের নতুন অভিজাত ধনিকরা অবশেষে সেকালের জীর্ণ অভিজাতগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছেন। নতুন প্রভুরা যেমন শিল্পপতি হননি, নতুন ভৃত্যরাও তেমনি শ্রমিক হয়নি। এক্ষেত্রেও প্রভুর সামাজিক রূপ ও মর্যাদা পুরাতন ভৃত্য কৃষ্ণকান্তের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

•

আঠার শতকের ইংলণ্ডের ভৃত্যশ্রেণী সম্বন্ধে জীন হেখ্‌ট বলেছেন: "It was an important agent in the process of cultural change". আধুনিক যুগের নতুন শহরে সমাজের শ্রেণীগত

গড়ন যখন সচল হয়ে উঠল, মধ্যযুগের মতন আর অচল রইল না, তখন সমাজে প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষ্য হয়ে উঠল তার উপরের শ্রেণীকে সর্ব-ব্যাপারে নকল করা, এবং প্রাণপণ চেষ্টা করে হলেও সেই উচ্চশ্রেণীর স্তরে উন্নত হওয়া। উঁচু-নিচু শ্রেণীর মধ্যবর্তী ব্যবধান যখন নতুন সামাজিক পরিবেশে অতিক্রম্য হয়ে উঠল, তখন বিভিন্ন শ্রেণীর ও স্তরের মধ্যে এই উচ্চারোহণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। সমাজের এই শ্রেণীগত ও স্তরগত সচলতাকে বিজ্ঞানীরা 'vertical mobility' বলেন। এই ঊর্ধ্বাধ গতিশীলতা আধুনিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে শহুরে সমাজের। এই সমাজে ভৃত্যদের পক্ষে প্রভুদের জীবনযাত্রা হাবভাব চালচলন ইত্যাদি নকল করার ইচ্ছা জাগা স্বাভাবিক তো বটেই, অবশ্যম্ভাবীও। সর্বোচ্চ শ্রেণী থেকে সর্বনিম্ন শ্রেণী পর্যন্ত বাঙালী সমাজে এইভাবে একটা প্রবল অনুকরণেচ্ছা নবযুগের সূচনাকালে জেগে উঠেছিল, এবং তার প্রকাশ হয়েছিল ভৃত্যদের মধ্যে সর্বাধিক। সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকের ভৃত্যরা অধস্তন শ্রেণীর কাছে কতকটা সাংস্কৃতিক এজেন্টের মতন ছিল। জীন হেখ্‌ট বলেছেন: "It was an extensive system of capillaries through which cultural elements passed from the elite to the classes below. One of the most effective sections of the system was the servant class." আঠার-উনিশ শতকের নতুন শ্রেণীবিন্যস্ত সচল শহুরে সমাজে, উপর থেকে নিচের দিকে, বহুমুখী বিচিত্র ধারায় যে সংস্কৃতিস্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, ভৃত্যরা তারই একটি ধারাকে সর্বদাই খরস্রোতা করে রেখেছিল। সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের, লেনদেনের ও মিলন-মিশ্রণের অর্থাৎ acculturation-এর এত বড় শক্তিশালী এজেন্ট, এদেশের 'নেটিব' ভৃত্যদের মতন, আঠার উনিশ শতকের বাংলার সমাজে আর কিছু ছিল কিনা সন্দেহ।

নবযুগের বাংলার সমাজে যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল,

তাতে নতুন উচ্চশ্রেণীর গৃহভৃত্যদের দান ছিল কতটুকু, তা সত্যই গবেষণার বিষয়। অন্তত বিষয়টি উপেক্ষণীয় নয়। বড় বড সাহেবদের বাড়ির ভৃত্যরা, নতুন অভিজাত বাঙালী পরিবারের চাকরবাকররা, অন্তঃপুরের ভিতর থেকে নব্যসংস্কৃতির ধারা বাইরের বৃহত্তর জনসমাজের মধ্য ও নিম্নস্তরে বহন করে নিয়ে যেতে যে খানিকটা সাহায্য করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের দেশের 'ইঙ্গবঙ্গ কালচারের' অন্যতম প্রবর্তক হল নবযুগের নতুন শহরের নতুন গৃহ-ভৃত্যশ্রেণী। নানাশ্রেণীর ভৃত্যদের ভিতর দিয়ে, ভৃত্য-পরম্পরায়, বাংলার নতুন মিশ্র-সংস্কৃতির ধারা সমাজের উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে যেত।

কলকাতা শহরেব দেশী ভৃতাবা যে কেবল স্বদেশের সীমানার মধ্যে acculturation-এর দূতরূপে কাজ করত তা নয়, বিদেশের (ইংলণ্ডের) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেও এই মিলন-মিশ্রণের পথ যথেষ্ট সুগম করত। অনেকেই জানেন, সম্ভ্রান্ত বাঙালীদের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে যান। সম্ভ্রান্তদের মধ্যে হয়ত রামমোহনই প্রথম ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, কিন্তু একথা অভ্রান্ত যে বাংলাদেশবাসীদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি তাঁর আগে ইংলণ্ডে গিয়েছিল। এই ব্যক্তিদের মধ্যে কেউই স্বনামধন্য নয়, এবং সকলেই নতুন শহরের ভাগ্যবান ভৃত্য। রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গিয়েছেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ড থেকে আর বাংলাদেশে ফিরে আসতে পারেননি। পাশ্চাত্ত্য সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে এদেশের লোক লাভবান হওয়ার সুযোগ পায়নি। ভৃত্যদের বেলায় তা হয়নি। এদেশের ভৃত্যরা (পুরুষ ও নারী দুইই) বিদেশী মনিবদের সঙ্গে যেমন ইংলণ্ডে গেছে, তেমনি আবার ফিরেও এসেছে বাংলাদেশে। ভারতের জাতীয় মহাফেজখানার দলিলপত্রাদি থেকে সংগৃহীত এদেশী ভৃত্যদের ইংলণ্ড গমনাগমনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি ঃ

কলকাতা, ২৬ জানুয়ারি ১৭৯৬ ঃ 'মেসার্স ককারেল ট্রেল অ্যাণ্ড কোং' সেক্রেটারির কাছে লিখছেন, 'requesting a passage

home for two native servants' (Home Dept. Records, *Original Consultations* I Feb. 1796, No. 54)।

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি ১৭৯৬: 'মেসার্স ফেয়ারলি রীড অ্যাণ্ড কোং' সেক্রেটারিকে লিখছেন, 'requesting the refund of a deposit made for a native servant who did not proceed to Europe' (O. C. I Feb. 1796, No. 61)। ইংলণ্ডগামী ভৃত্যদের জন্য মনিবদের গভর্নমেণ্টের কাছে জামানত দিতে হত, তারা ফিরে এলে অথবা কোন কারণে তাদের যাওয়া না হলে তাঁরা তা ফেরত পেতেন।

কলকাতা, ১৩ মার্চ ১৭৯৬: এম্ ডিরোজিও সাব-সেক্রেটারিকে লিখছেন, 'requesting that a promissory note deposited for a native servant who proceeded to Europe may be returned' (O. C. 14 March, 1796, No. 62)। ইংলণ্ড থেকে ভৃত্যের প্রত্যাবর্তনের পর মনিব ডিরোজিও তাঁর জামানত ফেরৎ চাইছেন।

কলকাতা, ৫ এপ্রিল ১৭৯৬: অ্যাটর্নি ই. মরিস সেক্রেটারিকে লিখছেন, 'for return of deposit made for a servant who has returned from England' (O. C. 11 April, 1796, No. 46)।

কলকাতা, ১১ জুন ১৭৯৬: 'মেসার্স কলভিন্স অ্যাণ্ড ব্যাজেট' সেক্রেটারিকে লিখছেন, 'for return of deposit for two native servants who have returned from Europe' (O. C. 13 June. 1796, No. 33)।

কলকাতা, ২০ জুলাই ১৭৯৬: 'মেসার্স বার্বার, পামার অ্যাণ্ড কোং' সেক্রেটারিকে লিখেছেন, 'for return of deposit for one native servant who has returned from England' (O. C. 25 July, 1796, No. 27)।

কলকাতা, ১৫ আগস্ট ১৭৯৬ঃ এইচ্. ট্রেল সেক্রেটারিকে লিখছেন, 'to return deposit for a *native woman* who went to Europe' (O. C. 22 August 1796, No. 30)।

১৭৯৬ সালে ছ'সাত মাসের মধ্যেই এদেশী ভৃত্যদের ইংলণ্ড ও ইয়োরোপ যাত্রার এতগুলি সংবাদ পাওয়া যায়। তার আগের ও পরের দলিলপত্রের মধ্যেও এরকম অনেক সংবাদ আছে। সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করলে দেখা যাবে, রামমোহন রায়ের জন্মের আগে থেকে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই, প্রায় শতাধিক এদেশী ভৃত্য ইংলণ্ডে গিয়ে আবার বাংলাদেশে ফিরে এসেছিল। ফিরে এসে নিশ্চয়ই তারা চুপ করে বসে থাকেনি। বিলেতের ও ইয়োরোপের সমাজের নানারকম গল্প বলে নিশ্চয়ই তারা আসর জমিয়েছে, এবং সেখানকার সামাজিক রীতিনীতি আদবকায়দা ও আচারব্যবহার তারা যে অন্তত খানিকটা নকল করবার চেষ্টা করেনি, এমন কথা বলা যায় না। জীন হেখ্‌ট বলেছেনঃ "Consciously and unconsciously the servant tended to identify with his master. He assumed something of his master's social status; he took his master as a model to be imitated in detail." সচেতনভাবেই হোক বা অচেতনভাবেই হোক, ভৃত্যরা তাদের প্রভুদের নকল-সংস্করণ হওয়ার চেষ্টা করত, এবং প্রভুর সামাজিক মর্যাদার প্রতিফলিত গৌরব বোধ করতে আদৌ কুণ্ঠিত হত না। মাস্টারকেই সে তার জীবনের 'মডেল' মনে করত, এবং পদে পদে মাস্টারের চালচলন, বাকভঙ্গি, সাজপোষাক ইত্যাদি অনুকরণ করে আত্মপদোন্নতির দিবাস্বপ্ন দেখত। এই অনুকরণপ্রিয়তা গোলামি-মনোভাবের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ইংলণ্ডেও একসময় (আঠার শতকে) ভৃত্যশ্রেণীর এই নকল-প্রভু হবার বাসনা যে কত উগ্র হয়েছিল, তা সমসাময়িক সাহিত্যের বহু ভৃত্যচরিত্রের বিবরণ থেকে বোঝা যায়। ড্যানিয়েল ডিফো (Daniel Defoe) তাঁর *Everybody's*

Business is Nobody's Business গ্রন্থে (লণ্ডন ১৭৬৭) লিখেছেন যে সমাজের চারিদিকে তিনি কেবল 'the maid striving to out-do the Mistress', এই দৃশ্য দেখতে পান। গ্রামের মেয়েরা শহরে এসে যখনই কোন অভিজাত পরিবারে চাকরানীর কাজ করতে আরম্ভ করে, অল্পদিনের মধ্যেই দেখা যায়, 'Her Neat's Leather shoes are...transformed into Stuff or Sattin ones, with high Heels,' এবং তার, 'poor Scanty Linsey-Woolsey Petticoat, is changed into a good silk one."

কেবল চাকরানীরা নয়, চাকররাও প্রভুদের সবকিছু এইভাবে নকল করত, এবং কে প্রভু, কে ভৃত্য, তা কাউকে দেখেই চেনা যেত না।

আঠার ও উনিশ শতকের বাংলার সমাজে এদেশী ভৃত্যরাও সর্বব্যাপারে প্রভুদের নকল করবার চেষ্টা করেছে নিশ্চয়ই। বিদেশী প্রভুদের 'মডেল' মনে করে তাঁদের নিখুঁতভাবে তারা 'কপি' করার চেষ্টা করেছে। সাহেবের বাড়ির খানসামা-খিদমৎগার ধনিক বাঙালী রাজা-মহারাজারা এবং দালাল-বেনিয়ানের পরিবারেও একই কাজে নিযুক্ত হয়েছে, এবং বিদেশী প্রভুদের 'মডেলটি' নিখুঁতভাবে তারা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে এদেশী পরিবারের সামনে। রাজা-মহারাজা ও দালাল-বেনিয়ানরা কর্মক্ষেত্রে সাহেবদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য থেকে নকলকর্মে যে একেবারে উৎসাহিত হননি তা নয়। তাঁরা নিজেরাও সোজা-সুজি সাহেবিয়ানার যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছেন, এবং নবযুগের বাংলার সমাজের প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য 'cultural nexus'-এর কাজ করেছেন। 'নেটিব' ভৃত্যদের মতন আঠার শতকে (এবং উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত) বাংলার সমাজে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আর কোন শ্রেণী এমনভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা চিন্তার বিষয়। ভৃত্যরা কেবল এদেশের সাহেবদের কাছ থেকে নয়, খাস ইংলণ্ড-ইয়োরোপের সাহেবদের কাছ থেকেও, সাহেবিয়ানা এদেশে বহন

করে নিয়ে এসেছে। পুব-পশ্চিমের এই সাংস্কৃতিক লেনদেনের ব্যাপারে, বিশেষ করে ইঙ্গবঙ্গ সংস্কৃতির বিকাশে, পাঁচু-ছকু-কালু-নিমু-মুন্না খানসামাদের দানের কথা, সামাজিক সত্যের খাতিরে অন্তত অস্বীকার করা যায় না। কেবল কতটা দান ও কি ধরনের দান, তাই শুধু বিচার্য বিষয় হতে পারে।

ডুয়েল

সামাজিক প্রথা সহজে লোপ পায় না, যুগ যুগ ধরে তা উদ্‌বর্তিত হয় মানুষের অভ্যাস-আচরণের সঙ্গে। ডুয়েল (Duel) এইরকম একটি প্রথা, যার প্রভাব থেকে দীর্ঘকাল ধরে সভ্য মানুষও মুক্ত হতে পারেনি। তার প্রমাণ, ইংরেজরা শিল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক উন্নত হয়েও, উনিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত নিজেদের দেশে, এবং আমাদের দেশেও, কথায় কথায় মধ্যযুগের বীরপুরুষদের মতন দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। আঠার শতকের ইংলণ্ড সম্বন্ধে ট্রেভেলিয়ান লিখেছেন :

> The drinking and gambling habits of society, and the fierceness of political faction, led to frequent duels of which many ended ill... It was the privilege of all gentlemen, from a Duke downwards, to wear swords and to murder one another by rule · London and the country capitals were the commonest scenes of such duels as Thackeray has immortalised in *Esmond*.—*English Social History*, ২১৬

জুয়াখেলা, মদ্যপান, রাজনৈতিক দলাদলি প্রভৃতি বহু বদভ্যাসের সঙ্গে ইংরেজরা এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের অভ্যাসটিকেও এদেশে সঙ্গে করে নিয়ে

এসেছিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁরা অভ্যাসটিকে ছাড়তে পারেননি। এদেশের লোক প্রাচীন মহাকাব্যে, সাহিত্যে ও ইতিহাসে দ্বৈরথ যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিবরণ পাঠ করেছে। মধ্যে মধ্যে বিবাদরত দুই ব্যক্তির মধ্যে হাতাহাতি ও লাঠালাঠি হয়েছে। কিন্তু যে-দ্বন্দ্বযুদ্ধের লক্ষ্য হল "to murder one another by rule," তা তারা কোনদিন দেখতে বিশেষ অভ্যস্ত ছিল না। ইংরেজরা আসার পর, পিস্তল ও তরবারি নিয়ে ডুয়েল, প্রকাশ্য মাঠে-ময়দানে, তাদের কাছে একটি তাজ্জব ও উপভোগ্য দৃশ্য হয়ে উঠল। ইংলণ্ডে যেমন "from a Duke downwards" সকলের কাছেই ডুয়েল লড়াটা একটা মস্তবড় বাহাদুরির ব্যাপার ছিল, তেমনি এদেশেও ইংরেজ বড়লাট থেকে আরম্ভ করে সাধারণ টম-ডিক পর্যন্ত সকলে যে-কোন অজুহাতে ডুয়েলে অবতীর্ণ হওয়াটা রীতিমত সম্মানের ব্যাপার বলে মনে করতেন।

রাজনৈতিক দলাদলি ও ব্যক্তিগত ঈর্ষা-বিদ্বেষের ফলে কলকাতা শহরে যে দু'একটি ঐতিহাসিক ডুয়েল হয়েছিল, তার মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস-বনাম-ফিলিপ ফ্রান্সিসের ডুয়েলটি অন্যতম। ইতিহাসের ছাত্ররা সকলেই জানেন হেস্টিংস আমাদের বাংলাদেশের প্রথম গবর্নর-জেনারেল, অর্থাৎ সারা ভারতের নয়, "Presidency of Fort William"-এর। তাঁকে প্রথম গবর্নর-জেনারেল নিযুক্ত করেও, কোম্পানির ডিরেক্টররা তাঁর কৌন্সিলের চারজন সদস্যের উপর সমান কর্তৃত্বের ভার দিয়ে তাঁর ক্ষমতাকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। এই চারজন সদস্যের মধ্যে ফ্রান্সিস ছিলেন অন্যতম, এবং গোড়া থেকেই তিনি হেস্টিংসের কার্যকলাপের ও শাসননীতির বিরোধিতা করেছেন। চারজনের মধ্যে ফ্রান্সিস ছাড়া আরও দু'জন ছিলেন হেস্টিংস-বিরোধী, ক্লেভারিং ও মনসন। একমাত্র রিচার্ড বারওয়েল ছিলেন হেস্টিংসের সমর্থক। সুতরাং কৌন্সিলের সভায় ভোটাভুটির সময় হেস্টিংস প্রায়ই ফ্রান্সিসের কাছে তিন-দুই ভোটে পরাজিত হতেন, এবং তার ফলে তাঁর কাজে পদে পদে ব্যাঘাত ঘটত। এই ব্যাঘাত ক্রমে উভয়ের বিরোধ তীব্রতর করে

তুলতে থাকে। শোনা যায়, মহারাজা নন্দকুমার ফ্রান্সিস ও তাঁর সমর্থকদের সহযোগিতায় হেস্টিংসের বিরুদ্ধে জাল অভিযোগপত্র বোর্ডের কাছে পেশ করেন। মনিবেগম, মহম্মদ রেজা খাঁ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে হেস্টিংস উৎকোচ গ্রহণ করেছেন বলে নন্দকুমার অভিযোগ করেন। ১১ মার্চ, ১৭৭৫ ফ্রান্সিস আলোচনার জন্য পত্রটি বোর্ডের সভায় পেশ করেন। দু'দিন পরে, তাঁর অভিযোগের সপক্ষে, দলিলপত্রসহ সাক্ষী দিতে প্রস্তুত আছেন বলে নন্দকুমার আর-একখানি চিঠি লেখেন। নন্দকুমারের প্রস্তাবটি ফ্রান্সিস ভোটাধিক্যে পাশ করিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। হেস্টিংস কৌন্সিল 'dissolve' করে দেন, এবং বারওয়েলসহ সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান।

পরে সুপ্রিমকোর্টের বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। ৫ আগস্ট, ১৭৭৫ মহারাজা নন্দকুমার জালিয়াতির অভিযোগে দণ্ডিত হয়ে ফাঁসি-কাষ্ঠে মৃত্যু বরণ করেন। ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হয় কুলিবাজারে, "within a few paces of Fort William," বর্তমান হেস্টিংস ব্রিজের উত্তর-পূব কোণে। হাজার হাজার কলকাতার অধিবাসী এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখার জন্য সেদিন গঙ্গাতীরে ভিড় করেছিল, এবং ব্রাহ্মণহত্যার দৃশ্য পাপ মনে করে গঙ্গাস্নানান্তে পবিত্র হয়েছিল। শোনা যায়, এই সময় কলকাতার ব্রাহ্মণরা অপবিত্র শহর ত্যাগ করে, গঙ্গার পশ্চিমতীরে বালি-উত্তরপাড়া অঞ্চলে দলে দলে যাত্রা করেছিলেন।

নন্দকুমারের ফাঁসির পর, হেস্টিংসের আরও দু'জন শত্রুর অকস্মাৎ পর পর মৃত্যু হল, মনসন ও ক্লেভারিঙের। মনসনের মৃত্যু হয় ১৭৭৬ সালে, ক্লেভারিঙের ১৭৭৭ সালে। ১৭৮০ সালের শেষে ফ্রান্সিস নিজে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু তার মাত্র কয়েকমাস আগে তাঁর সঙ্গে হেস্টিংসের একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে যায়। কৌন্সিলের এক সভায় হেস্টিংস তাঁর চিরশত্রু ফ্রান্সিস সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব পাঠ করেন, এবং সেটি সরকারী কনসাল্টেশানে রেকর্ড করা হয়। প্রস্তাবটি এই ঃ

I do not trust to Mr. Francis's promises of candour, convinced that he is incapable of it. I judge of his public conduct by his private, which I have found to be void of truth and honour.

সভা শেষ হলে ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন এবং গবর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে পাশের একটি নির্জন কক্ষে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে একটি লিখিত 'চ্যালেঞ্জ'-পত্র গুঁজে দেন। চ্যালেঞ্জ যে ডুয়েল লড়ার চ্যালেঞ্জ তা বলাই বাহুল্য। আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য হেস্টিংসও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। আলিপুর জেলখানার কাছে হেস্টিংস ও ফ্রান্সিস ৭ আগস্ট ১৭৮০, দ্বন্দ্বযুদ্ধের সম্মুখীন হন। ফ্রান্সিসের দক্ষিণ অঙ্গে হেস্টিংস তাঁর রিভলভারের গুলি বিদ্ধ করে তাঁকে ধরাশায়ী করেন। ডুয়েলের নিয়মকানুনে হেস্টিংস যে রীতিমত অভ্যস্ত ছিলেন তা বোঝাই যায়, কারণ তা না হলে তাঁর অসাবধানী গুলিতে ফ্রান্সিসের মৃত্যুও হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি, এবং সেই বছরেরই শেষে ফ্রান্সিস পদত্যাগ করে সশরীরে ইংলণ্ডে ফিরে যান।

হেস্টিংস-ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ নানা কারণে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। প্রধান কারণ অবশ্য দ্বন্দ্বমান দুই ব্যক্তিই স্বনামধন্য, এবং তাঁদের পারস্পরিক বিরোধও ঐতিহাসিক। এ রকম আর-একজন বিখ্যাত গবর্নর-জেনারেলের ডুয়েলের কাহিনী ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর নাম জন ম্যাকফার্সন। স্যার জন 'কালকাটা গেজেট' পত্রিকায় জেমস্ ব্রাউন সম্বন্ধে এমন একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন, যাতে তিনি অপমানিত বোধ করেন। তারপরেই মেজর সাহেব স্যার জনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। ২৮ মার্চ, ১৭৮৮ কোম্পানির ডিরেক্টররা এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁদের 'ডেসপ্যাচে' মেজর ব্রাউনকে তিরস্কার করে লেখেন ঃ

Having read and deliberately considered a publication which appeared in the newspapers entitled 'Narrative

relative to the duel between Sir John Macpherson and Major James Browne,' we came to the following resolution, viz., that the apology required from Sir John Macpherson by Major Browne shows that the offence taken by Major Browne arose from an act of Sir John Macpherson in his station of Governor-General of Bengal, and not in his private capacity, ...the paragraph which gave the offence appeared in the Calcutta Gazette, by the authority of the Government, at the head of which he (Sir. John) then was as Governor-General of Bengal. That the calling upon any person acting in the character of the Governor-General of Bengal, or Governor of either of the Company's other Presidencies, or as a Councillor or in any other station, in respect of an official act, in the way Sir John Macpherson has been called upon is highly improper, tends to a subversion of due subordination, may be highly injurious to the Company's service, and ought not to be suffered; more especially as this Court is ready at all times to hear the complaints, and give redress to any of their servants, who either wilfully, or by mistake, may have been injured by their superiors.

সামরিক কর্মচারীদের বিশেষ করে, এবং অন্যান্য ইংরেজদেরও, দ্বন্দ্বযুদ্ধের সংবাদ সমসাময়িক পত্রিকায় প্রচুর পাওয়া যায়। মধ্যযুগের রীতি অনুযায়ীও ডুয়েল লড়লে তাতে কারও প্রাণহানি হবার কথা নয়, কেবল জখম হবার কথা। কিন্তু আমাদের দেশে এসে ইংরেজরা যে ধরনের ডুয়েল লড়তেন, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'fatal' হত।

অর্থাৎ এদেশে আসার পর, মনে হয়, ইংরেজরা বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সভ্যতার সদ্‌গুণগুলি বিসর্জন দিয়ে আত্মঘাতী রেষারেষি ও হানাহানিতে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁদের ব্যক্তিগত ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসাকাতরতা ডুয়েলের মধ্যে তাই বীভৎস মূর্তিতে প্রকাশ পেত। ডুয়েলের সংবাদ যা তখনকার পত্রিকায় পাওয়া যায়, তা বেশীর ভাগই এই ধরনের ভয়াবহ সংবাদ ঃ "Died on Monday evening, Mr. Webb, who was uufortunately wounded in a duel a few days ago" (ক্যালকাটা গেজেট, ২ সেপ্টেম্বর ১৭৯০)।

ডুয়েল দিন দিন এত বেড়ে যাচ্ছিল এবং তার চেহারাও ক্রমে এত বন্য ও হিংস্র হয়ে উঠছিল, যে তার বিরুদ্ধে একদল ইংরেজ সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকা মারফত সংগ্রাম আরম্ভ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে যে কেউ কেউ এবিষয়ে বই লিখে প্রচার করতে আরম্ভ করেছিলেন, তা ১৭৯৩ সালের ২৮ নভেম্বর তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপন দেখে বোঝা যায় ঃ

> In a few days will be published "Thoughts on duelling." by a writer in the Honorable Company's Service, to which will be added, (by another hand),
>
> Observations on suicide and assasination, with a view to ascertain their origin and effect in society : price eight Rupees.
>
> The proceeds of the work will be applied to a charitable purpose, and no greater number printed than shall be subscribed for before the 5th December.

কিন্তু তা সত্ত্বেও ডুয়েল বন্ধ হয় নি। ডুয়েল ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে, এবং দেখা যায় যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে একজনের ডুয়েলের ফলে প্রাণহানিও হয়। যিনি জয়লাভ করেন, অবশেষে

তিনিও খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়েন, এবং আদালতের বিচারে অনেক সময় প্রাণদণ্ডেও দণ্ডিত হন। অর্থাৎ ডুয়েলের ফলে শেষ পর্যন্ত দুই বীরেরই মৃত্যু হয়। ৮ ডিসেম্বর ১৮০৮, কলকাতার সুপ্রিমকোর্টে ডুয়েল-বিজয়ী জনৈক সামরিক কর্মচারী খুনের অপরাধে অপরাধী কি না, তার বিচার হয়। বিচারপ্রসঙ্গে জাস্টিস উইলিয়ম বারোজ গ্র্যাণ্ড জুরিকে আহ্বান করে বলেন যে তাঁর মতে বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী খুনের অপরাধে অপরাধী। তাঁর ভাষণে তিনি প্রসঙ্গত বলেন যে, প্রকৃত সভ্যসমাজে, যে-কোন কারণেই হোক, ডুয়েল লড়ার কোন সার্থকতা নেই। অতীতে কোনকালে হয়ত ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্যের প্রকাশ পেত ডুয়েলের মধ্যে। কিন্তু তার কোন চিহ্ন বর্তমানের ডুয়েল বা তার যোদ্ধাদের মধ্যে নেই। এখন তার বাইরের বীরত্বের খোলসটি মাত্র পড়ে আছে, ভিতরের শিষ্টতা ও সাহসিকতা দুইই চলে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডুয়েল এখন হিংসাবিদ্বেষপরায়ণ কাপুরুষের কদভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাই দেখা যায়, ডুয়েলের শোচনীয় পরিণতি হয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যুতে। জাস্টিস বারোজ বলেন :

> The practice of Duelling, which has long been a reproach to the superior orders of society, in almost every part of Europe, is, I am happy to believe, wearing gradually away. The professed Duellist in this country, I hope, is utterly unknown, and has long been consigned in every other, to all the infamy, which so brutal a character deserves.

এটি ১৮০৮ সালের ঘটনা। এর প্রায় কুড়ি বছর পরেও দেখা যায়, সাময়িক পত্রিকায় ডুয়েলের অনেক মর্মান্তিক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই ধরনের সংবাদ : "A most distressing event took place at Barracpore on Saturday last, a

young Officer having been shot dead in a duel". (Calcutta Gazette, 16 July 1829) এ রকম আরও অনেক ডুয়েলের শোচনীয় সংবাদ ১৮২৯-৩০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হতে থাকে। এ বিষয়ে 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকা এই বলে মন্তব্য করেন :

> Such a catastrophe naturally gives rise to painful reflections upon a practice derived from our Gothic ancestors. To dilate upon it here would be as trite as we fear it would be vain—for as long as human nature is what it is, and society is constituted as at present, duels will occur.

পত্রিকার সম্পাদক বলতে চান যে ডুয়েলিঙের অভ্যাসটি তাঁরা তাঁদের গথিক পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছেন। এখনও তাঁরা সেই পুরাতন অভ্যাস ছাড়তে পারেন নি, কারণ মানুষের স্বভাব বদলায়নি, এবং সমাজেরও কোন পরিবর্তন হয় নি। যতদিন তা না হবে, ততদিন ডুয়েলিঙের রীতিও সমাজে প্রচলিত থাকবে।

মানুষের যে স্বভাব ও সমাজের যে অবস্থার কথা এখানে বলা হয়েছে, তা কি রকম? একজন বিখ্যাত লেখক ডুয়েলিঙের প্রতি জার্মান ও ইংরেজদের মনোভাব তুলনা করে বলেছেন যে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে ডুয়েলিঙের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তা যদি না থাকত, তা হলে আধুনিক জার্মানি অনেকদিক থেকে আধুনিক ইংলণ্ডের তুলনায় উন্নত হওয়া সত্ত্বেও, সেখানকার সমাজে ডুয়েলিঙের এত প্রবল আধিপত্য কখনই বজায় থাকত না। জার্মানদের চরিত্র অনেক বেশী রূঢ় ও উদ্ধত বলে, সভ্যতার অগ্রগতির মধ্যেও তারা দ্বন্দ্বযুদ্ধের অভ্যাস ছাড়তে পারে নি। নিজেদের জাতীয় চরিত্রের জন্য একটি প্রাচীন রীতিকে আধুনিক যুগেও তারা আঁকড়ে ধরে রয়েছে।

কিন্তু সত্যিই কি ডুয়েলিং জাতীয় চরিত্রের প্রকাশ, না কোন বিশেষ সামাজিক শ্রেণীচরিত্রের প্রকাশ? ঐতিহাসিক পোলার্ড বলেছেন যে, "duelling is a class, and not a national characteristic." তিনি বলেছেন যে জার্মানিতে এই প্রথার প্রাদুর্ভাবের কারণ হল দুটি: (১) জার্মান সমাজে একটা অভিজাত আত্মমুখী মনোভাবের দীর্ঘস্থায়িত্ব; (২) জার্মানিতে সুসভ্য ও মার্জিত মধ্যবিত্তশ্রেণী-নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রের অভাব। পোলার্ডের প্রধান বক্তব্য হল যে জার্মান সমাজে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে একটা মধ্যযুগীয় আভিজাত্যের বোধ দীর্ঘকাল পর্যন্ত জাগ্রত ছিল। আধুনিক যুগে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশের ফলে সেই আভিজাত্যের গণতান্ত্রিক রূপায়ণ সম্ভব হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু জার্মানির বিশেষ সামাজিক অবস্থার জন্য তা হয়নি। সেইজন্য জার্মানিতে বহু মধ্যযুগীয় প্রথা ও রীতিনীতি আধুনিক যুগ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে ছিল দেখা যায়। ডুয়েলিং তার মধ্যে অন্যতম, কারণ মধ্যযুগের ব্যক্তিযুদ্ধের শেষ রূপ হল একালের ডুয়েলিং।

> Its prevalence in Germany is due partly to the rigidity and exclusiveness of the aristocratic sentiment which has not been pervaded and civilised by middle-class opinion, and partly to the fact that no strong central monarchy, based on the middle-class, arose in Germany to deal with feudal turbulence, for duelling is simply the last surviving form of the private warfare of the Middle Ages.

ইংলণ্ডে মধ্যবিত্তশ্রেণীর দ্রুত বিকাশ হয়েছিল বলে ইংরেজরা মধ্যযুগের কুসংস্কারগুলিকে বর্জন করে আধুনিক যুগের চারিত্রিক গুণগুলিকে অর্জন করতে পেরেছিলেন। উচ্চশ্রেণীর আভিজাত্যবোধ সেখানে থাকলেও তা সমগ্র সমাজ-মানসের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার

করতে পারেনি। পোলার্ডের এই যুক্তি সত্য হলেও, পূর্বের বিবরণ থেকে বোঝা যায়, ইংরেজদের মধ্যেও অনেক মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব ছিল আধুনিক যুগ পর্যন্ত। তার মধ্যে ডুয়েলিং নিশ্চয় অন্যতম। উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত দেখা যায়, পদস্থ ও শিক্ষিত ইংরেজ কর্মচারীরা অনেকে এদেশে সামান্য ব্যক্তিগত কারণে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। নিজেদের দেশে শিল্প-বিপ্লবের পরেও যে তাঁরা এরকম একটি অশোভন ও অসভ্য প্রথার প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেননি, একথা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। সত্যিই তখন মনে হয়, সামাজিক প্রথার বা আচারের মৃত্যু হয় না সহজে।

সেদিনের ইংরেজ বিচারক

কাজীর বিচারের যুগ শেষ হয়ে গেল ইংরেজেরা এদেশের আসার পরে। সাধারণ মানুষ ভাবল, অপরাধ, দণ্ড ও বিচার সম্বন্ধে তাদের পুরনো সব ধ্যানধারণাই বোধ হয় বদলে ফেলতে হবে। কাজীর বিচারের ভয়-ভাবনা থেকে হয়ত এবার তারা মুক্তি পাবে, এবং অপরাধ লঘু কি গুরু তার ন্যায্য বিচার করে নবযুগের বিচারকরা দণ্ডবিধান করবেন। কিন্তু আঠার শতকে, এবং উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত, ইংরেজ শাসকরা যে-অপরাধের জন্য যে দণ্ড দিতেন তা আজকের দিনে ভাবলেও অনেকে শিউরে উঠবেন। ইংরেজ আমলের আদিপর্বের এই সব অপরাধ ও দণ্ডের কথা মনে হলে, মধ্যযুগের বর্বরতা ছাড়া আর কিছু তা মনে হয় না।

আইন-আদালত ও দণ্ডনীতির দিক দিয়ে ইংরেজরা তখন নিজেদের দেশেও যে খুব বেশীদূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন তা নয়। বিচারের বিধিবিধান উদ্ভাবনের দিক থেকে তাঁরা তখনও মধ্যযুগের স্বেচ্ছাচারিতার সীমা অতিক্রম করতে পারেননি। সৈন্যসামন্তদের উপর তখনও দাস-দস্যুদের মতন নির্মমভাবে অত্যাচার করা হত এবং সাধারণ মানুষকেও দণ্ড দেবার সময় ঠিক 'মানুষ' বলে মনে করা হত না। দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বকালে একজন সৈনিককে ষোল বছরের মধ্যে সংযমশিক্ষা দেবার

জন্য ত্রিশ হাজার বেত্রাঘাত করা হয়েছিল, যদিও মানুষ হিসেবে সৈনিকটি ছিল 'hearty and well'. দৃষ্টান্তটি ট্রেভেলিয়ান তাঁর 'ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। গোটা সতের ও আঠার শতক ধরে পার্লামেণ্টে একটির পর একটি প্রাণদণ্ডের আইন পাশ করা হয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণদণ্ডের অপরাধের সুদীর্ঘ তালিকা সংখ্যার দিক থেকে দুইশত পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ট্রেভেলিয়ান লিখেছেন ঃ

> Not only were horse and sheep stealing and coining capital crimes, but stealing in a shop to the value of five shillings, and stealing anything privily from the person, were it only a handkerchief. But such was the illogical chaos of the law, that attempted murder was still very lightly punished, though to slit a man's nose was capital.—*English Social History*, ৩৪৮-৪৯

ঘোড়া-ভেড়া চুরি ও টাকাপয়সা জাল করলে প্রাণদণ্ড তো হতই, যে-কোন দোকান থেকে পাঁচ শিলিং দামের জিনিস, অথবা যে-কোন ব্যক্তির কাছ থেকে সামান্য একখানি রুমাল চুরি করলেই অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। কোন লোক খুন করার চেষ্টা করলে সামান্য শাস্তি পেত, কিন্তু কেউ কারও নাক কেটে দিলে তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হত। ইংলণ্ডের এই আইনের বিশৃঙ্খলাকে ট্রেভেলিয়ান 'illogical chaos of law' বলেছেন। তিনি একথাও উল্লেখ করেছেন যে, ইংরেজরা তখন অপরাধীদের এই সব কঠোর দণ্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেও ভালবাসতেন। Parson Woodforde-এর ডাইরী থেকে তিনি দু'টি ঘটনার কথা এই পাশবিক আচরণের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন ঃ

> ১৭৭৭, ২২ জুলাই। রবার্ট বিগেন আলু চুরি করেছিল বলে তাকে বেত্রদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। একটি ঠেলাগাড়ীর পেছনে বেঁধে তাকে চাবুক মারতে মারতে জর্জ-ইন থেকে এঞ্জেল পর্যন্ত, এবং সেখান থেকে আবার

রাস্তার উপর দিয়ে রয়াল-ওকের ভিতর দিয়ে জর্জ-ইন পর্যন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো হয়েছিল।

১৭৮১, ৭ এপ্রিল। আমার ভৃত্য উইলকে আজ ছুটি দিতে হল। তিনজন দস্যুর ফাঁসি দেখার জন্য সে আজ নরউইচ পর্যন্ত দশমাইল পথ হেঁটে যাবে ঠিক করেছে। উইল ফিরে এল সন্ধ্যা সাতটার সময়, এবং বলল যে তিনজনেই ফাঁসি যাবার সময় গভীর অনুতাপ প্রকাশ করেছিল।

আঠার শতকের ইংলণ্ডের বিচারের এই দৃশ্য ও দৃষ্টান্তের কথা মনে রাখলে, কলকাতা শহরে ও বাংলাদেশে সেই সময়কার অপরাধ-বিচারের কাহিনীগুলি আদৌ আজগুবি বা অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না। বরং এই কথাই মনে হবে যে, অপরাধ ও ন্যায়-বিচার সম্বন্ধে তাঁদের নিজেদের দেশের ধ্যান-ধারণাই তাঁরা পুরোপুরি এদেশে বহন করে এনেছিলেন, এবং বিচারবোধের দিক থেকে তাঁরা মধ্যযুগের স্বেচ্ছাচারী শাসকদের চেয়ে তখনও পর্যন্ত একটুও উন্নত হতে পারেননি। ঠিক ইংলণ্ডের মতনই একই অপরাধের জন্য একই দণ্ড তাঁরা এদেশে দিতেন, এবং নিজেদের দেশের মতন সেই দণ্ডের অমানুষিক দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন এদেশের লোকের সামনে। কলকাতা শহরের রাস্তার মোড়ে মোড়ে একসময় যে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে চোর-ডাকাতদের প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত, এবং সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখার জন্য আগে থেকে শহরবাসীদের ঢেঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হত, সেকথা আজ কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না। অথচ ১৫০-২০০ বছর আগেও এই নতুন কলকাতা শহরের নতুন নাগরিকরা বিচারের এই ভয়াবহ দৃশ্য প্রায় প্রাকৃতিক দৃশ্যের মতন দেখতেন। এইবার ইংরেজ আমলের এইসব অপরাধ ও তার বিচারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেব।

১৭৫৯, ৫ এপ্রিল। কলকাতার ইংরেজ জমিদাররা আশরফ ও মানিক দাস নামে দুই ব্যক্তির অপরাধের (?) দণ্ডবিধান করে বোর্ডের

কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। দু'জনেই প্রতি শুক্রবার ১০১ ঘা করে বেত খাবে, তিন মাসের জন্য। বোর্ড এই দণ্ডবিধান মঞ্জুর করেন।

১৭৬০, ২ জুন। 'Benautrom Chattogee,'—মনে হয় বেচারাম চ্যাটার্জি এইভাবে ইংরেজী অক্ষরে রূপান্তরিত হয়েছেন। অপরাধী হলেন বেচারাম। বেচারী বেচারাম, বোধ হয় সাহেবদের সুনজরে পড়ার আশায়, নতুন ফোর্টউইলিয়ম কেল্লা নির্মাণের কাজে জনৈক ক্যাপ্টেন-ইঞ্জিনিয়ার কিভাবে দু'হাতে টাকা চুরি করছেন, সেই খবরটা ইংরেজ জমিদারদের জানিয়ে দেন। বিচারের আগেই ইঞ্জিনিয়ার কোন কারণে অকস্মাৎ 'গত' হয়েছিলেন মনে হয়। সুতরাং বিচারের দিন কৌন্সিলের সভাকক্ষে বেচারামকে তো ডাকা হয়ই, তার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারের পুত্র মিস্টার বার্টনকেও ডাকা হয়। সভাকক্ষে যখন বিচার চলছে, বার্টন তখন দরজার পাশে দণ্ডায়মান বেচারামের দিকে চেয়ে রাগে ফুলছেন, এবং বেচারাম বার্টনের রক্তবর্ণ চক্ষুর দিকে চেয়ে ভয়ে কাঁপছেন। বার্টনের ক্রোধের কারণ কি? বেচারাম তাঁর পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাঁকে অপমানিত করেছে। তাঁর মৃত পিতার আত্মা সেজন্য ক্ষুব্ধ এবং বার্টন তাঁর সুযোগ্য পুত্র হিসেবে তার প্রতিশোধ নেবেন। তারই আগুন ধূমায়িত হচ্ছে তাঁর চোখে। বেচারাম অতটা বুঝতে পারেননি। তিনি ভেবেছিলেন, বিচার হবে এবং অপরাধীর দণ্ড হবে। তাতে বার্টনেরই চিন্তিত হবার কথা। তিনি এমন কোন অপরাধ করেননি, অন্যের চুরির কথা জানিয়ে, যে তার জন্য তাঁর শাস্তি হতে পারে। বেচারাম এইসব কথা ভাবছেন, এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটে গেল। ক্রুদ্ধ বার্টন এক হুংকার দিয়ে বেচারামের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়লেন। সঙ্গে তাঁর দু-চারজন বেয়ারাও ছিল। বেয়ারাদের সাহায্যে তিনি বেচারামের হাত-পা বেঁধে, একটা বাঁশের ডগায় তুলে, ঠিক চড়কগাছের মতন বন্‌বন্ করে ঘোরাতে লাগলেন। বেচারামের চীৎকারে সভাকক্ষের হতভম্ব বিচারকরা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন, কিছুই

করতে পারলেন না। ঘূর্ণিপাকের পর বেচারামকে চ্যাংদোলা করে নামিয়ে বার্টন সাহেব নিজের হাতে "Chawbooked him in the most cruel manner, almost to the deprivation of life." কেবল চাবুক মেরেই বার্টন ক্ষান্ত হননি। বেচারাম চাটুয্যের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে সাহেবের টনটনে জ্ঞান ছিল। সুতরাং চাবুক মারার পর ইংরেজনন্দন এদেশী কুলীন ব্রাহ্মণতনয়কে চিৎ করে ফেলে, বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসে, জোর করে মুখে গোমাংস গুঁজে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। সভার বিবরণীতে লেখা আছে—"And all this without giving ear to, or suffering the man to speak in his own defence, or clear up his innocence to him."—এতদূর পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বেচারামকে তার পক্ষে একটি কথা বলবারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। হলওয়েল সাহেব নিজে ব্যাপারটা অত্যন্ত অন্যায় মনে করে বার্টনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বার্টন কোন কৈফিয়ৎ দেননি, কেবল বলেছিলেন যে বেচারাম একটি "profligate spy", অতএব তাকে এইভাবে শাস্তি দেওয়াতে কোন অন্যায় হয়নি।

১৭৬০, ১৭ নভেম্বর। অন্যায় করলে অপরাধীদের ইংরেজ জমিদাররা চাবুকাঘাতে মেরে ফেলতেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের মনে হল, অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া হচ্ছে না। চাবুক মেরে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া দৃষ্টান্ত হিসেবে "sufficiently public" নয়। সেইজন্য তাঁরা সভা করে সিদ্ধান্ত করেন যে, চাবুক না মেরে, কামানের মুখে বসিয়ে কামানদেগে প্রাণদণ্ড দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

১৭৬১ সালে লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে যখন ভীষণ চুরি-ডাকাতি আরম্ভ হয়, তখন কৌন্সিল বাংলার নবাবের কাছে এই মর্মে আবেদন করেন যে, স্থানীয় ফৌজদারকে হুকুম দেওয়া হোক, চোরের সর্দারকে সামনে দাঁড় করিয়ে কামানদেগে মেরে ফেলতে। তা না হলে চুরি বন্ধ করা সম্ভব হবে না—"To fire off the mouth of a cannon the leader of

the thieves who was made prisoner that others may be deterred." ১৭৬৪, ২৭ আগস্ট *Secret Department*-এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, রংপুরের 'black servant'-দের একবার ঢেঁড়া পিটিয়ে কোন বিষয়ে সত্য বিবৃতি দেবার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, মিথ্যা বিবৃতি দিলে স্থানীয় ফৌজদার "would have their ears and noses cut off"—তাদের নাসিকা ও কর্ণ দুইই ছেদন করে ফেলবেন, আস্ত রাখবেন না।

১৭৬৬, ২৯ জানুয়ারি তারিখের বিবরণীতে কলকাতা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি আবেদনপত্র উদ্ধৃত করা হয়েছে। ইতিহাসখ্যাত গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র রাধাচরণ মিত্রকে প্রতারণার অপরাধে যে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন ইংরেজেরা, তা মকুব করার জন্য এই আবেদনপত্র লেখা হয়েছিল। কুমোরটুলির প্রসিদ্ধ মিত্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম মিত্র কলকাতার ইংরেজ জমিদারদের সহকারী ছিলেন। সেইজন্য ইতিহাসে তিনি 'ব্ল্যাক ডেপুটি' বা 'ব্ল্যাক জমিদার' বলে খ্যাতিলাভ করেন। আঠার শতকে কলকাতার দেশী ও বিদেশী উভয় সমাজেই তাঁর অখণ্ড প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর পৌত্রকে জালিয়াতির অভিযোগে প্রাণদণ্ড দিলে শহরের সম্ভ্রান্ত সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আবেদনপত্রে প্রতারণার অভিযোগ সম্বন্ধে যেসব কথা বলা হয়েছিল, তা এখানে উল্লেখ না করলেও চলে। কিন্তু বিদেশী ইংরেজদের আইনকানুন সম্বন্ধে যেকথা আবেদনকারীরা বলেছিলেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা বলেছিলেন :

> They find themselves subject to the pains and penalties of Laws to which they are utter strangers...many things being it seems capital by the English Laws, which are only fineable by the laws of your petitioner's forefathers,

subject to which they have hitherto been bred, lived, and been governed...

এমন অনেক অন্যায়ের জন্য ইংরেজী আইনে প্রাণদণ্ড হয়, যা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না। কারণ তাঁদের পূর্বপুরুষদের আমলে এই সব অপরাধের জন্য জরিমানার বেশী কোন শাস্তি হত না। তারা বংশপরম্পরায় এই ধরনের আইনকানুন মেনে চলেছেন, তাই ইংরেজদের বিজাতীয় আইন ও বিসদৃশ বিচারনীতি অনেক সময় তাঁরা বুঝতে পারেন না। আবেদনপত্রে হুজুরিমল, শুকদেব মল্লিক, শোভারাম বসাক, রাসবিহারী শেঠ, রাধামোহন বসাক, দয়ারাম ঠাকুর, দুর্গারাম ঠাকুর, নিমাইচরণ শেঠ, মানিকচাঁদ, মদন দত্ত, হরেকৃষ্ণ ঠাকুর, নবকৃষ্ণ মুন্সী (মহারাজা নবকৃষ্ণ), রামনিধি ঠাকুর, গৌরচরণ শেঠ, পীতাম্বর শেঠ, কেবলরাম ঠাকুর প্রমুখ কলকাতার ৯৫ জন তদানীন্তন স্বনামধন্য ব্যক্তি আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। ইংরেজী আইন সম্বন্ধে তাঁরা যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য। অন্তত আঠার ও উনিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইংরেজরা তাঁদের নিজেদের দেশ ইংলণ্ডে যেসব রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা শাসিত হতেন, আমাদের দেশে মুসলমান ও হিন্দু আমলেও সমাজ-শাসনের আইনকানুন তার চেয়ে অনেক বেশী উদার ও মানবিক ছিল। এদেশের লোক কল্পনাই করতে পারত না যে চুরি, প্রতারণা বা মিথ্যাকথা বলার অপরাধে তাদের নৃশংসভাবে কামানের মুখে বসিয়ে, অথবা বেত্রাঘাতে হত্যা করা হবে। এই বিচিত্র দণ্ডনীতির মর্ম তাদের উপলব্ধি করতে অনেক সময় লেগেছে। তার মধ্যে অবশ্য ইংরেজদেরও বিচারবোধ অনেক উন্নত হয়েছে, এবং দেশের সমাজ-সংস্কারকদের আন্দোলনের ফলে তাঁরা ইংরেজী আইনকে ক্রমে অনেক উদার ও মানবিক করে তুলেছেন।

কিন্তু সেকথা আমাদের আলোচ্য নয়। সেদিনের ইংরেজ বিচারকদের কথা এখনও শেষ হয়নি। দণ্ডবৈচিত্র্যের বিবরণ এখনও কিছু বাকী আছে। ক্যালকাটা গেজেট, ইণ্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা ক্রনিকেল,

ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল প্রভৃতি পত্রিকা থেকে বিবরণগুলি সংকলিত। ১৭৯৫, ১ আগস্ট, কলকাতার সুপ্রিমকোর্টের বিচারে সিঁদকেটে চুরি করার অপরাধে ৬ জন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, এবং ১৮ আগস্ট কয়েকজন ছিঁচকে চোরকে হাত পুড়িয়ে দেওয়ার হুকুম দেওয়া হয়। লোচন নামে একজন অপরাধীকে কিছু রূপোর গহনা চুরি করার অপরাধে বড়বাজারে প্রকাশ্যে চাবুক মারার, এবং তারপর তিন মাস House of correction-এ বন্দী করে রাখার আদেশ দেওয়া হয়। হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক থেকে একটি মোহর চুরি করার অপরাধে কানাই দে নামে কোন ব্যক্তিকে দশ দিন জেলখানায় আটকে রাখার পর ছেড়ে দিয়ে বড়বাজারের দক্ষিণদিকে একস্থানে নিয়ে আসা হয়, এবং সেখান থেকে বড়বাজারের উত্তরপ্রান্ত পর্যন্ত চাবুক মারতে মারতে নিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে আনা হয়। ১০ ডিসেম্বর ১৮০২, সুপ্রিমকোর্টের বিচারে ডাকাতির জন্য বিজু মশাল্‌চির মৃত্যুদণ্ড হয়; আনন্দীরাম ও কতুলকিসনের চক্রান্ত করার জন্য দু'বছর করে জেল হয়; রামসুন্দর সরকারের সাত বছর দ্বীপান্তর হয়; ইমামবক্সের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অথচ ১৮০৪, ৪ নভেম্বর, মানুষ খুনের অপরাধে সুপ্রিমকোর্টের বিচারকরা অপরাধীদের যে দণ্ড দেন, তা পূর্বের অপরাধ ও দণ্ডের সঙ্গে তুলনা করলে নিতান্ত হাস্যকর বলে মনে হয়। জন ম্যাকলকলিনকে খুনের অপরাধে ১৲ টাকা জরিমানা ও একমাস কারাদণ্ড দেওয়া হয়: মহম্মদকে খুনের অপরাধে ঐ একই শাস্তি দেওয়া হয়। ম্যাথু নামে আর-এক ব্যক্তিকে খুনের অপরাধে এই দণ্ডেই দণ্ডিত করা হয়। জন, ম্যাথু ও মহম্মদ তিন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক। সুতরাং বিচারের দিক থেকে ইংরেজ বিচারকরা যে কোন জাতিগত পক্ষপাতিত্ব দেখাননি, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। উইলিয়ম কেরি এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন: "Verily the crimes of forgery and theft were considered by the legislators of those days more heinous than that of manslaughter."

সেদিনের ইংরেজ বিচারকরা চুরি-জালিয়াতিকে মানুষ খুনের চেয়ে অনেক বেশী গুরু অপরাধ বলে মনে করতেন। সুপ্রিমকোর্টের রায়গুলি (উনিশ শতকের গোড়ার দিকে) অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, সামান্য চুরির অপরাধে হাত পুড়িয়ে দেওয়া তখনকার দিনে খুব সাধারণ দণ্ড বলে গণ্য হত।

দণ্ডদানের রীতি। লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড, এবং গুরু অপরাধে লঘু দণ্ড দিয়েই বিচারকরা অপরাধীদের নিষ্কৃতি দিতেন না। বিচারের রায় দেবার পর অপরাধীদের দণ্ড দেওয়া হত সাধারণত প্রকাশ্যে চৌরাস্তার মোড়ে। যেমন ১৮০৭, ১০ জুন, ছুরিমারার অপরাধে এক ব্যক্তিকে সুপ্রিমকোর্টে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয় এই ভাষায়---"to be executed on Saturday, the 13th, at the four roads which meet at the head of Lall Bazar Street."

১৩ জুন শনিবার লালবাজার স্ট্রীটের চৌরাস্তার মোড়ে প্রকাশ্যে অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। ১৮১৫, ১৩ ডিসেম্বর, অন্য একটি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে হত্যা করার জন্য পাঁচজন পর্তুগীজকে হুগলীনদীর উপর ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে অভিনব কায়দায় ফাঁসি দেওয়া হয়। জাহাজের নাবিকরা যাতে এই দৃশ্য দেখতে পায়, এবং এরকম অপরাধ আর কখনও না করে, সেইজন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১৮০০ সালের ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল থেকে আরও দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একজন এদেশী স্ত্রীলোককে অল্পবয়সের একটি বালিকা-চাকরাণীকে হত্যা করার অপরাধে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। প্রকাশ্যে কলকাতার চৌরাস্তার মোড়ে তাকে নির্দিষ্ট দিনে ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা করা হয়। যথাসময়ে ফাঁসির মঞ্চের চারিদিকে বহুলোকের ভিড় জমে। আসামী একগ্লাস জল খেয়ে, সমবেত জনতার দিকে চেয়ে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেয়, এবং বক্তৃতান্তে সকলকে সেলাম জানিয়ে বিদায় নেয়—

"Having drunk a cup of water, she addressed a few words to the multitude and made a salam as a final adieu to this world."

ব্রজমোহন দত্ত নামে এক ব্যক্তিকে জনৈক সাহেবের বাড়ি থেকে একটি ঘড়ি চুরি করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। লালবাজারে চৌরাস্তার মোড়ে তাকেও ঐ একই পদ্ধতিতে ফাঁসি দেওয়া হয়। ব্রজমোহন উপস্থিত দর্শকদের সেলাম জানিয়ে, 'সাহেব, তৈয়ার' বলে তার প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করে। তারপরেই তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে দর্শকদের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

আইন ও বিচারের দিক থেকে আঠার শতকের ইংলণ্ডের যে সামাজিক অবস্থার কথা ট্রেভেলিয়ান বর্ণনা করেছেন, আমাদের সমাজে ঠিক সেই অবস্থারই উদ্ভব হয়েছিল দেখা যায়। নবযুগের নতুন মানবতা-বোধ তখন ইংরেজদের মনেই ভাল করে জাগেনি। উদারতার আলোকও ইংরেজ-সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি। রূঢ় ও দুঃসাহসী ইংরেজ বণিক-শাসকদের মতনই ছিলেন সেদিনের ইংরেজ বিচারকরা। কলকাতার প্রভাবশালী 'নেটিব' অধিবাসীদের (আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধের) আবেদনের সারকথার মধ্যে সত্য আছে অনেকখানি। সেদিনের ইংরেজ বিচারকের চেয়ে আমাদের দেশের কাজীর বিচার বা দণ্ডনায়কের বিচার অনেক বেশী 'মানবিক' ছিল। ট্রেভেলিয়ানের ভাষায় বলা যায়, ইংরেজরা সেদিন তাঁদের আঠার-শতকের সমাজের "illogical chaos of law" আমাদের সমাজে বহন করে এনে রীতিমত এক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলেন, যা নবাবী আমলের অতি মন্দ দিনেও কোন স্বেচ্ছাচারী নবাব করতে সংকোচবোধ করতেন। বেচারাম চাটুজ্যের ঘূর্ণীপাক, উত্তম-মধ্যম প্রহার ও গোমাংস গলাধঃকরণ হয়ত সেদিনের সাহেবী ঔদ্ধত্যের বেহিসেবী প্রকাশ হতে পারে। কিন্তু কথায় কথায় সামান্য অপরাধের জন্য, মিথ্যা প্রতারণা বা চুরি-জালিয়াতির জন্য লোকজনের নাক-কান কেটে ফেলা,

হাত পুড়িয়ে দেওয়া, কামানের মুখে বসিয়ে তোপ দেগে উড়িয়ে দেওয়া, লালবাজারের মতন প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসিকাঠে লট্‌কে দেওয়া, অথবা বড়বাজারের মতন জনবহুল (তখনও অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বড়বাজার জনবহুল ছিল) অঞ্চলে চাবুক মারতে মারতে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যাওয়া—এরকম বিচারের কথা আমাদের দেশের লোক চরম অত্যাচারী রাজা-বাদশাহের কালেও কল্পনা করতে পারেনি। তাই সেদিনের ইংরেজ বিচারকের কাছে অনেক বেচারাম, কানাই, বলাই, মন্নু ও ইমামবক্স, লঘু অপরাধের জন্য অকারণে গুরুদণ্ড ভোগ করেছে, এমন কি মহারাজা নন্দকুমার বা গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্রের মতন সমাজের কর্ণধাররাও রেহাই পাননি।

মধ্যবিত্তের বৈচিত্র্য

নবযুগের নতুন শহরের ঐতিহাসিক দান হল মধ্যবিত্তশ্রেণী। কলম্বাস, ভাস্কো-ডি-গামা ও অন্যান্য দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে, মধ্যযুগের সামাজিক পরিবেশ ধীরে ধীরে আধুনিক যুগে রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পোলার্ড (A. F. Pollard) বলেছেন : "They were external and obvious events, there were others less obvious, but no less important. These may almost be summed up in one phrase—the advent of the middle classes." বড় বড় ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঐতিহাসিক যুগান্তরে সাহায্য করেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু আরও অনেক সামাজিক কারণ আছে যা আপাতদৃষ্টিতে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও, পরিবর্তনকালে প্রভাব বিস্তার করেছে যথেষ্ট। এই কারণগুলিকে এককথায় 'মধ্যবিত্তশ্রেণীর আবির্ভাব' বলা যায়। পোলার্ড বলেছেন, মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের সন্ধিক্ষণের নবজাগরণ বা 'রেনেসাঁস' সম্ভবই হত না, যদি না সমাজের রঙ্গমঞ্চে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর আবির্ভাব হত। নতুন কলকাতা শহরে এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর আবির্ভাবের ফলেই, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলার নবজাগরণের পটভূমিকা রচিত হয়েছিল।

শ্রেণীগতভাবে এই মধ্যবিত্তের সীমানা সমাজের বহুদূর স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "কলিকাতা কমলালয়" পুস্তকে 'বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা' ব্যাখ্যাকালে এই নতুন বাঙালী মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক স্তর নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। "যাঁহারা প্রধান প্রধান কর্ম্ম অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম্ম করিয়া থাকেন," তাঁদের তিনি 'ধনাঢ্য' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁদের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, সকালে গাত্রোত্থান করে মুখ-হাত-পা ধুয়ে, তাঁরা 'বহুবিধ লোকের' সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেন। তারপর যাঁর যে-তৈল মর্দন করলে "সুখানুভব হয়," তিনি তাই মর্দন করে স্নানক্রিয়া সমাপন করেন। সমাপনান্তর "পূজাহোমদান বলিবৈশ্ব প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া ভোজন করেন।" ভোজনান্তে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করে "অপূর্ব্ব পোষাক জামাজোড়া ইত্যাদি পরিধান করিয়া পালকী বা অপূর্ব্ব শকটারোহণে" কর্মস্থলে গমন করেন। কাজকর্ম শেষ হলে বাড়ি ফিরে পোশাক ছেড়ে, হাতমুখ ধুয়ে গঙ্গোদক স্পর্শে পবিত্র হয়ে সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করেন। অতঃপর কিছু জলযোগ করে পুনরায় বহুবিধ লোকের সঙ্গে হয় সান্ধ্য বৈঠকে বসেন, না হয় স্বজনবন্ধু বা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে যান। এই বাঙালী বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দিরা আঠার শতকের মধ্যেই, কনট্রাকটারি-এজেন্সী-দালালি ও স্বাধীন ব্যবসাবাণিজ্য করে, অগাধ ধনসঞ্চয় করেছিলেন। কলকাতা শহরের অধিকাংশ প্রাচীন বাঙালী বনেদী পরিবারের পূর্ব-পুরুষরা এইভাবেই অর্থসঞ্চয় করে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ধনিক-শ্রেণী বলতে যদি 'ক্যাপিটালিস্টদের' বোঝায়, তাহলে এই শ্রেণীর বড়লোক বাঙালীদের তা না বলে 'উচ্চ-মধ্যবিত্ত' (upper-middle-class) বলাই শ্রেয়। ভবানীচরণ এদের শুধু 'ধনাঢ্য' বলেই ছেড়ে দিয়েছেন।

মধ্যবিত্তের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন ভবানীচরণ, তা দেখলে সত্যই অবাক হতে হয়। খাঁটি সমাজবিজ্ঞানীর মতন তিনি বলেছেন ঃ "মধ্যবিত্ত লোক অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন তাঁহাদিগের

প্রায় ঐ রীতি কেবল দান বৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য।" মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রাও কতকটা পূর্বোক্ত ধনাঢ্যদের মতন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে তারা কেবল অন্নযোগে আছেন, বেনিয়ানবাবুদের মতন দানধ্যানের বা বৈঠকী আলাপের বিলাসিতা নেই, কারণ অর্থ উপার্জনের জন্য তাঁদের সকলকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ভবানীচরণ আরও একটু বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেছেন: "দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক তাঁহাদিগের অনেকের ঐ ধারা কেবল আহার ও দানাদি কর্ম্মের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড়, কারণ কেহ মুহুরি কেহ মেট কেহবা বাজারসরকার ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন, বিস্তর পথ হাঁটিতে হয়, পরে প্রায় প্রতিদিন রাত্রে গিয়া দেওয়ানজীর নিকট আজ্ঞা যে আজ্ঞা মহাশয় মহাশয় করিতে হয়, না করিলেও নয়, পোড়া উদরের জ্বালা।" এ-ব্যাখ্যাটি আরও বিজ্ঞানসম্মত। "দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক," এর চেয়ে সঠিক সংজ্ঞা মধ্যবিত্ত সম্বন্ধে আজও কোন সমাজবিজ্ঞানী দিতে পারেননি। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের আর্থিক সংগ্রামের কঠোরতার কথা ভবানীচরণ বারংবার উল্লেখ করেছেন। দু'বেলা দু'গুঠো অন্নের জন্য, এবং বাইরের ভদ্রতার সামান্য আবরণটুকু রক্ষা করার জন্য, তাঁদের যে কতখানি দাসত্বের অপমান সহ্য করতে হয়, সেকথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। বিস্তর পথ পায়ে হেঁটে গিয়ে তাঁদের প্রতিদিন কাজ করতে হয়। কেউ বাজার-সরকার, কেউ মুহুরি, কেউ কেরানী, কেউ বা ছোট দোকানদার। তখন শহরে যাতায়াতের জন্য ট্রাম-বাস ছিল না, সাধারণ লোকেব জন্য ছ্যাকরাগাড়ী ও পাল্কি ছিল। কয়েকজন মিলে শেয়ারে ছ্যাকরা ভাড়া করে তখন যাঁরা আফিস-আদালতে যাতায়াত করতেন তাঁরা অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত ও ছোটখাট অফিসারশ্রেণীর লোক। দরিদ্রের জন্য ছিল পাল্কি। কিন্তু পাল্কির ভাড়া মাইলপিছু এক আনা হলেও, 'দরিদ্র অথচ ভদ্রলোকদের' পক্ষে কর্মস্থলে যাতায়াতের জন্য তা ব্যবহার করা সম্ভব হত না। অগত্যা পায়ে হেঁটেই তাঁদের শহরের মধ্যে বিস্তর পথ চলতে হত। কাজের শেষেও কেরানী-মুহুরিদের নিস্তার ছিল না। প্রতিদিন রাত্রে

গিয়ে মনিবের কাছে তাঁদের 'আজ্ঞে যে আজ্ঞে, মশায় মশায়' করতে হত।

আমরা এই সাধারণ মধ্যবিত্তের দু'একটি 'টাইপ' সম্বন্ধে দু'চার কথা বলব—সেদিনের বাজারসরকার, সদাগরী অফিসের কেরানী ও শহরের হাটবাজারের ছোট দোকানদারের কথা। বাঙালী মধ্যবিত্তের বিপুল অংশ এই 'দরিদ্র অথচ ভদ্রলোকদের' নিয়ে গঠিত। ঐতিহাসিক পোলার্ড রেনেসাঁসের অগ্রদূত হিসেবে যে নতুন শহুরে মধ্যবিত্তের কথা বলেছেন, এই দরিদ্র ভদ্রলোকেরা তার সুবিস্তৃত ভিত্তিভূমি। রেনেসাঁস আন্দোলনের পুরোভাগে স্বনামধন্য নেতারূপে হয়ত তাঁরা কেউ দাঁড়াবার সুযোগ পাননি। তখনকার সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তিও তাঁদের বিশেষ কিছু ছিল না, কারণ সামাজিক মর্যাদার দু'টি নতুন মানদণ্ড, বিত্ত ও বিদ্যা, কোনটাই তাঁরা সুযোগ অভাবে ভাল করে আয়ত্ত করতে পারেননি। কিন্তু তা না পারলেও, এই দরিদ্র মধ্যবিত্তের বিরাট অংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নৈতিক সমর্থন ভিন্ন বাংলার কোন জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলনই যে সার্থক হত না, তা মনে রাখা উচিত। সেদিনকার সমাজে, ঐতিহাসিক কারণেই, উচ্চবিত্তের একটা অংশ বাংলাদেশে অগ্রগতির প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। আর যাঁরা সেই প্রেরণার শিখাটিকে অবিরাম ইন্ধন যুগিয়ে অনির্বাণ রেখেছিলেন, তাঁরা বাংলার দরিদ্র মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক।

তাঁদের জীবনযাত্রার মধ্যে কোন রোমান্স নেই, বিস্ময়কর ও আজগুবি উত্থানপতনও নেই। সাধারণ একজন মুন্সী থেকে কেউ মহারাজা বা বড় তালুকদার হননি, মুদির ব্যবসা থেকে বিরাট জমিদারী তদারক করতে আরম্ভ করেননি, গোমস্তাগিরি ও দালালি করতে করতে কেউ লক্ষপতি হবারও সুযোগ পাননি। তাই তাঁদের জীবনের কাহিনীর মধ্যে কোন রঙের বাহার ও বৈচিত্র্য নেই, চমকিত করার মতন কোন ঘটনার সমাবেশও নেই। তাঁরা হলেন অকৃত্রিম কেরানীবাবু, সরকারবাবু, মুহুরিবাবু এবং নানারকমের পণ্যদ্রব্যের দোকানদার ও ব্যবসায়ী। 'যে

আজ্ঞা' বা 'মশাই, মশাই' হয়ত তাঁরা এদেশী দেওয়ানজীদের কাছে করেছেন, সাহেবদের কাছে করতেও কুণ্ঠিত হন নি। দাসত্বের এই গ্লানিটুকু ভদ্রতা ও জীবনধারণের জন্য তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা নিঃসন্দেহে গর্ব করতে পারেন এই বলে যে, ধনিক বাঙালী দেওয়ান-বেনিয়ানদের মতন তাঁরা অন্তত সাহেবদের কাছে নির্লজ্জ গোলামি করতে পারেন নি। তাঁদের দাসত্বের ভাবভঙ্গিমার মধ্যে দারিদ্র্যের গ্লানিই প্রকাশ পেত বেশী, ধনিকদের মতন কেনাগোলামের কলঙ্ক প্রকাশ পেত না।

সরকারবাবু। এই দরিদ্র বাঙালী ভদ্রলোকদের ভিতর থেকে যে-ভদ্রলোকের তীক্ষ্ণবুদ্ধিদীপ্ত অথচ করুণ ক্যাবলার মতন মুখখানি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তিনি হলেন আমাদের সুপরিচিত সরকারবাবু। আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' কেষ্টার চেয়েও তিনি আরও অনেক বেশী পুরাতন। অথবা ইতিহাসের যে-কোন অতীত পর্বে কেষ্টার অভ্যুদয় হোক না কেন, দেখা যাবে 'সরকারবাবু' তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। জানি না, সারা পৃথিবীর সকল জাতের ভদ্রলোকদের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশের সরকারবাবুর মতন এমন নিরীহ গোবেচারী শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক আর কেউ কোথাও আছেন কিনা! ডাক দিলেই হয়ত তিনি কেষ্টার মতন 'হুঁকাটি বাড়ায়ে' মনিবের কাছে হাজির হন না, কিন্তু তাঁর ক্যাশবাক্স ও জমাখরচের খাতাটি বগলে করে চোখের নিমেষে সামনে এসে উপস্থিত হন, এবং করজোড়ে কাতর স্বরে 'হুজুর, হুজুর' করতে আরম্ভ করেন। সেদিনের কলকাতায় সাহেবদের বাড়ি এবং বাঙালী বড়লোকদের বাড়ি তাঁর চাকরি বাঁধা ছিল। বড়-বাবুদের খানসামা বা সর্দারবেয়ারা না হলে যেমন চলত না, তেমনি 'সরকারবাবু' না হলে কলকাতার মতন শহরে তাঁদের জীবনের রথ অচল হয়ে যেত। 'আই হ্যাভ দি অনর টু বি স্যার' বলে চাকুরির জন্য তাঁদের

দরখাস্ত করতে হত না। 'ত্রিভুবনের অধীশ্বর, দোর্দণ্ডপ্রতাপ ধর্মাবতার' বলে বাংলায় দরখাস্ত লিখে নিয়ে গেলেই সাহেব বিলক্ষণ বুঝতে পারতেন, বাঙালী দেওয়ানজী-বেনিয়ানজীরা তো পারতেনই। ইংরেজী ভাষার দিক থেকে ডজন দুই শব্দের স্টক থাকলেই তাঁদের কাজ চলে যেত। বড় বড় দেওয়ান ও বেনিয়ানরা যদি ঐটুকু ইংরেজী বিদ্যা নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে থাকেন, তাহলে সরকার মশায়ের পক্ষে তা দিয়ে কাজ না চালাতে পারার কোন কারণ ছিল না। এমা রবার্টস (Emma Roberts) লিখেছেন:

> The circars, who may be styled agents of all descriptions, are for the most part tolerably well acquainted with the English language; but these men are notorious for their knavery: they live by encouraging the extravagance of their employers, and the ruin of more than half of the Company's servants may be traced to the facilities thrown in their way by the supple circar, who, in his pretended zeal for 'master' has obtained for him money on credit to any amount.

'সরকারের' ইংরেজীবিদ্যা সম্বন্ধে এমা প্রশংসাই করেছেন বলা চলে। কিন্তু অন্যান্য গুণের কথা যা বলেছেন তা আদৌ প্রশংসনীয় নয়। সরকারের ধূর্তামির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে মনিবদের ব্যয়-বিলাসিতার ইন্ধন যোগানোই তাঁদের প্রধান কাজ। কোম্পানীর প্রায় অর্ধেক কর্মচারী সরকারের কৃপায় উচ্ছন্নে গেছেন বলা চলে। এমনিতেই কলকাতা শহরে খরচপত্রের দিক থেকে তাঁরা বেহিসেবী ছিলেন, তার উপর সরকার মশায় তাঁদের পদে পদে খরচবৃদ্ধির জন্য উস্কানি দিতেন। টাকার অভাব হলে তাঁরা মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করে এনে দিতেন। অর্থাৎ এদেশের চার্বাকদর্শন, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ,

বিদেশী সাহেবরা আমাদের সরকার মশায়দের কাছ থেকে বেশ ভাল-ভাবেই শিক্ষা করেছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীরা ঋণের ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিলেন সরকারের উৎসাহে। কিন্তু প্রশ্ন হল, সরকার মশায় এত উৎসাহ দিতেন কেন? মনিবের খরচ বাড়িয়ে তাঁর লাভ কি?

শ্রীমতী এমা 'সরকারের' চরিত্রের কঠোর সমালোচনা করে অবশেষে বোধ হয় একটু নারীসুলভ করুণা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, সরকার একটি "necessary evil" হলেও তাঁকে ঠিক "Rogue" বলা যায় না—"It would be unjust and ungrateful to withhold the praise honestly earned by many of these men, who have shewn the utmost gratitude and fidelity to employers from whom their gains have been exceedingly trifling, consisting merely of a small percentage upon the articles supplied…" সরকার মশায়ের লাভের ও স্বার্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এর মধ্যে। সেই লাভ হল, জিনিসপত্তর কেনাকাটার সময় শতকরা সামান্য কিছু দস্তুরি। এই দস্তুরিই সরকারের প্রধান আয়, কারণ বেতন তাঁর খুব সামান্য। কিন্তু এমার মতে, সরকারের অগাধ প্রভুভক্তি ও আন্তরিকতার সঙ্গে তুলনা করলে এই দস্তুরির লোভ বা স্বার্থ উপেক্ষণীয় বলে মনে হয়। তিনি বলতে চান, আর্থিক স্বার্থের তুলনায় সরকারের চারিত্রিক নিষ্ঠা অনেক বেশী। সুতরাং তাঁকে ঠিক দুষ্টপ্রকৃতির লোক বলা যায় না।

ফ্যানি পার্কস (Fanny Parks) কিন্তু সরকারের দস্তুরি ও লাভ সম্বন্ধে অন্যকথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "A very useful but expensive person in an establishment is a sircar ;…" সরকার খুবই প্রয়োজনীয় কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ কর্মচারী। প্রতিদিন সকালবেলা সরকার মশায় বাজারের কেনাকাটার ফর্দ নিয়ে উপস্থিত হন; এবং মনিবকে দিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নেন। তারপর তিনি বাজারে গিয়ে সেগুলি কেনাকাটা করেন। সংসারের সামান্য জিনিসপত্র

থেকে আরম্ভ করে, ফার্নিচার, বই, পোষাকপরিচ্ছদ সব কেনার ভার তাঁর উপরেই থাকে, এবং দেশী-বিদেশী কোন্ দোকান থেকে কি জিনিস কি দামে কিনলে সুবিধা হয় তা তিনিই ঠিক করেন। দস্তুরি সম্বন্ধে ফ্যানি বলেছেন, "his profit is a heavy percentage on all he purchases for the family, two annas in the rupee dustoorie." টাকায় ছ'আনা করে দস্তুরি কম নয়। সেইজন্য শ্রীমতী ফ্যানি সরকার মশায়ের লাভ বেশ মোটা রকমের বলে উল্লেখ করেছেন।

এইবার মনিবের খরচ বাড়িয়ে সরকারের লাভ কি, তা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। লাভ হল দস্তুরি। মনিবের খরচ যত বাড়ত, তত তাঁর দস্তুরিও বাড়ত, কারণ অধিকাংশ খরচেরই এজেন্ট ছিলেন তিনি। ঘরের মালিক ও বাইরের দোকানপাটের মালিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক 'টানেল' বা নালাস্বরূপ ছিলেন সরকারবাবু। তাঁর হাত দিয়ে বন্যার বেগে মনিবের টাকা বয়ে যেত বাজারে, এবং তিনি কেবল তার তলানিটুকু ভোগ করেই খুশি হতেন। সাহেব পাল্কি চড়তে চাইলে তিনি হয়ত ভাল টমটমে চড়ার লোভ দেখাতেন, কারণ যে-সব কোম্পানি গাড়ী-ভাড়া দিত তাদের সঙ্গে তাঁর কমিশনের বন্দোবস্ত থাকত। সাহেবের পোষাক-পরিচ্ছদ, ফ্যাশান, স্টাইল ইত্যাদির তিনিই ছিলেন উপদেষ্টা। স্টাইলের দিক থেকে মনে হয় সাহেব-মনিবদের চেয়ে সরকারবাবুদের অনেক বেশী জ্ঞান ছিল, কারণ স্টাইল-প্রবর্তক বড় বড় টেলারদেরও তাঁরা এজেন্ট ছিলেন। সাহেবকে নতুন স্টাইলের পোষাক ধরাতে পারলে সরকার বেশ ছ'পয়সা দস্তুরি পেতেন পোষাক-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। সাহেবকে থিয়েটার দেখিয়েও হয়ত তিনি থিয়েটারের মালিকের কাছ থেকে টিকিটের কমিশন আদায় করতেন। স্পেন্সেসের মতন হোটেলে অথবা কোন ভাল ট্যাভার্নে সাহেবকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছ'একবার নিয়ে যেতে পারলেও, সরকার মশায় ছ'পয়সা মালিকদের কাছ থেকে দালালি পেতেন। এইরকম নতুন স্টাইলের জুতো, নতুন নতুন ফার্নিচার, বই, ঘোড়া, গাড়ী ইত্যাদি যে-কোন ভোগ্য দ্রব্যের প্রতি সাহেবের

নিত্য-নতুন আসক্তি জাগাতে পারলে, সরকারই লাভবান হতেন। মনিবের consumption-pattern উন্নত করাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এই কারণেই কোম্পানির প্রায় অর্ধেক কর্মচারী আমাদের বাঙালী সরকারবাবুর কৃপায় ব্যয়বাহুল্যের জন্য একেবারে উচ্ছন্নে গিয়েছিলেন। শ্রীমতী এমা এবিষয়ে অত্যুক্তি করেছেন বলে মনে হয় না।

নতুন শহরে সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে সরকার মশায়ের এই চিত্রটি করুণ ও উপভোগ্য হলেও অনেক কারণে স্মরণীয়। দালালি-বৃত্তিটিকে সরকার মশায় এমন একটি স্তর পর্যন্ত টেনে নামিয়েছিলেন যে, তার ঐন্দ্রজালিক মোহ আজও যেন আমাদের অস্থিমজ্জায় ঢুকে রয়েছে মনে হয়। দেওয়ান-বেনিয়ানমুচ্ছুদ্দি থেকে সরকার ও খানসামা পর্যন্ত সকলেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দালালিই করেছেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন অতি উচ্চ ও অতি নিম্নশ্রেণীর দালাল। সরকার মশায় ছিলেন যথার্থ সাধারণ মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিমান অথচ নিষ্ঠাবান দালাল। তাই দালালি করেও তাঁর দারিদ্র্য শেষ পর্যন্ত ঘোচেনি। নিম্ন ও সাধারণ স্তর থেকে দালালির দৌলতে অনেক ভাগ্যবান লোক উচ্চবিত্তের চূড়ায় উঠেছেন। কিন্তু হতভাগ্য সরকার মশায়, ফ্যানির ভাষায় 'heavy percentage' দস্তুরি পাওয়া সত্ত্বেও সমাজের সাধারণ 'দরিদ্র অথচ ভদ্রলোকের' স্তর অতিক্রম করতে পারেন নি। তাঁর কৃতিত্ব হল অমিতব্যয়ের ইন্ধন যুগিয়ে, তিনি কিছু সাহেব ও এদেশী বড়লোক মনিবের সর্বনাশের পথ সুগম করেছেন।

কেরানীবাবু। কেরানীবাবুদের ঠিক একটা বড় চাকুরিজীবী-গোষ্ঠী হিসেবে কোন ঐতিহাসিক বিবরণের মধ্যে পাওয়া যায় না। অথচ সরকারী ও বেসরকারী সদাগরী আফিসের কেরানীর সংখ্যা উনিশ শতকের গোড়া থেকেই কলকাতা শহরে ক্রমে বাড়তে আরম্ভ করেছিল মনে হয়। কোম্পানির আমলের সাহেব কেরানীদের যেমন 'writer'

বলা হত, এদেশের কেরানীরাও তেমনি দীর্ঘকাল ঐ নামে পরিচিত ছিলেন। কেবল 'রাইটার' কথার আগে 'নেটিব' কথাটি যোগ করে দেশী কেরানীদের বলা হত 'নেটিব রাইটার'। চাকরীর ক্ষেত্রভেদে তখন কেরানীবাবুদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যবোধ বেশ প্রখর ছিল। হয়ত এই বোধ এখনও তাঁদের মধ্যে আছে, কিন্তু থাকলেও তা অবচেতনার স্তরে আছে, এবং তার প্রখরতাও তেমন নেই। একশ-দেড়শ বছর আগে তো ছিলই, পঞ্চাশ বছর আগেও যথেষ্ট ছিল। কোম্পানির কেরানীরা নিশ্চয়ই নিজেদের পদমর্যাদার দিক থেকে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বলে মনে করতেন। নেটিব রাইটারদের মধ্যে স্বভাবতঃই তাঁরা ছিলেন সর্বোচ্চ স্তরের। তারপরেই ছিলেন কলকাতার বড় বড় সদাগরী আফিসের কেরানীরা, বিশেষ করে বিদেশী 'হৌসে'র কেরানীরা (Agency Houses)। অনেক সময় দেখা যেত, কোম্পানির কেরানীদের চেয়ে বিদেশী হৌসের কেরানীদের মর্যাদাবোধ বেশী। ককারেলের কেরানী, পামারের কেরানী, ব্যাজেট-কলভিনের কেরানী, টুলোর কেরানী, র‍্যালি ব্রাদার্সের কেরানী—এঁরা অনেক বেশী গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে চলতেন, অন্যান্য কেরানীদের তো দূরের কথা, কোম্পানির কেরানীদেরই বিশেষ আমল দিতেন না।

কলকাতা শহরে একশ বছর আগেও অন্যান্য সকলশ্রেণীর চাকুরিজীবীদের মধ্যে বাঙালী কেরানীদের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশী। ১৮৪০-এর দিকে 'গ্রিফিন' লিখেছেন ঃ "The native writers are a numerous class and always form the majority in mercantile offices." (*Sketches of Calcutta etc*, Glasgow, 1843). বিদেশী সদাগরী আফিসের কেরানীরা যদি সেদিনকার চাকুরে সমাজে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে চলে থাকেন, তাহলে বোধ হয় খুব অন্যায় করেননি। কোম্পানির কেরানীকুঠির (Writers' Building) চেয়ে ককারেল, পামার, টুলো প্রভৃতি সদাগরি আফিসের ভিতর বাহিরের চেহারা অনেক বেশী জমকাল ছিল, ঘরের আসবাবপত্র

ও কর্মচারীদের কাজকর্মের সুযোগ-সুবিধাও ছিল যথেষ্ট। গ্রিফিন লিখেছেন, কোন-কোন সওদাগরী আফিসের "showy exteriors" দেখলে রীতিমত তাক্ লেগে যেত। আফিসের ভিতরে সবচেয়ে বড় ও সুসজ্জিত হলঘরটিকে সাহেব-মালিক নিজে বসতেন। গ্রিফিন এটিকে "sanctum sanctorum of the merchant" বলেছেন। তার পেছনে বিশাল একটি ঘেরা-বারান্দা থাকত, যেখানে তিনি ও তাঁর বিদেশী সহকর্মীরা মধ্যে মধ্যে পায়চারী করতে করতে ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে আলাপ-পরামর্শ করতেন। গ্রীষ্মকালে মাথার উপর সর্বক্ষণের জন্য লম্বা লম্বা টানা পাখা চলত। চারিদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত অফিস, দেখে মনে হত ছোটখাট একটি দুর্গ।

এদেশী কেরানীদের বসবার ঘর ছিল আলাদা। সেই ঘরে আটজন থেকে বারজন বাঙালী কেরানী কাজ করতেন। অনেকে মেঝের উপর আসন পেতে বসতেন, এবং হয় হাঁটুর উপর, অথবা সামনের একটি বাক্সের উপর খাতা রেখে লিখতেন। কেউ কেউ অবশ্য চেয়ারে বসে ডেস্কেও লিখতেন। বাঙালী কেরানীদের বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষাতেই লিখতে হত। তাঁদের মাসিক বেতন ছিল ৪৲ টাকা থেকে ১০৲ টাকা। অন্য একটি ঘরে পাঁচ-ছ'জন ফিরিঙ্গি কেরানী কাজ করতেন। তাঁদের বেতন ছিল ৬০৲ টাকা থেকে ১০০৲ টাকা। আরও জন বারো বাঙালী কেরানী ছিলেন যাঁরা একটু বেশী বেতন পেতেন, ৮৲ টাকা থেকে ২০৲ টাকা। দোতালার ঘরে সাহেবের পার্টনারদের এবং সাহেব কেরানীদের কাজ করবার ঘর থাকত। বাঙালী কেরানীরা সাদা কাপড় সুন্দর কাছাকোচা দিয়ে পরে, তার উপরে একটি ফতুয়ার মতন সাদা বেনিয়ান গায়ে দিয়ে আফিসে আসতেন—"white muslin, flowing and graceful". পাট-করা সুন্দর সাদা কাপড়কে মসলিন ভেবেছেন, এবং 'flowing' বলেছেন লম্বা কাছা-কোচাকে। বাঙালী কেরানীদের পোষাক 'tasteful' বা রুচিসম্পন্ন হলেও, তাঁরা "very slow in writing, and they will not be pushed" বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

একটি বিখ্যাত সদাগরী আফিসের কেরানীদের এই বিবরণ থেকে, আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে, মোটামুটি তাঁদের অবস্থা কি রকম ছিল, তা খানিকটা বোঝা যায়। মনে হয়, কেরানীগিরি চাকরির (বাঙালীদের) অন্তত দু'টি স্তর ছিল, আজকালকার 'লোয়ার' ও 'আপার' গ্রেডের মতন। যাঁরা লোয়ার গ্রেডের কেরানী ছিলেন, তাঁরা বোধ হয় ইংরেজী জানতেন না, এবং বাংলাতেই খাতাপত্র লেখার কাজ করতেন। তাঁদের বেতন ছিল মাসিক ৪৲ টাকা থেকে ১০৲ টাকা। যাঁরা 'আপার' গ্রেডের কেরানী ছিলেন তাঁরা বোধ হয় কিছু ইংরেজী লেখাপড়া জানতেন, সাহেবের সঙ্গে দু'চারটে কথাও বলতে পারতেন, এবং ইংরেজী লেখার কাজ করতেন। তাঁদের মাসিক বেতন ছিল ৮৲ টাকা থেকে ২০৲ টাকা।

গ্রিফিনের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ফিরিঙ্গি কেরানীদের মর্যাদা বাঙালীদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল, এবং তাঁদের "স্ট্যাটাস" মাসিক বেতনেই বিলক্ষণ প্রতিফলিত হত। 'আপার' গ্রেড বাঙালী কেরানীদের চেয়ে তাঁরা চার পাঁচগুণ বেশী বেতন পেতেন। ৬০৲ টাকা থেকে ১০০৲ টাকা পর্যন্ত তাঁদের বেতন ছিল। বাঙালীর সঙ্গে ফিরিঙ্গিরই এত পার্থক্য থাকলে, অবিমিশ্র সাহেব কেরানীদের সঙ্গে তাঁদের যে কি ভয়ঙ্কর ব্যবধান ছিল তা ভাবা যায় না। কেরানী-জগতে ইংরেজরা first, ফিরিঙ্গিরা second, এবং বাঙালীরা third ছিলেন। তা থাকলেও, কাজের প্রতি তাঁদের কোন বৈরাগ্য বা শৈথিল্য ছিল না। চাকুরিক্ষেত্রে বাঙালী কেরানীরা তখন ছিলেন সততা ও নিষ্ঠার প্রতিমূর্তি। বড় বড় সদাগরী হৌস ও নিলামহৌসে সরকারের ও কেশিয়ারের চাকরি বাঙালীদের জন্য বরাদ্দ থাকত, কোন ট্যাসফিরিঙ্গি বা ইংরেজও সেই পদে নিযুক্ত হতেন না। বড় বড় বিদেশী নিলামহৌসগুলি তখন দর্শনীয় বস্তু ছিল। মূর কোম্পানি, বা হিকি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রভৃতির নিলাম-ঘর দেখতে লোকের ভিড় জমত। সবার উপরে বসতেন 'অকশনীয়ার' এবং তাঁর একপাশে বসতেন 'রিপিটার', অর্থাৎ যিনি নিলামের ডাক

আবৃত্তি করতেন। সাধারণত পর্তুগীজ খ্রীস্টান বা ফিরিঙ্গিদেরই এই চাকরি দেওয়া হত। আর-একপাশে বসতেন বাঙালী সরকারবাবু, নিলামের খাতাপত্রের সর্বময় মালিক। তাঁর পাশে বসতেন একনিবিষ্টচিত্ত বাঙালী কেশিয়ারবাবু, নিলামের সমস্ত টাকাপয়সার বিশ্বস্ত প্রহরী। সুতরাং বাঙালী কেরানীদের যে কোন মর্যাদাই ছিল না সাহেবদের কাছে, তা নয়। মর্যাদা তাঁদের ছিল, এবং বিশ্বাসভাজনও তাঁরা ছিলেন, কিন্তু তাঁদের একমাত্র অপরাধ ছিল এই যে তাঁরা 'ব্লাক নেটিব' হয়ে জন্মেছিলেন। তখনও সভ্য মানুষের সমাজে চামড়ার সাদা-কালো-হল্‌দে রঙের বৈষম্যবোধ অত্যন্ত তীব্র ছিল। নব্যসভ্যতার অগ্রদূত ইউরোপীয়দের মধ্যে এই বোধ যতটা তীব্র ছিল ততটা বোধ হয় আর কোন জাতের মধ্যে ছিল না। হতভাগ্য বাঙালী কেরানীরা গাত্রবর্ণের ট্রপিকাল কৃষ্ণতার জন্য সেদিনের শহুরে সমাজে মর্যাদা ও বেতন দুইই কম পেয়েছেন, যোগ্যতার অভাবের জন্য নয়। তবু সেদিনের ৪৲—১০৲ টাকা ও ৮৲—২০৲ টাকা গ্রেডের বাঙালী কেরানীরা সমাজে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, এবং যে রকম দাপট দেখিয়ে গেছেন, আজকের 'আপার' তো দূরের কথা, কোন 'সুপার' গ্রেডের কেরানীও তা কল্পনা করতে পারেন না।

মুহুরী ও বুব্ব‌ুলিয়া। বুলবুলি পাখির কথা শোনা গেছে, কিন্তু এমন কোন বৃত্তিজীবি লোকের কথা শোনা যায়নি কখনও, যাঁরা 'বুব্ব‌ুলিয়া' নামে লোকসমাজে পরিচিত। উনিশ শতকের প্রথম পর্বে C. M. নামে জনৈক অ্যাটর্নি বাঙালী মুহুরিদের কথা তো বলেছেনই, বুব্ব‌ুলিয়াদের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথা দিয়েই আরম্ভ করছি ঃ

Be it Known, that in almost all the attornies' offices there are retained,—a Banian, a Sircar, a Head writer,

—their numerous attendants—a seat also of their dependant apprentices (who write or pretend to write without salaries)—a, to close the pack, the Bringers of business, the Law-brokers, the *Bubbulias*, (or promoters of domestic broils)…"—*Observations etc, upon the Present State of the Practice in the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal*, Calcutta 1825.

অ্যাটর্নি সাহেব 'who write or pretend to write' বলে যাঁদের কথা বলতে চেয়েছেন, তাঁরাই হলেন বাঙালী মুহুরি। 'without salaries' কথাটি দেখে আরও পরিষ্কার তা বোঝা যায়। আদালতের মুহুরিরা বেতন পান না, বেতন চান না, কারণ বেতন তাঁদের প্রয়োজন হয় না। তাঁরা আরজি-দলিল-পত্রাদি নির্দিষ্ট ফি নিয়ে লেখেন, এবং তা থেকে যা তাঁদের আয় হয় তাতে মোটামুটি বেশ চলে যায়। এই মুহুরিদের সকলেই বিশেষভাবে চেনেন। তাঁরা শতবর্ষ আগেও যা ছিলেন আজও ঠিক তাই আছেন, এমন কি চেহারায়, পোষাকে ও হাবভাবে পর্যন্ত। তারপর সমাজের উপর দিয়ে অনেক পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গেছে, কিন্তু মুহুরিদের কোন পরিবর্তন হয়নি। একমাত্র ভবিষ্যতের সমাজে যখন রাষ্ট্র উঠে যাবে, এবং তার সঙ্গে আইন-আদালতও উঠে যাবে, তখনই কেবল মুহুরিদের change নয়, mutation সম্ভব হবে।

মুহুরিদের নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই, কিন্তু 'বুব্ব্‌ুলিয়ারা' কারা? 'Promoters of domestic broils'—খুব সাংঘাতিক বিশেষণ হলেও, অ্যাটর্নি সাহেব বুব্ব্‌ুলিয়াদের তাই বলেছেন। তাঁরা মামলা-মোকদ্দমার দালাল, অ্যাটর্নিদের মামলা জুটিয়ে দিয়ে কমিশন পান। কিন্তু আদালতে বসে যদি তাঁরা ক্লায়েন্টদের ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করতেন, তা হলে ভাবনার থাকত না কিছু। ক্লায়েন্ট ও অ্যাটর্নি, বা উকিল-অ্যাডভোকেট, উভয়পক্ষের কাছ থেকে তাঁরা দালালি পেলেও

কারও কিছু অভিযোগ করবার ছিল না। কিন্তু এই বুব্ব‍ুলিয়ারা কেবল ওঁৎ পেতে আদালতের উন্মুক্ত বটতলায় বসে থাকতেন না। বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাঁরা মামলা বাধাবার চেষ্টা করতেন। নিশ্চয় দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের বাড়ি তাঁরা ঘুরে বেড়াতেন না, অথবা চোর-ডাকাত-খুনিদেরও পশ্চাদ্ধাবন করতেন না। কারণ তাতে আর ক'পয়সা কমিশন পাওয়া যায়। অতএব তাঁরা ঘুরে বেড়াতেন কলকাতা শহরের বড় বড় ধনিক পরিবারে, লাহা-মল্লিক-শেঠ-বসাক ও অন্যান্য রাজা-মহারাজাদের বাড়ি বাড়ি। বনেদী পরিবারের বংশধরদের তাঁরা উস্কানি দিতেন বিষয়সম্পত্তি নিয়ে মামলা করতে। অগ্রজ অনুজের প্রতি কিরকম অন্যায় করছে, পিতৃব্য ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পত্তি কেমন করে ভোগদখল করেছেন, এই ধরনের সব উস্কানি দিয়ে বুব্ব‍ুলিয়ারা প্রচণ্ড গৃহবিবাদের সৃষ্টি করতেন। কলকাতার অনেক বনেদী বাঙালী পরিবারের বিশাল যৌথসম্পত্তি ও প্রচুর ধনদৌলত তাঁদের প্ররোচনাতেই ধ্বংস হয়ে গেছে। সম্পত্তি গেছে টুকরো টুকরো হয়ে, আর চরম উচ্ছৃঙ্খল বিলাসিতার পরেও টাকাকড়ি যা মজুত ছিল, তা দীর্ঘস্থায়ী মামলা-মোকদ্দমার সুযোগে অ্যাটর্নি, উকিল ও দালাল বুব্ব‍ুলিয়ারা লুটেপুটে খেয়েছেন। হুতোম 'দালালি' পেশাটিকে 'নেপোর দই মারার' সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু বুব্ব‍ুলিয়ারা দই ছাড়াও দুধ-ক্ষীরও মারতেন বলে মনে হয়। অন্তত বাংলাদেশে এই নেপোবংশে বুব্ব‍ুলিয়াদের মতন আর কোন বংশদণ্ডের উদ্ভব হয়নি কখনও। তাঁরা মামলার জন্য যা কমিশন পেতেন তা অনেক। C. M. বলেছেন "seldom less than ten percent." বড় বড় দেওয়ানী মামলায় শতকরা দশভাগ কমিশন পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। অনেক সময় এই দালালরাই মামলা পরিচালনার জন্য 'ম্যানেজার' নিযুক্ত হতেন। মক্কেলদের উপর এই ম্যানেজার-দালালদের এত বেশী প্রতিপত্তি ছিল যে তাঁরা এক-একটি মামলা, ইচ্ছা করলে, বংশপরম্পরায় চালাতে পারতেন। তারপর মক্কেলের হাড় পর্যন্ত চুষে নিয়ে, তাকে একেবারে সর্বস্বান্ত অবস্থায় পথের

ভিখিরি করে, তিনি তাঁকে মামলা থেকে রেহাই দিতেন। অনেক সময় দেখা যেত, দালাল-ম্যানেজারের অর্থ আত্মসাতের টেকনিক বুঝে ফেলে, মক্কেলরা নিজেদের মামলা ছেড়ে দিয়ে শেষে দালালদের মতন অন্যদের মামলা তদারক করার ভার নিতেন। C.M. লিখেছেন ঃ

> So great is the influence which these native managers have over their employers, that it is well-known that causes have been kept on foot by them in families for generations—in fact, fortunes have been made by these people, and when a family estate has been exhausted by litigation, the remnant of the litigants have turned managers to other happy litigants.

বুব্ব ুলিয়াদের টানে বড় বড় বাঙালী বনেদী পরিবারের বংশধররা কেবল যে জাহান্নমেই গেছেন তা নয়, নিজেরাও বুব্ব ুলিয়াতে পরিণত হয়েছেন। দালালির এরকম দৃষ্টান্ত আর কোন দেশের সামাজিক ইতিহাসে আছে কি না সন্দেহ।

চীনাবাজারের দোকানদার। উনিশ শতকের প্রথমভাগের মধ্যেই কলকাতা শহরে বহু রকমের সব বাজার গড়ে উঠেছিল। গ্রিফিন ৩৬টি বাজারের কথা বলেছেন, কিন্তু কোন বাজারই তাঁর মতে পুরনো চীনাবাজারের মতন নয়। সাধারণ লোকে কলকাতা শহরে বাজার বলতে তখন চীনাবাজারই বুঝত, কারণ দোকান, দোকানদার ও জিনিস-পত্রের বৈচিত্র্য চীনাবাজারের মতন আর কোন বাজারে ছিল না। টিরেটা ও ধর্মতলা বাজারে মাছ মাংস তরিতরকারী ও ফলমূল বিক্রি হত। এগুলি ছাড়া বাকী সব জিনিসই পাওয়া যেত নতুন ও পুরনো চীনাবাজারে। গ্রিফিন লিখেছেন।

These bazars are the places for shops, for stalls, and for business. Is their one European resident who would be at the trouble of counting how many native money-changers, booksellers, stationers, cabinet-makers, umbrella makers, petty agents, leechesmen, idol-sellers, retailers of saccharine dainties, and general dealers there are in these bazars and thoroughfares.

এককথায় চীনাবাজারকে তখন এদেশী ছোট ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের সবচেয়ে বড় বাজার বলা হত, এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাঙালীদের সংখ্যাই ছিল তখন বেশী।

চীনাবাজারে হরেকরকম পণ্যদ্রব্যের মধ্যে বইয়ের আকর্ষণ কম ছিল না। বইয়ের দোকান অধিকাংশই ছিল বাঙালীদের, এবং তাতে তখনকার দিনের ভাল ভাল ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বই ঠাসা থাকত। সেক্সপীয়র, অ্যাডিসন, চামার্স, স্কট, ম্যারিয়ট, বার্নস ও অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকদের সমস্ত বই চীনাবাজারের দোকানে মজুত থাকত। এমন কি, বিলেতের যে-কোন সদ্যপ্রকাশিত বই, সাহিত্যের বা বিজ্ঞানের, পাঠকরা খোঁজ করলেই পেতেন। বিদেশ থেকে আমদানি বই তখন নিলামেও বিক্রি হত। পুস্তক-ব্যবসায়ীরা নিলাম থেকে বই কিনে স্টক করতেন। এইভাবে বইয়ের ব্যবসা করে তখন অনেক বাঙালী দোকানদার খুব বড়লোক না হলেও, বেশ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই জীবন কাটিয়েছেন।

চীনাবাজারের তখন আর-একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ ছিল রেজকিওয়ালা (money-changers)। গ্রিফিন বিপিনবিহারী রায়ের কথা এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

There sits Bepeenbaharee Roy the money-changer, his legs are placed in tailor fashion on the threshold of his little office, on a board, or on the ground before him,

are small lots of gold mohurs and rupees, and heaps of pice.

বিপিনবিহারীদের তখনকার হাট-বাজারে খুব বেশী সংখ্যায় দেখা যেত। বিশেষ করে যখন অর্থনৈতিক জীবনে একরকমের মুদ্রার অটোক্রাসি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, নানারকমের টাকা-পয়সা বাজারে পাশাপাশি চলত, তখন বিপিনবিহারীরা রেজকি-বিনিময়ের ব্যবসা করে সহজেই জীবনধারণ করতে পারতেন।

রেজকিওয়ালার পাশে ছিল কুমোরের দোকান। তার দোকানে "an image of the five-faced Shiva, the destroyer, of the blood-thirsty goddess Kali and of Durga," দেখে গ্রিফিন রীতিমত চমকে গিয়েছিলেন। কুমোরের পাশে ছিল হুকোওয়ালা ভগবতীচরণ ঘোষের দোকান। হুকো-তামাকের পাশে ছিল মিষ্টান্ন। মিষ্টান্নের দোকান ছিল রামচন্দ্র দাসের, এবং রামচন্দ্রকে গ্রিফিন "dealer in sugary preparations" বলেছেন। তিনি লিখেছেন যে রামচন্দ্রের দোকানের তাকগুলি টেরাসের মতন সাজানো। গোলাকার, লম্বা, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ প্রভৃতি নানা আকারের মিঠাইগুলিকে সাহেব "heaps of saccharine obelisks, pyramids and balls" বলেছেন। বোঝা যাচ্ছে, বাঙালীর মিষ্টান্নের বিচিত্র রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে সাহেব জ্যামিতির সাহায্য নিয়েও কূল পাননি।

রামচন্দ্রের পাশেই কাশীপ্রসাদ মুখুয্যের ক্যাবিনেটের দোকান। দোকানে কাশীপ্রসাদ সব সময় কিছু চেয়ার, কোচ, আলমারী ইত্যাদি বিক্রির জন্য মজুত রাখেন। তার পাশেই শিয়ারউড, কুরি প্রভৃতি বিখ্যাত ইউরোপীয় ক্যাবিনেটমেকারদের দোকান, এবং সেই সব দোকানে ৬০০ থেকে ১০০০ জন মিস্ত্রি কাজ করে। ক্যাবিনেটের দোকানের পাশেই শ্রীকৃষ্ণ দত্তের সর্বজন-পরিচিত পাঞ্চহাউস। তার-পাশে কালাচাঁদ ঠাকুরের বিখ্যাত পোষাক-পরিচ্ছদের দোকান, "a more interesting place to ladies than sahibs." কালাচাঁদ

সম্বন্ধে গ্রিফিন লিখেছেন, "he has a varied and fanciful stock of goods and is moreover, a most obliging pleasant person." সাহেবের কাছ থেকে একজন বাঙালী ব্যবসায়ীর পক্ষে দোকানদারি সম্বন্ধে এই প্রশংসা পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। চীনাবাজারের হ্যাবার-ড্যাশার কালাচাঁদ এবং আরও অনেকে তা পেয়েছিলেন।

চীনাবাজারের দোকানদারদের কথা শেষ হল। বিপিনবিহারী, ভগবতীচরণ, কাশীপ্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণ, কালাচাঁদ, পুস্তকব্যবসায়ী ও প্রতিমা-শিল্পী, সকলেই 'নেটিব' বাঙালী ব্যবসায়ী। তাঁদের সংখ্যা যে কত তা হিসেব করা যায় না। একশ দেড়শ বছর আগেই এঁরা কলকাতা শহরের নতুন বাঙালী মধ্যবিত্তের একটা বেশ বড় স্তর অধিকার করে বসেছিলেন। কেবল দোকানদারিই এঁরা করতেন না, বাইরের সামাজিক জীবনের নতুন ধারার সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন। এঁদের সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য বাঙালী চাকুরিজীবীরা—সরকার, কেরানী, মুহুরি, এমন কি আদালতের বুব্বুলিয়ারা পর্যন্ত। নতুন শহরের নতুন মধ্যবিত্তের এই বিচিত্র স্তরটিকে সাধারণত ঐতিহাসিকেরা উপেক্ষা করে থাকেন। তার কারণ, উনিশ শতকের মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের যুগে, কেবল বিত্তবান ও বিদ্বান মধ্যবিত্তরাই সমাজে নতুন মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, এবং সেই মর্যাদার জোরে সমাজে একচ্ছত্র প্রতিপত্তিও তাঁরা বিস্তার করেছিলেন। সাধারণ ও নিম্ন মধ্যবিত্তের কোন প্রভাবই সমাজে তখন বিশেষ ছিল না। কেরানী ও দোকানদারদের কথা তাই সেদিনের পুরনো বই ও কাগজপত্রে বিশেষ কোথাও স্থান পায়নি। এমন কি কুলিমজুর ও ক্রীতদাসদের কথাও পর্যাপ্ত পরিমাণে সেদিনের দলিলপত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু 'দরিদ্র অথচ ভদ্রলোকদের' কথা একেবারেই পাওয়া যায় না। তাই তাঁদের সম্বন্ধে দু'চারকথা এখানে বলবার চেষ্টা করেছি।